উদ্দেশ

১৪৩২ ।। ২০২৫

প্রচ্ছদ : শাশ্বতী চন্দ

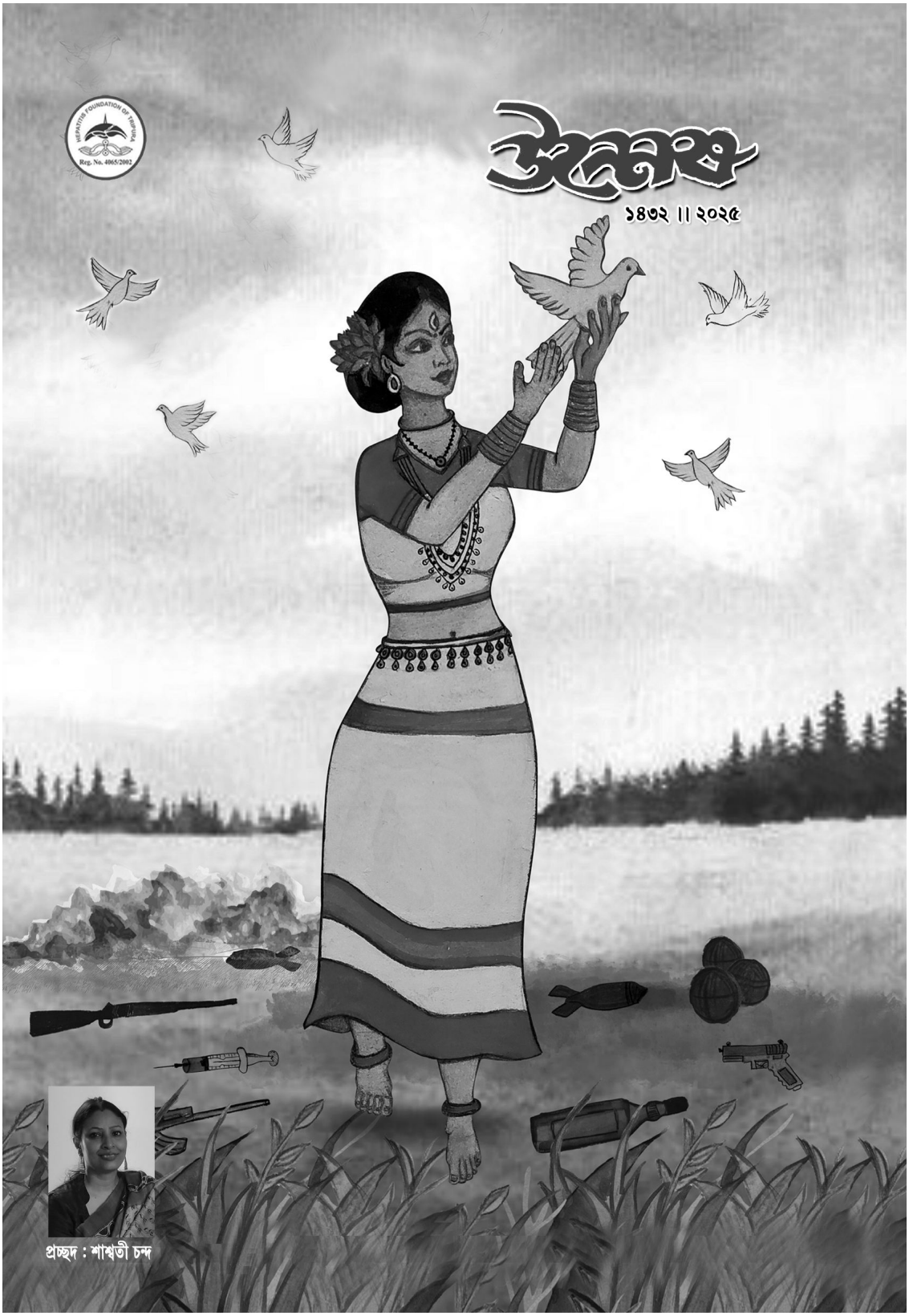

HEPATITIS FOUNDATION OF TRIPURA
Reg. No. 4065/2002
উন্মেষ
১৪৩২ || ২০২৫
প্রচ্ছদ : শাশ্বতী চন্দ

হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন অব ত্রিপুরা

সাউথ জোনাল কমিটি ও উদয়পুর শাখা

শারদ সম্মান ২০২৫

উপদেষ্টা পরিষদ

ডাঃ প্রদীপ ভৌমিক

ডাঃ এন.এল. ভৌমিক

দিবাকর দেবনাথ

প্রাণময় সাহা

ডাঃ অভিজিৎ দত্ত

ডাঃ সৌমিক চক্রবর্তী

ডাঃ অমরেশ ভৌমিক

ডাঃ প্রসেনজিৎ দেবনাথ

ডাঃ ছন্দম আচার্য

কার্যকরী কমিটি

সভাপতি

ডাঃ জগদীশ নমঃ

সহ সভাপতি

স্বপন কুমার সাহা

সীতা দাস

আহ্বায়ক

পার্থ প্রতিম সাহা

যুগ্ম আহ্বায়ক

টিঙ্কু দেবনাথ

রিটন দেববর্মা

কোষাধ্যক্ষ

মানস কুমার রায়

সদস্য/সদস্যা

নারায়ণ দাস

কৃষ্ণা ভট্টাচার্য

রাকেশ দেবনাথ

লিটন দেবনাথ

অনুষ্ঠান পরিচালন উপকমিটি

আহ্বায়ক

টিঙ্কু দেবনাথ

যুগ্ম আহ্বায়ক

মানস কুমার রায়

সদস্য/সদস্যা

শ্যামলেন্দু বর্ধন

ডাঃ সায়নিকা বিশ্বাস

উমা দাস

ঋতেশ শীল

সংযুক্তা সাহা

রাহুল চক্রবর্তী

জয়ন্ত চক্রবর্তী

সাংস্কৃতিক উপকমিটি

আহ্বায়ক

পারমিতা দাস

যুগ্ম আহ্বায়ক

সুকান্ত ঘোষ

সদস্য/সদস্যা

রুমা চক্রবর্তী

দেবাদৃতা রায়

সংকর্ষণ ঘোষ

সার্ধশতবর্ষে উন্মেষ অঞ্জলি

কবি কুসুমকুমারী দাশ

(১৮৭৫- ১৯৪৮)

মনুষ্যত্ব

"একদিন লিখেছিনু, আদর্শ যে হবে
'কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে'
আজ লিখিতেছি বড় দুঃখ লয়ে প্রাণে
তোমরা মানুষ হবে কাহার কল্যাণে?
মানুষ গড়িয়া উঠে কোন উপাদানে
... 'মানুষ হইতে হবে' হবে এই পণ -
বিপদ আসিলে কাছে হবে আগুয়ান
দুইখানি বাহু বিশ্বে সবারি সমান"

যুদ্ধে উন্মত্ত পৃথিবীকে মনুষ্যত্ব দাও মা!

বিনীত

উন্মেষ প্রকাশদল

।। স্মরণ ।।

দু'দশকের পথযাত্রায় যে সাথীরা না ফেরার দেশের যাত্রী হয়েছেন -
'স্মরণে তোমায় আমরা রাখি দিনরাত'

ডাঃ রতন ভট্টাচার্য, আগরতলা
হরিনারায়ণ রায়, আগরতলা
তপন রায়, কমলপুর
পার্থ সেনগুপ্ত, কুমারঘাট
সুবিমল দে, কমলপুর
জয়ন্ত পাল, আগরতলা
বসন্ত দত্ত, বামুটিয়া
হরিরঞ্জন ভৌমিক, শান্তির বাজার
পুর্নিমা সেন, সাব্রুম
নেপাল নাগ, বিলোনীয়া
প্রবোধ চন্দ্র রায়, উদয়পুর
ডাঃ অমিতাভ মজুমদার, আগরতলা
রমেন দেব, জিরানীয়া
অমল বিকাশ সাহা, আগরতলা
ডাঃ অরুন কুমার দেববর্মা
জয় কুমার সিনহা
লিপিকা দত্ত, খোয়াই
মনিকা রায়, উদয়পুর
গৌতম দেববর্মা, আগরতলা
ডাঃ বিভাস রঞ্জন পাল চৌধুরী, ধর্মনগর
মিনতী ভট্টাচার্য, কৈলাসহর
ডাঃ অনিমেষ ঘোষ, আগরতলা
বাধন চক্রবর্তী, বিলোনীয়া
ভানুকান্ত রায়, বিশালগড়
স্বপন দাস, বিশালগড়
ডাঃ বিনাপাণি দোলে, আগরতলা
শিবু দাস, উদয়পুর
সমীরন বৈদ্য, বিলোনীয়া
ডাঃ ইলা লোধ, আগরতলা
ডাঃ কিংশুক দত্ত, আগরতলা
ডাঃ নরেশ ত্রিপুরা, মনু
রতন সেন, সাব্রুম
শিবানী চক্রবর্তী, আগরতলা
শিপ্রা দাস, আগরতলা
অরবিন্দ বসু, জিরানীয়া
ডাঃ সজল দেববর্মা, আগরতলা
দুলাল চন্দ্র সেন, মহুরীপুর
বেণী মাধব পাল, মহুরীপুর

উন্মেষ

তৃতীয় বর্ষ।। তৃতীয় সংখ্যা।। আশ্বিন ১৪৩২ ।। সেপ্টেম্বর ২০২৫

প্রবন্ধ

শ্রী শ্রী মায়ের জীবন ও বাণী **স্বামী শুভকরানন্দ ১**
বরিষ ধারা মাঝে শান্তির বারি **শ্রীমৎ ভিক্ষু কুশলায়ন ৫**
ক্ষরণ বাহিরে ক্ষরণ ভিতরে **বিমান ধর ৬**
সলিল চৌধুরী, একই বাঁশি বেজেছে আজীবন **সমীর ধর ১৩**
ত্রিপুরায় চলচিত্র বিকাশের রূপরেখা **দীপক ভট্টাচার্য ১৭**
ধর্ম এবং প্রজ্ঞা ঃ হিন্দুত্ববাদের খোঁজ **প্রদীপ ভৌমিক ২১**
ত্রিপুরার মন্দির মসজিদ স্থাপত্য **তাপস দেবনাথ ২৩**
কালোপাহাড় ডাকে আয়! **প্রাণময় সাহা ৩০**
পুজো সংখ্যার তথ্য তালাশ **সঞ্জীব দে ৩৪**
দীপা'র উত্তরসূরী অলিম্পিয়ান কে? **সরয়ূ চক্রবর্তী ৩৭**

রোমন্থন

লোক সংগীতের প্রাণপুরুষ **সুবিমল ভট্টাচার্য ৩৮**
পুলিশ কথন **কৃষ্ণেন্দু চক্রবর্তী ৪১**
সম্মিলিত সাংস্কৃতিক চর্চা - সামান্য ভাবনা **লক্ষ্মন কুমার ঘটক ৪৫**
চৈতালি ভাঙ্গার দিন ও দিঘির মিছিল **অপন দাস ৪৬**
উদয়পুরে রবীন্দ্র জয়ন্তীর একাল-সেকাল **স্বপন ভট্টাচার্য ৪৮**
রাঙামাটির আলোকবর্তিকা! **অমিতাভ দাশ ৫১**

অন্য দৃষ্টিকোন

শতবর্ষের কথালাপ **উদয় শংকর ভট্টাচার্য ৫৩**
আত্মনিয়ন্ত্রনেই সুখ **নন্দিতা দত্ত ৫৭**
তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা, মন জান না **ডাঃ বর্ণালী দাশ বন্দোপাধ্যায় ৬০**
জুনিয়র পাপেটির ইতিকথা **প্রভিতাংশু দাশ ৬৩**

নাটক

একুশের প্রথম কবিতা **শুভাশিস চৌধুরী ৬৪**

গল্প

বকের পাখায় আলো **অর্জুন শর্মা ৬৮**
কবিতার অভিযাত্রায় অনন্যা **পারিজাত দত্ত ৭১**
কবর স্থান **সীপা দাস ৭৩**
মান আর হুঁশ **অজয় ভট্টাচার্য ৭৫**
সময়ের হাত এসে মুছে ফেলে আর সব **সুস্মিতা দাস ৭৮**
দেয়াল **বিল্লাল হোসেন ৮১**

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে

আমার মা **জীবনানন্দ দাশ ৮৪**

কবিতা

মিহির দেব, বিশ্ববন্ধু সেন, দিলীপ দাস, বিপ্লব উরাং, স্বপন মজুমদার, আশীষ চট্টোপাধ্যায়, সুব্রত তলাপাত্র, সঞ্জীব সিনহা, শুভাশিস কর, শঙ্খ সেনগুপ্ত, রাহুল সিনহা, মৃদুল দেবরায়, খোকন সাহা সুমন পাটারী, চন্দ্রিমা সরকার, শুভম বনিক, বিপাশা চক্রবর্তী, রজত ভট্টাচার্য, কল্যানী ভট্টাচার্য, শঙ্কর ভট্টাচার্য, সঞ্জীব চাকমা জুনান। ৮৮-৯৯

লিরিক

সুবিমল ভট্টাচার্য, সংকর্ষণ ঘোষ, মৃণাল নাথ শর্মা ৯৯

হেপাগাথা

কমিউনিটি হেপাটোলজি ও এইচ.এফ.টি **ডাঃ জগদীশ নমঃ ১০০**

সংক্রমক রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা **ডাঃ কমল রিয়াং ১০৩**

আমাদের লক্ষ্যপথ **পার্থ প্রতিম সাহা ১০৫**

জোনাল ভাবনা **স্বপন কুমার সাহা ১০৬**

নির্মাণ প্রকৌশলীরা ত্রিপুরার উন্নয়নের অন্যতম কারিগর এক অদৃশ্য শক্তির গল্প **পার্থপ্রতিম দেবনাথ ১০৭**

গ্রামীণ নারী ক্ষমতায়নে পঞ্চায়েতের ভূমিকা **দিব্যশ্রী দাশগুপ্ত ১১৩**

নিয়ন্ত্রিত মোবাইল ব্যবহার ঃ একটি পথ সুস্থ জীবনের দিকে **ডাঃ সঞ্জয় আইন ১১৪**

"চোখের আলোয় দেখেছিলেম....." **ডাঃ ছন্দম আচার্য ১১৬**

A Technical Approach to Health Awareness is Need of the Hour

Jayanta Nanda Chakraborty ১১৮

ম্যাকানিকেল থেকে এ আই ক্যালকুলেটর: নতুন দিশার খোঁজে! **দীপঙ্কর শূর ১২১**

দুর্গাপূজা ভ্রমণের অভিজ্ঞতা **প্রিয়া দত্ত ১২৩**

দুর্গাপূজা সবার **রিটন দেববর্মা ১২৪**

'উন্মেষ' প্রকাশদল

শুভাশিস চৌধুরী
নন্দিতা দত্ত
অমিতাভ দাশ (আহ্বায়ক)
দীপঙ্কর শূর (যুগ্ম আহ্বায়ক)
মানস কুমার রায়
রিটন দেববর্মা
রাহুল চক্রবর্তী

নামকরণ - প্রদীপ ভৌমিক
নামলিপি - মতিলাল গোস্বামী
প্রচ্ছদ ভাবনা - অমিতাভ দাশ
প্রচ্ছদ চিত্র - শাশ্বতী চন্দ
গ্রন্থসজ্জা - অমিতাভ, দীপঙ্কর
বর্ণ সংস্থাপন - জাকির হোসেন

জে.কে.গ্রাফিক্স, উদয়পুর, গোমতী জেলা থেকে সম্পাদক, হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন অব ত্রিপুরা, সাউথ জোনাল কমিটি ও উদয়পুর শাখা থেকে প্রকাশিত

শ্রীশ্রীমা - এর জীবন ও বাণী

স্বামী শুভকরানন্দ

সময়টা ১৯০৫ সাল। স্থান হৃষিকেশ। এক ভক্ত বদরিকাশ্রমের পথে সেখানে রয়েছেন। হৃষিকেশ দেবভূমি - সাধু সন্তের জায়গা। সাধু দর্শন সেখানে হবেই — এই আশা নিয়ে ভক্তটি সকালেই বেরিয়ে পড়েছেন কোন এক আশ্রমের উদ্দেশ্যে। আশ্রমে ঘুরতে ঘুরতে এক কুঠিয়া থেকে নারী কণ্ঠের আর্তনাদ শুনতে পান। ঐ শব্দটি অনুসরণ করে একটি কুঠিয়ার সামনে এসে বুঝতে পারলেন — একজন মহিলা আর্তনাদ করছেন। কুঠিয়াতে প্রবেশ করে বুঝতে পারলেন একজন নেপালী সাধ্বী বা সাধুনীর দেহত্যাগ হচ্ছে এবং তিনি দেহত্যাগ কালে চিৎকার করছেন, "য়ে মাঈ, য়ে মাঈ, অভিতক্ নেহি ভেজি?" হঠাৎ ভক্তটির দিকে দৃষ্টি পড়তেই সাধুনী হিন্দী ভাষায় বললেন, "তুম্ আয়ে হো, জল্‌দি আয়ো, মেরে নিকট্ বৈঠো। যো ম্যয় কহ রহি হুঁ শুনো অউর উসকা পালন করো, মেরে পাস জাদা সময় নেহী হ্যাঁ।" ভক্তটি এই কথা শুনে যারপরনাই বিস্মিত তবুও একজন সাধুনী এরকম বলছেন দেখে তিনি সামনে গিয়ে বসলেন। তখন নেপালী মাঈ ভক্তটিকে হিন্দী ভাষাতেই বলছেন, যাঁর অর্থ- আমাকে সন্দেহ করো না, 'মা' কে জিজ্ঞেস করো, তিনি তাঁর একটি সন্তানকে আমার শেষ সময় পাঠাবেন কথা দিয়েছেন। 'মা' বলেছেন কথাটা শুনে ভক্তটির বিস্ময়ের আর অবধি রইল না। নেপালী মা পুনরায় বললেন এখন যা বলি তা কর। তাঁর নির্দেশে ভক্তটি সেই মাঈজীর বালিশের তলা থেকে ৪০টি টাকা ও দেবনাগরী অক্ষরে লেখা একখানি পুঁথি বের করলেন। মাঈজি বললেন, আমি মরে গেলে শরীরটা সাধুদের সাহায্যে গঙ্গায় ফেলবে এবং চতুর্থদিনে ঐ টাকায় সাধুদের ভাণ্ডারার ব্যবস্থা করবে। আর পুঁথিটি তিন দিনের মধ্যে মুখস্থ করে নিয়ে তৃতীয় দিনে গঙ্গায় ফেলে দেবে। এই মন্ত্রগুলি পরের হিতে লাগবে। নিজের জন্য কখনো নয়। এর ৫/৭ মিনিট পরে মাঈজী "য়ে মাঈ, য়ে মাঈ" বলতে বলতে দেহত্যাগ করলেন। এই ঘটনায় ভক্তটি বদ্রিকাশ্রম যাবার সংকল্প ত্যাগ করে প্রথমে নেপালী মাঈজীর নির্দেশিত কাজগুলি করে সোজা জয়রামবাটিতে নিজে গিয়ে মাকে সব ঘটনা জানালেন। সব শুনে মা বললেন, হ্যাঁ আমাকে দিয়ে বলিয়ে নিয়েছিল। শেষ সময়ে একটি না একটি ছেলেকে পাঠাতে, মেয়েটি খুব ভাল। কাশীতে আমার কাছে আসত — পঞ্চতপা করতে আমাকে বলেছিল —।।

এই অজ্ঞান নেপালী সাধুনীর কাছে মার এই প্রতিশ্রুতির কথা করো জানা ছিল না কিন্তু কত বছর পরে কি অভাবনীয় ভাবে সেই প্রতিশ্রুতিটি মা পালন করেছিলেন তা ভাবলে বিস্ময়ের অবধি থাকে না। খুঁজলে একই রকম আরো কত দৃষ্টান্ত হয়তো পাওয়া যাবে। এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া বা পালন করা সব কিছুর মূলেই যে সূত্রটি তা হচ্ছে একটি শব্দ 'মা'। গোলাপ মা একদিন তিরস্কার করে বলছেন, আর তোমার যেমন হয়েছে, যে আসবে মা বলে, অমনি পা বাড়িয়ে দেবে। উত্তরে মা বলেন, কি করব, গোলাপ মা? 'মা' বলে এলে আমি যে থাকতে পারিনা। গিরিশবাবুর প্রশ্নের উত্তরে মা নিজেই বলেছেন পাতানো মা নই, গুরুপত্নী নই, সত্যিকারের মা। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবান্দোলনের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তাত্বিকেরা বলেন এই নবযুগ আন্দোলনে শ্রীরামকৃষ্ণ হচ্ছেন সূত্র, স্বামী বিবেকানন্দ হচ্ছেন সেই সূত্রের ভাষ্যকার এবং শ্রীমার জীবন হয়েছে তাঁর ব্যবহারিক প্রয়োগ। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষ্যকার ভারতের জাতীয় আদর্শ বোঝাতে গিয়ে দুটি মাত্র শব্দ ব্যবহার করেছেন — ১) ত্যাগ ও ২) সেবা। যে মাতৃভাব জগতে বিকাশের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমাকে রেখে

গিয়েছিলেন, সেই মাতৃভাবের মর্মকথা হচ্ছে সেবা। উচ্চতম আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞার সাথে ব্যবহারিক বুদ্ধির সংমিশ্রণের এক অতুলনীয় উদাহরণ হচ্ছে মার জীবন। বস্তুত ত্যাগ ও সেবাধর্মের অন্তর্নিহিত শক্তির মূর্ত্তপ্রতিমা হচ্ছেন শ্রীশ্রীমা। তাঁর জীবনে দেখতে পাই কেবলমাত্র দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটিয়ে ঠিক ঠিক সেবার দ্বারা কিভাবে ব্যবহারিক জীবনকে পারমার্থিক স্তরে তুলে নেওয়া যায়।

সেবা শব্দের প্রধান অর্থ হচ্ছে পূজা বা উপাসনা। স্বার্থহীন সেবাতেই চিত্তশুদ্ধি, হৃদয়ের প্রসার ও বিকাশ ঘটে। দেখা যাক মা'র দৃষ্টিতে এই সেবা শব্দটি কিরকম। শ্রীশ্রীমা তাঁর শিষ্য সেবক ঈশানানন্দজীকে বলছেন, "দেখ বিচার করা, মনের নানা প্রশ্নজিজ্ঞাসা করা, জপধ্যান কর্ম করা এসব হল মনের, চিত্তের শুদ্ধতা আনার জন্য কিনা, অনিত্য জিনিস থেকে মনের বিক্ষেপ থেকে মনকে গুটিয়ে শুদ্ধ করে তাঁর সান্নিধ্যলাভের জন্য ব্যকুল হওয়া, তারপর তাঁর কৃপা কিসে হবে তিনিই জানেন। তবে কি জানো, সবচেয়ে তিনি কিসে সন্তুষ্ট হন? সেবাতে, সেবাতে বনের পশুপাখী থেকে স্বয়ং ভগবান — সব বশ। শ্রীশ্রীমার এই সেবাতত্ত্বের প্রকাশ তার জীবনেই ঘটেছে। তার সেবাময় জীবনের প্রকাশ ঘটেছে বিভিন্নরূপে। কন্যারূপে, বধূরূপে, ভগিনীরূপে, সংঘমাতৃরূপে, ভক্তজননীরূপে ও গুরুরূপে। তিনি যে জীবন যাপন করেছেন সে জীবনে তিনি আজন্ম সেবিকা, উচ্চ-নীচ, পরিচিত-অপরিচিত সকলের সেবাতেই নিযুক্তা।

জয়রামবাটীতে বাবা রামচন্দ্র মুখুজ্যের অভাবের সংসারে, একটু বড় হবার সাথে সাথে কন্যারূপে তিনি সংসারের সেবাতে নিজেকে একাত্ব করলেন। সব সাংসারিক কাজে বালিকা সারদা সাধ্যমত সাহায্য করতেন। শ্যামাসুন্দরী দেবী অপরাগ হলে ছোট্ট মেয়ে সংসারের সেবাতে রান্নার দায়িত্বও পালন করেছেন। পরবর্তীকালে বলতেন আমি রাঁধতুম, বাবা ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে দিতেন। পরিবার প্রতিপালনের জন্য মায়ের বাবা তাঁদের সামান্য কয়েক বিঘা জমিতে ধান ও তুলা প্রভৃতি চাষ করতেন। শ্যামাসুন্দরী দেবী কোলের মেয়ে সারদাকে ক্ষেতে শুইয়ে তুলো তুলতেন। একটু বড় হয়ে সারদাও মাকে ঐ কাজে সাহায্য করেছেন। মায়ের নিজের কথায় পাই, "ছেলে বেলায় গলা সমান জলে নেমে গরুর জন্য দলঘাস কেটেছি। ক্ষেতে মুনিষদের জন্য মুড়ি নি যেতুম, একদিন পঙ্গপাল সব ধান কেটেছিল। ক্ষেতে সেই ধান কুড়িয়েছি। ক্ষেত থেকে তুলো এনে আমরা কত পৈতে কেটেছি। আজকালকার মেয়েরা কি আর অত কাজ করবে? মা বাবা ছাড়াও বাড়ীতে তিন কাকা ছিলেন। বালিকা সারদা এঁদের সেবা যত্নও করতেন এবং এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন আমরা বুড়া জ্যাঠার যেমন সেবা শুশ্রুষা করেছি, এখনকার ভাইঝিরা তা করে না"—।।(শৈশব ও কৈশোরের মায়ের শ্রদ্ধামিশ্রিত সেবা পরায়না মূর্তিটি সকলকে মুগ্ধ না করে পারে না)

এর পরের দৃশ্যে দেখি বধূরূপে -স্বামী-দেব-দ্বিজ-অতিথি সেবা গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা ও স্বামীর পরিবারের সেবায় মা সারদা আত্ম সমর্পিতা, তাঁর সেবায় বৈশিষ্ট্য এই যে তা কেবল কর্তব্যজ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয় এর মধ্যে ছিল আন্তরিকতা ও প্রাণের টান।

বাংলার ১২৭১ সাল। মার বয়স তখন ১১ বছর মাত্র। জয়রামবাটীতে অকালে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়। মায়ের বাবার কিছু ধান মজুত ছিল। গরিব ব্রাহ্মণ নিজের পরিবারের লোকজন কি খাবেন তার কথা চিন্তা না করে ঐ সঞ্চিত ধানের সদ্ব্যবহার করলেন দুর্ভিক্ষ পিড়ীত মানুষদের সেবা করে। মা বলছেন, "এক একদিন এমন হত, এত লোক এসে পড়ত যে খিচুড়িতে কুলোত না। তখন আবার চড়াতে হত। আর সেই গরম খিচুড়ি সব যেই ঢেলে দিত, শিগগির জুড়াবে বলে আমি দুহাতে বাতাস করতুম। আহা ক্ষিদের জ্বালায় সকলে খাবার জন্য বসে আছে।" কথায় বলে যার হয় নয়তে হয় না হলে নব্বইতেও হয় না। ছোট, ঘটনা কিন্তু তা ভাল ভাবে বুঝিয়ে দেয় যে বাল্যকাল থেকেই এই সেবা পরায়না মূর্ত্তিটিই ভবিষ্যতে বিশ্বজননীর আসন গ্রহণ করবে। ভগনিরূপে নিঃস্বার্থ সেবার কথা বলতে গিয়ে মায়ের ভাই কালিমামা বলেছেন, দিদি আমাদের সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। আমাদের বাঁচিয়ে রাখবার জন্য দিদি কিনা করেছেন। ধান ভানা, পৈতা কাটা, গরুর জাবনা দেওয়া, রান্না বান্না বলতে গেলে সংসারের বেশী কাজই তো দিদি করেছেন"।

এই পুণ্যজীবন অনুধ্যানের পরবর্তী রূপটি হচ্ছে বধূরূপে সেবাযত্ন সম্পাদন। এইরূপের প্রশাকটিও কম মধুর নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বিয়ের পর প্রথমবার জয়রামবাটী গেছেন, মায়ের বয়স মাত্র সাত বছর। কিন্তু এই বালিকাকে কে শিখিয়ে দিল পথক্লান্ত স্বামীর পা ধুয়ে দিয়ে পাখা দিয়ে বাতাস করতে। বলা যায় যে এই সেবার মাধ্যমেই যুগ্মদিব্যলীলার শুভারম্ভ। দক্ষিণেশ্বরের নহবতে বাস করছেন মা। আর কি নীরবে নিভৃতে প্রাণঢালা সেবা করছেন স্বামী এবং শাশুড়ি মাকে। ঠাকুর মাকে জিজ্ঞাসা করছেন কি গো তুমি কি আমায় সংসার পথে টেনে নিতে এসেছো? শ্রীমা বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে উত্তর দিলেন — না তোমাকে তোমার ঈষ্টপথেই সাহায্য করতে এসেছি। ভেবে দেখুন কত বড় প্রতিশ্রুতি। একমাত্র সেবাতে উৎসাহিত প্রাণ হলেই এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া যায়। জগৎ দেখল এমন ভালবাসায় ভরা অথচ নিজের সংসার সুখের বিন্দুমাত্র প্রত্যাশাটুকু নেই। না চাওয়ার মধ্যে যে মর্যাদা, শুধু দিয়ে যাবার মধ্যে যে গৌরব — সেই চেতনার আদর্শ হচ্ছেন আমাদের মা। (শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে শ্যামপুকুর ও কাশীপুরে শ্রীশ্রীমায়ের যে জীবন সে তো একটি নীরব পরিষেবিকার জীবন।)

ঠাকুরের মা শেষ বয়সে চলাফেলা করতে পারতেন না। বৌমা সারদার উপরই নির্ভর করতেন। শ্রীমা তা জানতেন তাই বৃদ্ধা কোন প্রয়োজনে ডাকলে তিনি তাড়াতাড়ি ছুটে তাঁর কাছে যেতেন। কেউ যদি সাবধান করতেন যে এভাবে ছোটাছুটি করলে নহবতের নিচু জায়গাতে মাথা ঠুকে যেতে পারে মা উত্তর দিতেন হলেই বা, তিনি আমার গুরুজন আর মা। আহা তিনি বুড়ো হয়েছেন , আমি যদি তাড়াতাড়ি না যাই তাঁর অসুবিধা হতে পারে। সেজন্য দৌড়ে যাই।

বিশেষত কাশীপুরের সেবিকা রূপের মধ্যেই যেন লুকিয়ে রয়েছে আরো দুটি রূপের যা পরস্পরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তার একটি হচ্ছে সংঘজননী অপরটি গুরু বা ভক্তজননীরূপে। সংসারে দেখা যায় ছোট বেলায় বাবা গত হলেও যে সংসারে মা আছেন সে পরিবারটি নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে গেলেও ঠিক একদিন না একদিন দাঁড়িয়ে যাবে। রামকৃষ্ণ সংঘ পরিবারটি যেন এর প্রকৃত উদাহরণ। বুদ্ধগয়া দর্শনে গিয়ে সেখানকার মঠের সাধুদের সংঘজীবন সচ্ছলতা দেখে মা প্রার্থনা করলেন তাঁর ছেলেদের যে অ... থাকার ব্যবস্থা হয়।

যোগীন মা বলছেন শিলটি নোরাটি দেখেও কেঁদে কেঁদে বলেছেন, আমার ছেলেদের একটু মাথা রাখবার জায়গা কর, দুটি খাবার সংস্থান কর। মায়ের সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে। 'স্নেহেন বধ্নাসি মনোয়স্মদীয়ম্' — সকলকে স্নেহ দিয়ে আবদ্ধ করেছেন। তবে স্নেহ দিয়েছেন বলেই সঙ্ঘজননী নন। সঙ্ঘকে সুনির্দিষ্ট পথে চালিয়েছেন বলে তিনি সঙ্ঘজননী। পথটি কিরকম? পথটি চিরাচরিত সনাতনী প্রথা থেকে পৃথক। শ্রীরামকৃষ্ণের মহাবাণী 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' । ভ্রান্তিবশত যাদের লোকে মানুষ বলে, সেই নারায়ণের সেবা। এই সেবাব্রতের সবদিক দিয়ে যেন বিকাশ হয় মা তার পথনির্দেশ করেছেন।

রামকৃষ্ণ সংঘের সেবাযজ্ঞের চারটি বিশেষ অঙ্গ হচ্ছে — শিক্ষা ও কৃষিমূলক, চিকিৎসা বিভাগ, ত্রাণসেবা ও গ্রাম উন্নয়ন। মায়ের প্রত্যক্ষ পরোক্ষ সবরকম অনুপ্রেরণাতেই সবকটি অঙ্গ হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে। আবার এই সেবাব্রতের মূল মন্ত্রটি তিনি সর্বদা মনে করিয়ে দিয়ে বলছেন, "আমাদের যা কিছু সবের মূলে ঠাকুর। তিনিই আদর্শ, যা কিছু করনা কেন তাঁকে ধরে থাকলে কোন বেচাল হবে না।" প্রত্যেকটি সেবামূর্ত্তির বিশালতা এতটাই যে সময়ের ফ্রেমে ফেলে তার ঠিকভাবে অনুধ্যান করতে পারা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। এই ক্ষুদ্র প্রয়াসে আরেকটি বিশাল রূপের কয়েকটি ছবি দেখার চেষ্টা করি। জগতকে আপনার করে নিতে শেখ। কিভাবে শিখব, নিঃস্বার্থ ভালবাসায়। সেবা করে। জয়রামবাটীর এক অনাথা বিধবার কানের মধ্যে ঘা হয়েছে। ভদ্রমহিলার থাকার মধ্যে আছে এক নাবালক ছেলে। যত্ন ও চিকিৎসার অভাবে ঘা এত বড় হয়েছে যে কেউ দেখার নেই, মা খবর পেয়ে এক ব্রহ্মচারীকে সঙ্গে নিয়ে নিমপাতার জল গরম করে পিচকারী দিয়ে ঘা ধুয়ে পরিষ্কার করে এলেন। আবার দেখা যায় খোষ পাঁচড়ার যন্ত্রণায় কাতর রাখাল বালকের সেবা করতে গিয়ে রাতকরে উঠে নিজের হাতে নিমপাতা-হলুদ বাটছেন। কলকাতার ভক্তরা জয়রামবাটীতে এসেছেন। দুধ ছাড়া চা খাবার অভ্যাস তাদের নেই। অথচ ঐ গণ্ডগ্রামে এরকম অভ্যাস তখনও ছিলনা বলে লোকের বাড়ীতে বাড়ীতে দুধ ভিক্ষা করতে যাচ্ছেন। ছেলেদের ভাল খাওয়াবেন বলে নিজের মাথায় করে সকলের অজান্তে শাক সব্জি বয়ে আনছেন। আবার ভক্তের তৃপ্তির জন্য নিজের হাতে বিছানার চাদর ইত্যাদি পরিষ্কার করে আরেক রকম সেবা করছেন। এই সেবা দেশ-কালের গণ্ডী ভেদ করে গেছে। তবে তাতে মাধুর্য আছে উচ্ছাস নেই। সিস্টার নিবেদিতা এক চিঠিতে লিখছেন, ভালবাসায় ভরা তুমি, তোমার ভালবাসায় আমাদের মত উচ্ছাস বা উগ্রতা নেই। সেই ভালবাসা স্নিগ্ধ ও শান্তির আরেক রূপ, সকলের কল্যাণ আনে, অমঙ্গল করে না কারো"।

সকল সেবার শ্রেষ্ঠ সেবা জীবকে আধ্যাত্মিক জ্ঞান দান করা। শ্রীরামকৃষ্ণের লোকান্তরিত হবার পর থেকে প্রায় দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর ধরে শ্রীশ্রীমা আন্তরিকভাবে বিশ্ববাসীর সেই সেব করে গেছেন আরেকটি রূপে, সেই রূপটি হচ্ছে গুরু। তাঁর মধ্যে যে রূপের আবির্ভাব ঘটেছিল তা মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ সেবাতে নিয়োজিত থেকে চরম চরিতার্থতা লাভ করেছিল। বিরজানন্দজী জয়রামবাটীতে এসেছেন দীর্ঘ শরীর নিয়ে। অনেক চিকিৎসা ঔষধ পথ্যেও সে শরীর সারেনি কিন্তু মা দেখামাত্র জিজ্ঞাসা করলেন, "ধ্যান কোথায় কর, হৃদয়ে না সহস্রারে"? যখন শুনলেন সহস্রারে মা বললেন, সেকি বাবা ওযে শেষ অবস্থার কথা। প্রথমে মনকে একান্ত মস্তকে নিয়ে গিয়ে পরে হৃদয়ে জমিয়ে এলে ধ্যান করতে হয়। চিকিৎসা, নিয়মশৃঙ্খলা, পথ্যাদিতে যা হয়নি মায়ের এক উপদেশে তাই হল বিরজানন্দজী সুস্থ হয়ে উঠলেন।

পরিশেষে বলি মানুষের সাথে মানুষের যে কৃত্রিম ভেদরেখা সমাজ তৈরি করেছে এবং মানুষের মহিমার অমর্যাদা করেছে, সারদা দেবী প্রতিনিয়ত তা ভেঙেছেন। মায়ের গণ্ডীভাঙা মাতৃভাব সেবাভাবের উপরই প্রতিষ্ঠিত। মা এমন একটি জীবন-যাপন করেছেন যেখানে তিনি সকলের সেবিকা। উচ্চনীচ পরিচিত অপরিচিত সকলের সেবাতেই নিযুক্তা। আর এই সেবাপরায়ণতা থেকেই তিনি আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ১) আমি মা থাকতে ভয় কি? ২) আমার উপর ভারদিয়ে নিশ্চিন্ত থাক এবং তৃতীয় প্রতিশ্রুতি যাঁরা আমার সন্তান তাদের মুক্তি হয়ে আছে। মার কাছে প্রার্থনা আমরা যেন আমাদের জীবনে এই সেবাতত্ত্ব ও আদর্শকে চালিত রূপ দান করতে পারি। তাতেই তাঁর সন্তান বলে পরিচয় দিতে পারব এবং বোধ করতে পারব আমার একজন মা আছেন।

"আমরা চাই সেই ধর্ম যা মানুষ তৈরি করে...। আমাদের চারদিকে যাঁরা আছেন তাঁদের পূজা সর্বাগ্রে প্রয়োজন...। এরাই আমাদের ভগবান। এবং প্রথম আমাদের যে দেবতাদের পূজা করতে হবে তাঁরা হলেন আমাদের স্বদেশবাসী।"
স্বামী বিবেকানন্দ।

“বরিষ ধারা মাঝে শান্তির বারি”

শ্রীমৎ ভিক্ষু কুশালায়ন

আজকের পৃথিবী যেন এক অন্তহীন অস্থিরতার প্রান্তরে দাঁড়িয়ে আছে। মানুষ দিশেহারা, রণক্লান্ত, উদ্বিগ্ন, বিষন্ন। আধুনিক সভ্যতার চমকপ্রদ অগ্রগতি সত্বেও চারপাশে যেন বেড়ে চলেছে ঘৃণা, হিংসা, বিভেদ, হাহাকার ও মানসিক বিপর্যয়। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা — সব কিছুতেই সৃষ্টি হচ্ছে দূরত্ব, বিদ্বেষ, অসহিষ্ণুতা। যুদ্ধ, সন্ত্রাস, বৈষম্য আর লোভের ছায়া যেন গ্রাস করছে মানবতার সমস্ত রূপ। এমন এক ঘন অন্ধকারে মানুষ বারবার খুঁজে ফিরছে প্রকৃত শান্তির পথ, এক শাশ্বত আলোর দিশা। আর ঠিক সেইখানে, এক অনন্ত দীপ্তির মতো, আজও আমাদের সামনে জ্বলে ওঠে ভগবান বুদ্ধের চিরন্তন বাণী।

অশান্তির মূলে যে অজ্ঞানতা ও তৃষ্ণা রয়েছে সে সম্পর্কে বুদ্ধ বলেছেন, ‘অজ্ঞনতাই সমস্ত গঠনের (সংসারের) মূল। মানুষ যে হিংসা করে, লোভে পড়ে, বিভেদ সৃষ্টি করে তার মূলে রয়েছে অজ্ঞানতা, অন্তর্নিহিত অন্ধকার। আমরা ভুলে যাই যে সমস্ত প্রাণী দুঃখ এড়াতে চায়, ভালোবাসা ও সহানুভূতির কাঙাল। অথচ আমরা অহংকার, আত্মকেন্দ্রিকতা ও ভোগের মোহে অন্যের কষ্ট উপেক্ষা করি। এই তৃষ্ণা (ভোগের, জয়ের, অধিকার করার, জড়তার) মানুষকে করে তোলে নিষ্ঠুর, অস্থির, আত্মবিস্মৃত। এই চরম অন্ধকারে বুদ্ধের বাণী যেন এক প্রশান্ত দীপশিখা। তিনি বলেন, “ঘৃণায় ঘৃণা নয়, কেবল অহিংসা ও প্রেমই ঘৃণাকে প্রশমিত করতে পাবে। এটাই চিরন্তন সত্য।” এই বাণী শুধু ধর্মীয় শিক্ষা নয়, এটি এক পরিপূর্ণ মানবিক দর্শন, একটি জীবনের পথ। যেখানে নেই প্রতিহিংসা, নেই ‘আমার’ ও ‘তোমার’ বিভেদ — আছে কেবল অনুকম্পা, সহানুভূতি ও প্রজ্ঞার প্রভা। যে মুহূর্তে কেউ অন্যকে বোঝে, অনুভব করে, ভালোবাসে, সেই মুহূর্তেই তার ভেতরের অন্ধকার দূর হয়।

তিনি বলেন, “সকল সত্বা সুখী হোক, শান্তিতে থাকুক” — এই প্রার্থনা যেন হয়ে ওঠে সমগ্র মানবজাতির অন্তরের ভাষা। আজকের অস্থির বিশ্বে সবচেয়ে প্রয়োজন একটি “নৈতিক বিপ্লব” — একটি অহিংস বিপ্লব, যা শুরু হতে পারে আমাদের নিজস্ব হৃদয়ের পরিবর্তন দিয়ে। বুদ্ধ বলেন, “নিজেই নিজের আশ্রয়, অন্য কেউ নয়।” অর্থাৎ পরিবর্তন শুরু হোক নিজের ভেতর থেকে। লোভ নয়, দান। হিংসা নয়, সহানুভূতি। বিভক্তি নয়, সমমনা একতা। এগুলোই হোক আমাদের প্রত্যয়।মৈত্রী (মেটতা), করুণা, মুদিতা (সহানুভূত আনন্দ) এবং উপেক্ষা, এই চার ব্রহ্মবিহার শুধু আত্মিক উন্নতির নয়, বরং একটি শান্ত সমাজ গঠনের মূল ভিত্তি।

বুদ্ধের বাণী কোনো সময়বিশেষের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়। এটি চিরন্তন, সর্বজনীন, সার্বিক। আজকের যুগে যখন প্রযুক্তি পুরো বিশ্বকে আমাদের হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে। কিন্তু হৃদয় থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে পাশের মানুষকে। তখন বুদ্ধের বাণী, নৈতিক দর্শন, আমাদের নতুন করে ভাবতে শেখায়। যদি আমরা চাই এই পৃথিবী সত্যিকার অর্থে শান্তিপূর্ণ হয়ে উঠুক, তবে বুদ্ধের শুদ্ধ বাণীকে আমাদের অন্তরের গভীরে স্থান দিতে হবে। যে বাণী বলে, “ধর্ম সত্যিকার অনুশীলনকারীকে রক্ষা করে।” আমরাযদি ধর্মের আলোয় নিজের হৃদয়কে জাগ্রত করতে পারি, তবে ঘৃণা ও হিংসার এই অন্ধকার নিশ্চয়ই একদিন ছিন্ন হবে। এবং তখনই এই অশান্ত পৃথিবীতে আবার জ্বলে উঠবে সত্য, শান্তি ও প্রজ্ঞার চিরন্তন দীপ।

ক্ষরণ বাহিরে, ক্ষরণ ভিতরে

বিমান ধর

সুরঞ্জনা, ঐখানে যেয়োনাকো তুমি / বলোনাকো কথা অই যুবকের সাথে / ফিরে এসো সুরঞ্জনা / নক্ষত্রের রূপালী আগুন ভরা রাতে / সুরসুচনা গ্রীভার বিপ্রতীপ ভঙ্গীতেই কি যুদ্ধের বারুদ? গ্রীভা ঘুর্ণয়নের সত্যাসত্যে কি যুদ্ধের আবাহন? কবি জীবনানন্দ কোন্ যুদ্ধের কথা বলছেন? তাঁর প্রার্থিত তিলোত্তমার অচঞ্চল অবয়বে যুদ্ধে মত নেই। ' নিখুঁত মুখাবয়বে শান্ত সুশ্রী বিশ্রামের তৃপ্তি যে তৃপ্তি বনলতা সেনে ভয়ঙ্কর ভাবে উচ্চারিত। পাখীর নীড়ের মতো চোখ, সে তো কর্মক্লান্ত দিবাবসানে নির্ভর আশ্রয়ের পিপাসা। কিন্তু সে অর্জন বিনা যুদ্ধে নয়। সমস্ত দিনের শেষে, কর্মে মুখর, ঐ দিনে, সংঘাতের দিন যাপন নিশ্চয়তার জন্যে প্রতিপক্ষের মোকাবেলার দিন। আবহে রয়েছে মানুষে মানুষে যুদ্ধ, সংঘাত, সে সংঘাত ব্যাপ্ত রাষ্ট্রদেহে তারো বেশী তীব্রতায় কবি হৃদয়ে। নিজের সঙ্গে / জীবনানন্দ চিহ্নিত হন নির্জনতার কবি বলে, নির্জনতা মানে নিস্তেজ প্রান্তবাসী নয়, কবির নির্জনতার ভালোবাসা যুদ্ধ জয়ের ফসল। সুরঞ্জনা তার যুদ্ধ জয়ের স্মারক / অতএব বলিষ্ঠতায় তিনি বলতে পারেন "রণরক্ত সফলতা সত্য, তবু শেষ সত্য নয় / শেষ সত্য কোথায় বা চরম পরম প্রাপ্তি"? রবীন্দ্রনাথের ভাষায় সে আছে 'নয়ন তারায়'। আর জীবনানন্দর ব্যাঞ্জনায় কাঠামো তিলোত্তমা রূপে। এই অর্জনের জন্য কবিকে লড়তে হয়। কবি সকলকে নিয়ে লড়িয়েও নেন। এই যে কবি ও সমাজের আত্মীয়তার যৌথ অর্জন এ কেবল কবির একার চাওয়া নয়, সম্মলিত, কবি রনিত হন হৃদয় থেকে হৃদয়ে। কবি জানেন যুদ্ধের ক্ষেত্রান্তর আছে। সমাজের দহন, রাষ্ট্রের বৈরীতা, প্রতিদ্বন্দ্বীর অস্ত্রাঘাত, রক্তপাত এবং রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে অহৈতুক সংঘাত রক্তক্ষরণ - ভয় এই যাবতীয় প্রতিরোধকে পরাস্ত করে কবি দ্বিতীয়

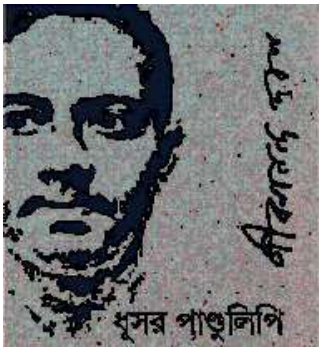

রণক্ষেত্রে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন। সে যুদ্ধ চলে তার মনের ভেতরে চারিদিকে মশারির সমাহীন বিরুদ্ধতা, কবি বলছেন তবুও। "রক্ত ক্লেদ বসা থেকে রৌদ্রে ফের উড়ে যায় মাছি, সোনালি রোদের ঢেউয়ে উড়ন্ত কীটের খেলা কত দেখিয়াছি"। অসাধারণ প্রত্যয়ে জীবনানন্দ হতাশার মধ্যেও উচ্চকিত হন এই উচ্চারণে "হে প্রগাঢ় পিতামহী, আজো চমৎকার? আমিও তোমার মতো বুড়ো হব — বুড়িচাঁদটাকে কালীদহে বেনোজলে করে দেব পাড়, আমরা দু'জনে মিলে শূন্য করে চলে যাব জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার।" কবি আজীবন ভুগেছেন আশা নিরাশার দ্বন্দ্বে । "সুচেতনা, তুমি এক দূরতম দ্বীপ/ বিকেলের নক্ষত্রের কাছে/ ঐ দূরাভীমুখী পথ পরিক্রমায় "অনেক রৌদ্রে ঘুরে প্রাণ / পৃথিবীর মানুষকে মানুষের মতো / ভালবাসা দিতে গিয়ে তবু, / দেখেছি আমারি হাতে হয়তো নিহত / ভাই বোন বন্ধু পরিজন, পড়ে আছে / পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন"। কিন্তু প্রতিকূল নৈরাশ্যেও কবি যেমন প্রত্যাশা করেন "কলকাতা কল্লোনিনী তিলোত্তমা হবে" তেমনি কৃতজ্ঞ থাকেন জীবনের আশ্রয়দাত্রী জগতের কাছে "মানুষ তবুও ঋণী পৃথিবীর কাছে"।

ধূসর পাণ্ডুলিপি জীবনানন্দের প্রকাশিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ। ধূসরতার মধ্যে কবি বলতে ভুলেন না "নক্ষত্রের পানে যেতে যেতে / জন্মেছি আমি এক সবুজ ফসল।" 'ধূষর পাণ্ডুলিপি'র রচনাকাল ১৯২৫ থেকে ১৯২৯ সাল। ঐ সময়েই কুয়াসার প্রায়ান্ধকার সরিয়ে তাঁর হৃদয়ে আলোকের বিচ্ছুরণ সচেতন পরিপক্কতায় বনতলা সেন। তথ্য বলে ঐ একই সময়ে বনলতা সেনের কবিতাসমূহও তিনি রচনা করেছেন। সময়ের ইতিহাস আমাদের বলে দেয় কবি তখন নিজের মনে ভাঙছেন গড়ছেন। এই ভাঙাগড়ার সিঁড়ি উত্তরনই জীবন। সফল উত্তরন সফল জীবন। কিন্তু ব্যক্তির

সঙ্গে ইতিহাস মিশে আছে। ইতিহাস মানে অতীতে দীর্ঘ পদযাত্রা ঐ ক্লেশ কর অথচ উদ্দীপক যাত্রার উৎফুল্লতাই তো জীবন। তাই, 'ক্ষণ' কে নয়, সময়ের সঙ্গে রণ করেছেন। কদর্যতাকে উপেক্ষা করে জীবনের উপান্তে মহা পৃথিবীর মণ্ডল পরিক্রমায় কবি আবারো নিষ্ঠ রয়েছেন মানুষে, সমাজে, বিশ্বে। "----- রক্তপথে পৃথিবীর ধূলির ভিতরে / হে সিন্ধুসারস / জানোনাকো আজো কাঞ্চি, বিদিশার মুখশ্রী মাছির মতো ঝরে / সৌন্দর্য রাখিছে হাত অন্ধকার ক্ষুধার বিবরে / গভীর নীলাভতম ইচ্ছা মানুষের, ইন্দ্রধনু ধরিবার ক্লান্ত আয়োজন।" এই ক্লান্তি এবং অবসাদের কারণ অন্তহীন রণের ক্লান্তি।

জীবনানন্দের মৃত্যু ১৯৫৬ সালে। মৃত্যুতে তাঁর শরীর থেকে রক্তপাত ঘটেছিল কারণ কলকাতার রাজপথে ট্রামের ধাক্কায় তাঁর অপঘাত মৃত্যু। কল্লোলিনী তিলোত্তমা তিনি দেখে যেতে পারেননি। তিলোত্তমা না দেখলেও রণরক্তে কলুষ পৃথিবী তিনি দেখেছেন। বিংশ শতাব্দীর সর্বাধিক মানব হনন কারী ধংসাত্মক যুদ্ধ। এ যাবৎ ঐতিহাসিকদের সংগ্রহে ছিল দুই কোটি লোকের লাসের তালিকা। প্রথম মহাযুদ্ধ ছিল দ্বিতীয়ের নান্দীমুখ। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ব্যাপ্তি ১৯১৪ থেকে ১৯১৯। আর দ্বিতীয়ের সূচনা কাল ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দ। দু'কোটি অপঘাত মৃত্যু ঘটিয়ে অবসন্ন বীরেরা অস্ত্র মুষ্ঠিমুক্ত করেন ১৯৪৫-এ। তাও দু'কোটি মৃত্যু যোদ্ধাদের তেজ কমাতে পারেনি, বাতি নিভে গেল একটি মাত্র আত্মহত্যায়। কেউ বলেন বিষ ক্রিয়ায়। সৈয়দ মুজতবা আলী ৫০ ফুট গভীরে কংক্রিটের বাঙ্কারে শব্দিত বুলেটের শব্দ শুনেছেন। হিটলার নিজেকে নিজে গুলিবিদ্ধ করেছিলেন। ঐ গুলির শব্দ জয়ীদের এক পক্ষকে উত্তেজনার প্রাবল্যে বড় এক আধুনিক শহর জাপানের হিরোসিমা এবং জাপানের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সংগ্রহকেন্দ্র নাগাসাকিকে মাটিতে গুড়িয়ে দিয়ে বালখিল্য উত্তেজনায় মাতিয়েছিল। কবি জীবনানন্দ ঐ কুৎসিৎ বিকৃততার ভয়াল ধংস নির্ঘোস-কালে যাপন করেছেন। তারো আগে হাজার বছরের অতীতের মানবিক অনুভূতিকে বহন করে প্রেম, ভালবাসা এবং সভ্যতার নিযাসে সার্থক মানবিকতার পূর্নাবয়ব মূর্ত্তি এঁকেছেন। এখানেই তাঁর সমাধান বাণীও আমরা শুনি 'জড় ও অজড় দুই ডায়ালেকটিকে মিলে আমরা বেঁচে থাকি'। অসাম্য আমাদের হিংস্র করে, অধঃপতিত করে। আবার এই অধঃপতনও বাস্তব, মানুষের মনের অন্তর্গূঢ়ে হিংস্রতার বাস, অসুন্দরের প্রতি ভালবাসা — এই নেতির সমুদ্র গর্জন নিয়ত শ্রুত। কিন্তু অনভিপ্রেত কুৎসিততার থেকেই জীবনকে তুলে আনতে হবে। কোথাও জীবন আছে জীবনের স্বাদ রহিয়াছে, এই বিশ্বাসের দৃঢ়তাইতো বহন করে বলে কবি সহপদাতিক হয়েও দু'পা এগিয়ে। এই বিশ্বাস ব্যক্ত করেছেন জীবনানন্দ। তারই সমকালের আরেক কবি সুকান্ত ইচ্ছাকে শ্রমের অনিবার্যতায় নিয়ে এসেছেন, "রক্তে আনো লাল, রাত্রির গভীর বৃন্ত থেকে ছিঁড়ে আনো ফুটন্ত সকাল", যে শ্রমই কেবল পৃথিবীকে বাসযোগ্য করতে পারে। দুই কবির ভাষায় ভিন্নতা রয়েছে, সরবে নীরবে যুগলবন্দি কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোরাসের সমাপ্তি ঘটে একইসঙ্গে।

সভ্যতার প্রত্যাশার খোঁজ করলে আমরা আরো অনেককেই পাবো যারা তাদের সহপদাতিক। জীবনানন্দ জন্মেছেন ১৮৯৯ সালে যখন প্রথম যুদ্ধ শুরু হয় ১৯১৪ সালে তখন জীবনানন্দের বয়স পনের। এই মহাসময়ের আঁচ আমাদের ভারতের জনজীবনে, ব্যক্তির জীবনে তেমন ভাবে আঘাত করেনি। সে মহাযুদ্ধ হলেও, তা সীমিত ছিল ইউরোপ মহাদেশে। সময়টা তখন ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে, বিশ্বে উপনিবেশ শক্তির মধ্যে প্রতিযোগিতা কিন্তু যুদ্ধের মূলে, সার্বিয়ার সম্প্রসারণবাদীদের দ্বারা অষ্ট্রিয়ান যুবরাজের হত্যা। ছিল সুপ্ত চিতায় ঘি ঢেলে দহনমাত্রা বাড়ানো। দেশের রাজকুমার হত্যার প্রতিশোধ নিতে অষ্ট্রিয়া সার্বিয়া আক্রমণ করে। যুদ্ধটা দুই দেশেই সীমাবদ্ধ না থেকে উপনিবেশ বিস্তারে অভিলাসী, জার্মানী অষ্ট্রিয়ার পক্ষ অবলম্বন করে যুদ্ধে নামে। জার্মানীর এই গায়েপড়াটাই গোটা ইউরোপকে যুদ্ধে জড়িয়ে দেয়। জার্মানীর স্বার্থ এবং উদ্দেশ্য কী? সমুদ্র সীমার অপ্রতুলতা, নৌবহরের দুর্বলতার কারণে শক্তি সমকক্ষ হয়েও তার উপনিবেশ নেই। অতএব যুদ্ধে জীতে

শক্তির বিজ্ঞাপন দিয়ে জার্মানী উপনিবেশ বিস্তারে এগুবে। অন্যের দখলীকৃত উপনিবেশ যুদ্ধে জয় করে নেবে।

পাঁচ বৎসর ব্যাপী ঐ যুদ্ধের, এক সৈনিক আর্নেষ্ট হোমিংওয়ে। যুদ্ধে মৃতদেহের হিসেব রাখা তার কাজ, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বিভৎসতা ও অনিশ্চয়তা, মৃত্যুভয়, তার বাড়ীঘর, স্বজন, তার ভালবাসা হারানোর আতঙ্ক ও হাহাকার যাপনের এক বিমর্ষ সৈনিক, সে কবি বা অকবি বা হতে পারে মৃত্যুর ভয়ঙ্করতা, জীবনের অনিশ্চয়তা ভালবাসার জন্য হাহাকারই তাকে কবিই করেছে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে মুক্তি পেয়ে লিখলেন যুদ্ধের বিভৎসতার বিষয়ে এক বিপ্রতীপ মহাকাব্য, পদ্যের ছন্দে নয়, গদ্যে অথচ হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা আর্তির সংমিশ্রণে যা কাব্যময় এক উপন্যাস 'ফেয়ারওয়েল টু আর্মস'। অস্ত্রকে বিদায় জানালেন কবি।

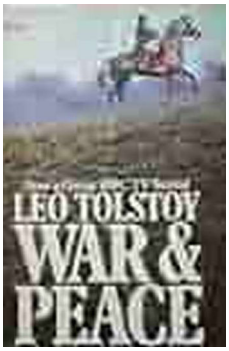

হোমিংওয়ে অস্ত্রকে বিদায় জানানোর আহ্বান রেখে ব্যক্তির এবং সমষ্টির চিত্তবৃত্তিতে এক নবীন মূল্যবোধের আহ্বান রাখলেন। বইটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৯ সালে। প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হবার দশ বছর পরে। যুদ্ধের ক্ষতি তিনি এতকাল নিজেই বহন করেছেন। হয়তো এই দশ বছর ছিল তার প্রস্তুতি কাল। নিজের দহনকে কিভাবে কলমের আঁচড়ে অক্ষরে চিত্রিত করবেন। কাজটা সহ ছিল না। তাৎক্ষণিক আবেগে অসহিষ্ণুতা, ক্রোধ, প্রয়োজনীয় কথার ছাড়, অনাবশ্যকের আড়ম্বর লেখককে লক্ষচ্যুত করতে পারে, তাই আবিল মনের থিতুকাল পর্যন্ত তিনি দহন সইলেন। ভাষাকে সাজালেন প্রয়োজনকে সূত্রবদ্ধ করলেন। মানবিকতার সুন্দর দেহে কোথায় হিংস্রতা আঁচড় বসিয়েছে তা চিহ্নিত করলেন। বিশ্লেষণ পর্বে শান্ত পৃথিবীর হুবহ সুগন্ধির সন্ধান করে যা পেলেন তার নান্দনিক ভাষা হল "War is noting more than the dark, muderous, extension of a word that refuge to acknowledge protect or preserve true love"

আলোকিত বিশ্বে যুদ্ধ কেবল অমার সাধনা করে মৃত্যুকে ডেকে আনে, সমাজ সভ্যতাকে রক্ষার পরিবর্ত্তে প্রকৃত ভালবাসাকে সুরক্ষার পরিবর্ত্তে ভালবাসাকে অস্বীকার করে। জীবন এবং ভালবাসা যমজ তরু। একই কাণ্ডে দুটি শাখা। অপর এক বাংলার কবি জীবনানন্দের চাইতে আরো অনেক বেশী বয়স যিনি বেঁচে ছিলেন, কবি সুভাষ, সুভাষ মুখোপাধ্যায় জীবনানন্দের অনুভূতিকে ভিন্ন আঙ্গিকে, ভাষা প্রয়োগ ব্যক্ত করেছেন "ফুল ফুটুক না ফুটুক তবুও আজ বসন্ত"। প্রশ্ন হবে জীবনানন্দ যেমন নিজেকে তাঁর অনুভূতিকে ক্রমশ নির্জনতায় মসৃণ প্রকাশে সুভদ্র ভাষায় উন্মোচন করেছেন কবি সুভাষও কি তেমনই শোভন সুবেশে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিলেন? জীবনানন্দ লড়াইকে রক্তক্ষয়কে উপেক্ষা করেছেন, মসৃণ মোলায়েমে। তিনি স্বভাব কর্কষ নন বলে তার কর্কষতাকে তার নিজের ভাষায় ব্যক্ত করেছেন এমনটায় পাঠকও যেন কেমন ভদ্র উপেক্ষায় বলেছেন, যা হয়েছে ভুলে যাও এতটা সহনশীল ও সমপরায়ণ কিন্তু সুভাষ নন, তাঁর নির্ঘোষ "প্রিয় ফুল খেলার দিন নয় অদ্য"। এতটা মোলায়েমও নয়, অপর এক বাংলার কবি যেমনটা প্রকাশ্যে বলেন "এ আষাঢ়ে শেষ হোক, কান্নার বন্যা, ও আষাঢ়ে লেখা যাবে মেঘদূত"। বর্ত্তমানকে পাশ কাটানো নয় বর্ত্তমানকে মোকাবেলা করে ভবিষ্যৎ গড়ো। জীবনানন্দের সহ অবস্থান মেনে নেওয়ার নন ঐ কবি, কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। একটি কবিতা লেখা হবে। সে কবিতা লেখা হবে রক্তের অক্ষরে "মৃত্যুকে ফাঁসীতে লটকে দিয়ে / মিছিল এগোয় / আকাশ বাতাস মুখরিত গানে / গর্জনে তার / নখদর্পনে আঁকা / নূতন পৃথিবী, অজস্র সুখ, সীমাহীন ভালবাসা।/ একটি কবিতা লেখা হয় তার জন্যে / তারই ভাষান্তর সুকান্তের কলমে "আকাশে আকশে ধ্রুবতারায় / কারা বিদ্রোহে পথ মাড়ায় / ভর দিগন্ত দ্রুত সাড়ায়। জানে না কেউ।" জীবনানন্দের কম্প্রোমাইজ, সুকান্ত এই ভাষায় খারিজ করলেন।

আসলে এই সব কবিরা যারা যার বিশ্ব রচনা করেছেন সহ অবস্থানে মেনে নেওয়া বিশ্ব। বিশ্ববদলের

প্রতিশ্রুত বিশ্ব। দুইয়ের বিশ্বই সত্য । একজনের লেখনী রসদ পায় দোয়াতে, কলম চুবিয়ে। অপরের উৎস কটিবদ্ধ কোষ থেকে মুক্ত আকাশে যা শত্রুঘাতক তরবারী। একজনের বিশ্ব ভাবনা দ্বন্দ্ববিহীন নিস্তর ইজেলে আঁকা ছবি। আসলে এমন বিশ্বটাই তো চাই। কিন্তু শ্রেণী সংগ্রামের প্রান্তরে রণ-মোকাবেলা না করে দ্বিতীয় বিশ্বের বাস্তবতাকে নিরুদ্দেশে পাঠানো তা হলে রণক্ষেত্র দুটি একটি সহঅবস্থানে লভ্য বলে কবি মনে করেন, অপরটি বিস্তর সংগ্রামে লভ্য। যুদ্ধ, হিংসাকে সহ অবস্থানে মোকাবেলা অসম্ভব অতএব তরবারী হাতে ময়দানে নামে শ্রেণীর জয়, প্রতিপক্ষ শ্রেণীকে রণক্ষেত্রে ধরাশয়ী করেই কেবল সম্ভব।

একজন গদ্যকারকে দিয়ে একটু বেশী কথা বলিয়ে নিই... গাছেরটাও পাড়বো - তলারটাও কুড়োব তা হয় না। হতে পারে না। স্বপ্নে বিশ্বাস রেখেছি, অথচ প্রতীক্ষার ব্রত কখনো শিখিনি, তিতিক্ষায় নিজেকে শক্ত করিনি, প্রতিনিয়ত মনে হয়েছে লাঠির সঙ্গে লটকে নিয়ে এই মুহূর্তে বুঝি আমাদের সুললিত স্বপ্নটিকে পৃথিবীতে থামিয়ে আনা যায়। যায় না। ইতিহাসে কোনও গোঁজামিল সম্ভব নয়। এই সত্যটা শিখতে এতদিন লেগে গেলো বলেই আমাদের উপস্থিত আশাবাদ এবং সন্তান সন্ততিরা আমাদের আয়ত্বের বাইরে। এক জায়াগায় পা তুলছি, পা নামাচ্ছি, অভ্যাস, তাই এখনো মিছিলে যাচ্ছি, প্রবন্ধ মক্সো করছি, কিন্তু ঘুরে ফিরে একই ধূঁয়ো, নিয়তি কেন বাধ্যতে। অশোক মিত্র শ্রেণী যুদ্ধের এমন ক্লান্তিকে গদ্যে বিধৃত করেছেন।

আলোচনা সূত্রে অনেক অনুসিদ্ধান্ত চলে এলো। কিন্তু ফ্যাক্টর একটাই এক সুস্থিত ভালবাসার ভালাগার বিশ্ব। অনুসিদ্ধান্ত সমূহ ক) সহ-অবস্থান, খ) তরবারী হাতে মুখোমুখী হওয়া, গ) সাফল্যের জন্য ধীর-গমন। জীবনানন্দ লড়েছেন হৃদয় নিকুঞ্জবনে, হৃদয়াবেগ তার আয়ুধ। হোমিংওয়ে লড়েছেন অস্ত্র হাতে যুদ্ধের ময়দানে, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়েরা শ্রেণী শত্রুতার প্রতি বিতৃষ্ণায় বিরক্তিতে। কিন্তু সকলেই লড়াকু যোদ্ধা। কেউ লড়ছেন শ্রেণী শত্রুর বিরুদ্ধে কেউ চাইছেন স্থিতাবস্থার মধ্যে শান্তি যেমন দু'দণ্ডের শান্তি প্রত্যাশী জীবনানন্দ দাশ, আবার হোমিংওয়ে সমাজে শ্রেণী সমন্বয়ে তার বিতৃষ্ণা নেই কিন্তু ভালবাসার কাঙাল। কিন্তু সকলের স্বপ্নের বিশ্বের স্বপ্নকে কথার আকারের রেখাটি সফল এঁকেছেন রবীন্দ্রনাথ "এ দুলোক মধুময়, মধুময় বসন্তের ধূলী।" ঐ বসন্তের আবির মেখে সকলকে নিয়ে আমাদের হোলী খেলা। অনার্জিত বলে কেউ অর্জনের স্পৃহায় কলমচি কেউ কেউ সস্ত্রধারী । যেমন প্রকৃত যুদ্ধক্ষেত্রে হোমিংওয়ে ঐ যুদ্ধ জয়ে নজরুল কারার লৌহ কপাট ভাঙতে চেয়েছেন । যুদ্ধ তাকে এতটাই জয়মুখী করেছে যে ভগবানের বুকে পদচিহ্ন আঁকতেও তার দ্বিধা নেই। বলেছেন শান্ত নজরুলকে আমরা সেদিন পাব , যবে উৎপিড়ীতের ক্রন্ধন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না। পর পরিক্রমায় লক্ষের বাস্তিলে পৌঁছানোর পথে সুকান্ত আবার দ্বিধাগ্রস্থকে নিয়ে শান্তকায়, কিন্তু যুদ্ধ জয়ে রণক্ষেত্রে সে নির্মম আকাশে আকাশে ধ্রুতারায় / কারা বিদ্রোহে পথ মাড়ায় / ভাব দিগন্ত দ্রুত সাড়ায়, জানেনা কেউ / উদ্যমহীন মূঢ় কারায় / পুরনো বুলির মাছি তাড়ায় / যারা, তারা নিয়ে ফেরে পাড়ায়, স্মৃতির কেউ / এই রণক্ষেত্র হোমিংওয়ের চাইতে পৃথক / এ যুদ্ধের ময়দানের বিস্তৃতি বৃহৎ / প্রতি মানুষের মনের ভেতরে যুদ্ধ / দুই শ্রেণী দুই চেতনা / কিন্তু পাঞ্চজন্য কার হাতে?

তাহলে শ্রেণী যুদ্ধের বারুদ / ভালাবাসা, প্রেম কি শ্রেণীর বিভেদ মুছে দিতে পারে? পারেনা কারণ প্রতিটি শ্রেণীর অর্জন, লক্ষ্য ভিন্ন। অতএব নন কম্প্রোমাইজ। এ গান্ধার সত্যাগ্রহ নয়, খানিকটা মিল থাকতে পারে, ১৯১৭-এর অক্টোবর বিপ্লবের পর, রুশ দেশ নিজেকে যুদ্ধ থেকে সরিয়ে এনেছিল। বিপ্লব পূর্ব্বকালে সম্রাট জায়ের যুদ্ধ স্পৃহার কারণ ছিল বৈষয়িক লাভ। যে লাভ জারের কোষাগারে জমত কিন্তু লেনিন যুদ্ধ থেকে জাতিকে বিযুক্ত করে নিলেন কারণ জায়ের সর্বস্বতার বিপরীতে সর্বহারাদের জেতাতে। জারের যুদ্ধের রসদ ছিল সর্বহারারা। সৈনিকের পোষাক পড়িয়ে জার তাদের কামানের মুখে ঠেলে দিত। সর্বহারার প্রাণের বিনিময়ে সর্বপ্রাপকদের তহবিল বৃদ্ধি। কিন্তু বিশ বছর পর সেই রুশ স্বইচ্ছায় যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল 'দি গ্রেট সেকেণ্ড ওয়ার্লড ওয়ার'।

এরই যৌক্তিকতা কোথায়? তবে কি যুদ্ধ প্রয়োজনে এবং অপ্রয়োজনে দ্বন্দ্বের দুই অভিঘাত অস্তিত্বে? প্রথম যুদ্ধটা ছিল উপনিবেশ বিস্তারের, আর দখলীকৃত উপনিবেশ রক্ষার কারণে। কিন্তু দ্বিতীয় যুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া কেন অংশ নিল? সকলেই জানেন ১৯৩৯-এর ১লা সেপ্টেম্বর হিটলার পোলাণ্ডের উপর ঝাঁপায়, সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া কিন্তু যুদ্ধে নেই। বরং তার সাম্প্রতিক আগে হিটলার স্ট্যালিন অনাক্রমন চুক্তি সম্পন্ন করেছে। যুদ্ধে রাশিয়ার অংশগ্রহণ আরো বছর দেড়েক পরে হিটলার যখন রাশিয়া আক্রমণ করে, রাশিয়ার পক্ষে যুদ্ধটা ছিল সমাজতন্ত্র রক্ষার জন্য। শ্রমিক শ্রেণীর রাষ্ট্রকে রক্ষার জন্যে। হিটলারের যুদ্ধাকাঙ্ক্ষার পশ্চাতে যেমন ছিল প্রথম যুদ্ধের পর জার্মানীর পক্ষে অবমাননাকর শর্ত যা খোদ জার্মানীকেই ইঙ্গো-ফ্রান্স-মার্কিনীরা উপনিবেশ করে ফেলেছিল, তার থেকে মুক্তি এবং মর্জাদা উদ্ধারের লড়াই। হিটলার ভার্সাই সন্ধিকে সামনে রেখে যুদ্ধের যৌক্তিকতা তুলে ধরেছিল । কিন্তু নিরীহ পোলাণ্ডে হিটলারের ট্যাঙ্ক কেন? আসলে তার উদ্দেশ্য ছিল দুটি, পোলাণ্ডের কৃষিক্ষেত্র দখল করা, আরো গোপন গূহ্য কারণ হলো বিশ্বে নব উত্থিত সর্বহারাদের সমাজতন্ত্র বানচাল করে দেওয়া। রাশিয়ার পক্ষে এটাই ছিল যুক্তি যে শ্রমিক শ্রেণীর রাষ্ট্রকে রক্ষা করতে হবে। বিশ্বের এই নব উত্থিত শক্তি ধনতন্ত্রের বুকে অস্তিত্বের আতঙ্ক জাগিয়েছিল।

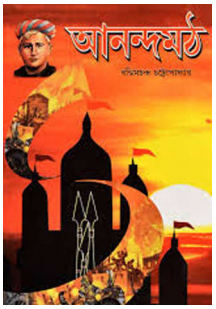

তাহলে যুদ্ধের পশ্চাৎ কারণ হিসেবে আমরা পাচ্ছি শাসক শ্রেণীর নিজেদের মধ্যে লড়াই, শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে ধনীক শ্রেণীর লড়াই। বিশ্বের ঐ কদর্যরূপ দেখেই রবীন্দ্রনাথ নিজের অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন এই বলে "দুঃখ পেয়েছি, দৈন্য ঘিরেছে দেখেছি কুশ্রাতারে / মানুষের হাতে বিষ মিশায়েছে মানুষ আপন হাতে ঘটেছে তা বারে বারে"/ কিন্তু মনুষ্যত্বের অন্তহীন পরাভবকে সত্য বলে মানতে অস্বীকার করেছে কবি। "তবুও তো শ্রবণ বধির করেনি কভু / বেসুর ছাপায় কে দিয়েছে সুর আনি" ঐ দূরাগত সুর ছন্দকেই সত্য মেনেছেন তিনি। একই আশাবাদ দেখি জীবনানন্দে, 'সুচেতনা, তুমি এক দূরতম দ্বীপ / বিকেলের নক্ষত্রের কাছে / সেইখানে দারুচিনি বনানীর ফাঁকে নির্জনতা আছে"। এই নির্জনতাকে আমরা যুদ্ধের হিংসার কোলাহল বর্জিত সুস্থিত বাসভূমি বলব। জীবনে পূর্ণতার স্বাদ পেলে ব্যক্তি মন থেকে হিংসা উবে যায় এবং ঐ বহমান আবহে সে পূর্ণতা ব্যক্তি থেকে বহুতে ছড়িয়ে পড়ে।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কালের মন্দিরা' উপন্যাসে এক বৌদ্ধ শ্রমনের অমূল্য উপদেশ "মন হইতে প্রবৃত্তির উৎপত্তি, মন যদি নিষ্কলুষ থাকে, সুখ তোমার পিছনে ছায়ার মতো থাকিবে।" তার বহুশতক আগে ইতিহাসে দখল নিয়েছিলেন মৌর্য সম্রাট অশোক। যে অশোক রূপান্তরিত। কলিঙ্গ যুদ্ধের ময়দানে সহস্র হত্যায় অভিযুক্ত চণ্ডাশোক নন। ধর্মাশোক অশোক। নিরর্থক হত্যার দহনে শুদ্ধ ধর্মাশোক কাপালিক থেকে তথাগতের শান্ত চরণ তলে হিংসাকে, যুদ্ধকে, প্রবৃত্তির মোহপাশকে দূরে ঠেলে এক মূর্ত্ত বিবেক। ভারতের পথে প্রান্তরে তার নব উপলব্ধি তথাগতের বাণী উৎকীর্ণ করেও তার মনে শান্তি নেই। হিংসার বীজ ছড়িয়ে আছে বিশ্বে। সে বিষ নির্মূলে সফলতা না পেলে বিশ্ব থেকে অশান্তি, যুদ্ধ বিগ্রহ দূর হবেনা অতএব নিজ হাতে নিলেন 'তার যুগের' বিশ্বের ভার পুত্র মহেন্দ্রকে পাঠালেন সিংহলে। কন্যা সংঘমিত্রা অন্যপ্রান্তে। বুদ্ধ, তথাগতই তখন শান্তির ঈশ্বর।

ঐ উপন্যাসের নায়িকার প্রশ্ন ছিল "কেন হিংসা হানাহানি যুদ্ধ? কেন এত লোভ? এত কাড়াকাড়ি? আর্য চিত্রক? চিত্রক উঠিয়া বসিল / নত নেত্রে চিন্তা করিয়া বলিল 'না' / বোধহয় ইচ্ছাই মানুষের নিয়তি / মানুষ যাহা চায় তাহা পাইবার অন্য উপায় জানে না বলিয়াই যুদ্ধ করে, হিংসা করে"। অর্থাৎ যুদ্ধের উৎপত্তি মনে। মনে প্রবৃত্তি জাগে। প্রবৃত্তি লোভকে জাগিয়ে দেয়, অপরের সম্পদ দখল চেষ্টায় তা প্রকট হয়। তার অ্যান্টি ডোট রবীন্দ্রনাথ শুনেন শান্ত শিবের বাণী। তারই ভাষান্তর, জীবানানন্দের কলমে "কোথাও জীবন আছে, জীবনের স্বাদ রহিয়াছে, সাগরের

নোনা ফেলা নয়"। 'যুদ্ধ মনে বাজে ' আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠে শান্তিকে দেখি 'ঘোড়ায় চড়ে চলছেন যুদ্ধের ময়দানে যেখানে জীবানন্দ ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়ছে। তার রণধ্বনী "রমণীতে নাই মন, রণজয় চাহিরে"।

আনন্দমঠের পটভূমি আমরা সকলেই জানি। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী খাজনা আদায়ের নামে প্রজার সর্বস্ব কোড় এক কৃত্রিম দুর্ভিক্ষের কারণ হয়েছিল। সন্তান দল ইংরেজ শাসন থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য লড়ছিল। কোম্পানী শাসন অবসানের জন্য ছিল ঐ যুদ্ধ। শান্তি স্বামীর সহযোদ্ধা হতে চায়। যুদ্ধে জিততে চায়। কিন্তু ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দ মঠ শেষ করলেন এই বলে "বিসর্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়া গেল"। এখানে বিসর্জন ঘটল জীবানন্দ তথা সন্তান দলের কোম্পানীর সঙ্গে যুদ্ধে হেরে গেলেন সন্তান দল। প্রতিষ্ঠা পরাভূত। প্রতিষ্ঠা বিসর্জিত হল। কিন্তু আমাদের, পাঠকদের সহানুভূতি ছিল সন্তান দলের প্রতি। চাই ছিলাম সন্তান দল যুদ্ধে জিতুক। বিদেশী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে নয়, আমরা স্বাধীন থাকতে চাই। তবে কেন বঙ্কিমচন্দ্র বিসর্জনকে বাহবা দিচ্ছেন? তবে কি যুদ্ধটা অনিবার্য ছিল এবং বিসর্জন পক্ষের জয় কাম্য ছিল অর্থাৎ পরাধিনতা? বঙ্কিম চন্দ্রের গূঢ় ইচ্ছা ক্রমশঃ প্রকাশ পেয়েছে কূপমণ্ডুতা থেকে উদ্ধার করতে দেশবাসীর জন্য পাশ্চাত্য জ্ঞান, শিক্ষার প্রয়োজনে। রবীন্দ্রনাথেরও আগে বঙ্কিমচন্দ্রের এই ছিল উপলব্ধি। রবীন্দ্রনাথ তা আদান প্রদানে বলেছেন "দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে"। এখানে যুদ্ধের প্রয়োজন অপ্রয়োজনীয়তার প্রশ্নে নৈতিকতা প্রশ্নের মুখে । কিন্তু দেখা গেল শেষ পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রকে আমরা গ্রহণ করেছি। বঙ্কিমচন্দ্র একটা কল্পিত যুদ্ধকে, আদতে বাংলার সন্যাসী বিদ্রোহকে পটভূমি করেছেন। এখানে যুদ্ধটাকে অনিবার্য বলেই ধরা হয়েছে একটি প্রতিষ্ঠান বদলে নতুনের আবাহন।

যুদ্ধ বা সহিংসতা কখনো অনিবার্য বলে ধরা হয়। আনন্দমঠের জীবানন্দদের মতোই প্রাচীন কালে রোমান মল্লযোদ্ধা স্পার্টকাসের বিদ্রোহ বা তার গণচেতনা জাগরণে বিদ্রোহ। স্পার্টাকাস লড়েছিলেন প্রাচীন রোমে দাস প্রথার বিরুদ্ধে। আবার সভ্যতার দিক পরিবর্তনকারী ফরাসী বিপ্লব, গণবিদ্রোহে ফরাসী বাস্তিল দুর্গের পতন ঘটিয়ে রাজতন্ত্র উচ্ছেদের ইতিহাস, রাষ্ট্রব্যবস্থায় প্রজাতন্ত্রের আবাহন বা ১৯৫৯-এ কিউবায় শাসক বাতিস্তার বিরুদ্ধে ফিডেল কাস্ত্রোর সশস্ত্র বিদ্রোহ এবং জয় লাভ শ্রেণী শাসিত সমাজে তিনটে যুদ্ধ বা সংঘাতকে সভ্যতা অনুকূল বলে গ্রহণ করেছে। রাজতন্ত্রের পরিবর্ত্তে গণতন্ত্র, স্বৈরশাসকের পরিবর্তে শোসিত শ্রেণী রাষ্ট্র কর্তৃত্বে আরোহন এবং দাস প্রথার বিরুদ্ধে স্পার্টকাস প্রতিটি ক্রান্তিতে জনগণকেই মূল্যবান করেছে। রাজা হোক, স্বৈরশাসক হোক বা সম্পদশালীর শ্রম শোষণই হোক বলশালীর পতন ঘটিয়ে জনগণকে জয়ী করেছে এবং শাসন যেহেতু জনগণের জন্যে, এই অধিকার পরগাছায় সমর্পিত না করে জনগণের ইচ্ছা থাকতে হবে। এই জন্যে ক্ষমতাধরদের বিদ্রোহ সভ্যতা অনুমোদন করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বহুপ্রাজ্ঞ নিজেদের মতো অসংখ্য ব্যখ্যা দিযেছেন কিন্তু রাষ্ট্রশ্রেণী শাসন, প্রবল শ্রেণী যে রাষ্ট্র কর্তৃত্ব নিজের অনুকুলেই রাখতে চায় এর চাইতে চরম সত্য পাব কি? এই প্রবলের বিরুদ্ধে হোমিংওয়ের অনুভূতির নির্যাস হল people (যুদ্ধ পিপাসুরা) bring so much courage to this world. The world has to kill them. আমাদের উপনিষদেও এমন অধিকার দিয়েছে শোষিতকে "সে অন্ন যখন কেউ কাড়ে, ধ্বংস করো, ধ্বংস করো তারে"। যারা যুদ্ধ বাঁধায়, যুদ্ধ যাদের প্রয়োজন তাদের যুদ্ধকে মেনে নিয়ে পাশ পাটিয়ে জীবন নয়, ঐ ধ্বংস শক্তিকে রুখে দাঁড়িয়ে ধ্বংস করার নৈতিক অধিকার মঞ্জুর করেছে ধর্মশাস্ত্র যে শাস্ত্র ব্রাহ্মণ নিয়ন্ত্রিত নয়।

এই যে বর্তমানের আরব ইজরাইল যুদ্ধ, বা তিন বৎসর ব্যাপী রুশ ইউক্রেনের যুদ্ধ এর উৎস কী? এই যুদ্ধ আকাঙ্ক্ষার পশ্চাতেও রয়েছে প্রবলের অহংকার, সাম্রাজ্য লিপ্সা, কর্তৃত্ব কায়েম এবং এক বিকৃত মজা, যে মজা বিড়াল পায় ইঁদুরকে তার থাবার তলায় রেখে খেলে। মানব সভ্যতার বয়স পাঁচ হাজার বছরের বেশী নয়। এর মধ্যে কত সহস্র যুদ্ধ সভতা পেছনে ফেলে এসেছে। কত সুন্দর বাছাই করা নাম তাদের। গোলাপের যুদ্ধ ব্রিটিশ সিংহাসনের

অধিকার অর্জনের জন্য, ফ্রান্স ইংল্যাণ্ডের মধ্যে শত বছরের যুদ্ধ। ঐ যুদ্ধ নিস্পত্তিতে শতবছরও উত্তীর্ণ হয়েছিল, তার ব্যাপ্তী ছিল ১৩৩৭ খ্রীঃ থেকে ১৪৫৩ প্রায় একশ কুড়ি বছর। একখণ্ড ভূমির জন্যে অহেতুক যুদ্ধ। ১৮৫৩ থেকে ১৮৫৬, তিন বৎসর ব্যাপী ক্রিমিয়ার যুদ্ধ অটোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে রাশিয়ার হারের যুদ্ধ। ঐ যুদ্ধের অকাব্য দুটি মহাকাব্যের জন্ম দেয়। টলষ্টয়ের 'ওয়র এণ্ড পীস' গদ্য-কাব্য এবং ১৯১৭-এর রুশ দেশে বিপ্লবের পটভূমি রচনা যে সাফল্য বলসেভিকরা পায় প্রথম মহাযুদ্ধের পরিণতিতে, যুদ্ধে দুর্বল জার বলশেভিকদের হাতে ক্ষমতা হারায় জারকে সরিয়ে শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিনিধিরা ক্ষমতা অর্জন করে। বিশ্বে প্রথম বিকল্প শ্রেণী শাসন। বা ১৮১২ থেকে ১৮১৫ তিনবছর ব্যাপী আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ। স্পার্টাকাসের বিদ্রোহ, ফরাসী বিপ্লব, অক্টোবর বিপ্লব, কিউবার মুক্তি সংগ্রাম বা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণ, চীনের মুক্তি আন্দোলন, ভিয়েৎনামের সাম্রাজ্যবাদ বিরুধী আন্দোলন, ইন্দোনেশিয়ার উপনিবেশবাদ বিরোধী আন্দোলন এবং ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনের সশস্ত্র যোদ্ধারা, আজাদ হিন্দ ফৌজের যুদ্ধ, যার নায়ক নেতাজী সুভাষ এই সব যুদ্ধের গুণ নির্গুণ বিচারের ফল কীভাবে গ্রহণ করব? 'ওয়র এণ্ড পীস'-এর নির্যাস তো "War as a force meant to unify people of all classess" – true life fulfillment comes from nonviolance and service to other through love and spiritual clarity".

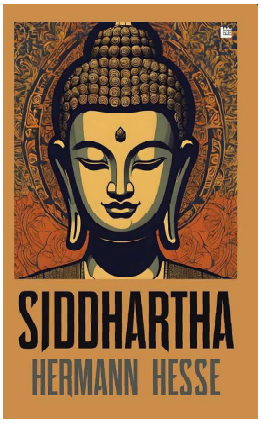

এবার রনক্ষেত্র থেকে সরে আসি। বারুদের গন্ধ মুছে দিই তা বলে কি যুদ্ধ ছিল না? আমরা তো দেখলাম প্রকৃতির সবুজ প্রান্তর রঞ্জিত করে যেমন যুদ্ধ করা যায়, আরো একটি রণক্ষেত্র আছে তা ব্যক্তির হৃদয়ে তবে সে আধিপত্যের লড়াইয়ের দৃশ্যমানতা নেই। আসল যুদ্ধের সূচনা কিন্তু ঐ অদৃশ্য প্রান্তরে। সেই রণের শব্দিত বয়ান ধার করবো শরদিন্দুর কাছে "আমাদের উপত্যকা কোথায় ভারতের পূর্বে কি পশ্চিমে উত্তরে কি দক্ষিণে তাহা আমার ধারণা নাই। ভারতবর্ষের সীমানার মধ্যে কিনা তাহাও জানিনা। উপত্যকার কিনারায় পাহাড়ের গুহাগুলির মধ্যে আমরা একটা জাতি বাস করিতাম। পর্বত চক্রের বাহিরে কখনো যাই না, সেখানে কি আছে তাহাও জানিতাম না। আমাদের জগৎ ঐ গিরিচক্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

আমাদের নারীরা ছিল যোগ্য সহচরী — তাম্রবর্ণ কৃষ্ণাঙ্গী, ক্ষীণ কটি, কঠিন স্তনী। এই সব নারীদের জন্য আমরা যুদ্ধ করিতাম। হিংস্র শ্বাপদের মতো পরস্পরে লড়িতাম। ইহারা দূরে দাঁড়াইয়া দেখিত। যুদ্ধের অবসানে বিজয়া আসিয়া তাহাদের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইত। তা হলে পৃথিবীর আদি যুদ্ধের কেন্দ্র নারীরাই? ট্রয়ের হেলেন, অযোধ্যার সীতা, মহাভারতের পাঞ্চালী, ক্ষেত্রান্তরে তারাই যুদ্ধের বীজ ছড়িয়েছে। এরা সব যুদ্ধ নয় মহাযুদ্ধের প্রথম প্রলাপ। হাজার বছরের পরিক্রমা শেষে কবির বোধের স্বরের স্ফুটন তাই "সুরঞ্জনা ঐখানে যেয়োনাকে তুমি, বলোনাকো কথা ওই যুবকের সাথে"। কথা বলা না বলায় কি যায় আসে। যে সব নায়িকারা যারা যুদ্ধের কারণ হয়েছেন তাদের মধ্যে কেউ কেউ কথা বলেননি কিন্তু অন্ধতাও প্রলয় বন্ধ করতে পারেনি। যুদ্ধ চাইনা কিন্তু যুদ্ধ অনিবার্য। মনে বা প্রান্তরে। কিন্তু থাকবে ভালবাসার সুখও।

জীবনানন্দ এক রকমে জীবনের আনন্দ খুঁজেছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ভিন্নতা থাকলেও তিনি কি একই কথা বলেননি?

"জীবনের যাহা জেনেছি অনেক তাই
সীমা থাকে থাক তবুও তার সীমা নাই।
নিবিড় যাহা সত্য আমার প্রাণে
নিখিল ভুবন ব্যাপীয়া নিজেরে জানে"।

কোলাহল ও প্রতিকূলের মধ্যে জীবন খুঁজে নেওয়া। কিন্তু নির্বান বুদ্ধে। জার্মান উপন্যাসিক হেস্ এর 'সিদ্ধার্থ' উপন্যাস কালজয়ী থেকে যায়। যুদ্ধের আবহেও।

সলিল চৌধুরি, একই বাঁশি বেজেছে আজীবন!

সমীর ধর

১৯ নভেম্বর। ১৯১৫ সালের এই দিনটাতে আমেরিকার সল্ট লেক সিটি কারাগারের ভেতর এক জনপ্রিয় সংগীত স্রষ্টাকে মিথ্যে অভিযোগে ফায়ারিং স্কোয়াডে গুলিতে ঝাঁঝরা করেছিল পুঁজিবাদী রাষ্ট্র। তাঁর অপরাধ, রেল ও তামার খনিতে শ্রমিক ধর্মঘট সংগঠিত করা এবং গানে গানে শ্রমিকদের উত্তেজিত করা। তিনি জো হিল। 'ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কার্স অব দি ওয়ার্ল্ড' শ্রমিক সংগঠনের নেতা। প্রতিবাদী গণসংগীতের অন্যতম ঐতিহাসিক আদিপুরুষ। মৃত্যুর আগে একটা চিরকুটে প্রিয় সহযোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে জো লিখে গিয়েছিলেন, "আমার মৃত্যুতে শোক করে সময় নষ্ট কোরো না। সংগঠিত হও, লড়াই কর"। শহিদ জো-র কথা আর গান ছড়িয়ে পড়েছিল গোটা মার্কিন ভূখণ্ডে। দশ বছর পর, ১৯৫২-এ আলফ্রেড হেস লিখলেন এক বিস্ময়কর কবিতা, "কাল রাতে জো হিল-কে আমি স্বপ্নে দেখেছি / যেন আমার তোমার মতোই জীবন্ত / আমি বললাম তুমি তো দশ বছর আগেই মৃত / আমি কোনোদিই মরিনি - বলল সে...।"

কী আশ্চর্য! ওই ১৯২৫-এ আমাদের দেশেও যেন জন্ম হলো আরেক জো হিলের এবং ওই ১৯ নভেম্বর! সলিল চৌধুরির জন্ম-তারিখ। হয়তো কাকতালীয়। কিন্তু কী চিত্তাকর্ষক মিল। সলিল গবেষক বিশিষ্ট শল্য-চিকিৎসক সমীরকুমার গুপ্ত অবশ্য লিখেছেন, সলিল চৌধুরির জন্ম ১৯ নভেম্বর ঠিক কিন্তু ১৯২৫ নয়, ১৯২২ সালে। সলিলের প্রথমা স্ত্রী জ্যোতি চৌধুরির দেওয়া তথ্য থেকেই সম্ভবত তিনি এটা জেনেছেন। সত্যি হলে সবাই ১৯২৫ মানছেন কেন? তবে কি সলিল নিজেই হেস-এর ওই কবিতায় (যা গান হিসেবে বিখ্যাত) প্রাণিত হয়ে পরের দিকে নিজের জন্মদিন পিছিয়ে দিয়েছিলেন? না কি অন্য কোনও কারণে? জানার উপায় নেই। কারণ ডা. গুপ্তও প্রয়াত।

যা-ই হোক, সলিল চৌধুরি বাংলা তথা ভারতীয় উপমহাদেশের সংগীতাকাশে উজ্জ্বল এক মৃত্যুহীন তারা। তাঁর জন্মশতবর্ষ পালিত হচ্ছে এ বছর। এক সময় ছাত্র ও কৃষক আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী, গীতিকার, সুরকার, সংগীত পরিচালক, কবি, নাট্যকার, গল্পকার এমনকী চলচ্চিত্র পরিচালক, কী ছিলেন না তিনি। কিন্তু মৃত্যুর তিন দশক পরেও তিনি সমান প্রাসঙ্গিক হয়ে আছেন এবং অমর হয়ে থাকবেন প্রধানত তাঁর কালজয়ী সব গণসংগীত, ঘুম ভাঙার গান এবং গণচেতনার গানে। কবিবন্ধু সুকান্ত ভট্টাচার্যের রানার, ঠিকানা ইত্যাদি কিছু কবিতায় তাঁর অবিস্মরণীয় সুরারোপের জন্য। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, লতা মঙ্গেশকর, ঊষা মঙ্গেশকর, মুকেশ, মান্না দে, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, শ্যামল মিত্র, পিন্টু ভট্টাচার্য থেকে সবিতা চৌধুরি বা হৈমন্তী শুক্লা, এমন কোনও জনপ্রিয় শিল্পী নেই যাঁরা বাংলা হিন্দি-সহ নানা ভাষায় সলিল চৌধুরির গান করেননি। বহু আধুনিক গান যেমন অভাবনীয় জনপ্রিয়তা পেয়েছে, তেমনি গণসংগীত সলিল চৌধুরির হাত ধরেই এ দেশে প্রকৃত অর্থে আধুনিক হয়েছে। এর আগে সাধারণত, গণসংগীত রচিত ও পরিবেশিত হত প্রচলিত কোনও লোকসুরের প্যারোডি হিসেবে। "লোকে গান শুনতো, কিন্তু পরে আদি গানটাই শুধু মনে রাখতো"। বলেছেন চিত্রশিল্পী হিসেবে খ্যাত বহুমুখী গুণের অধিকারী গণনাট্য ব্যক্তিত্ব খালেদ চৌধুরি।

সলিল চৌধুরি জনগণের সচেতন সংগ্রামের প্রয়োজনেই গানে যে বার্তা দিতে চেয়েছেন, তার উপযোগী সুরও নির্মাণ করে নিয়েছেন। দেশজ সুরের সঙ্গে পাশ্চাত্য সুরের অনায়াস মিলন ঘটাতে প্রথা-প্রকরণ ভেঙেছেন গড়েছেন। 'শিল্পের জন্য শিল্প' ধারণার যেমন আমৃত্যু বিরোধিতা করেছেন, তেমনি শিল্পে বিমূর্ততার প্রবক্তাদেরও সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছেন।

তাঁর বিকশিত সংগীত-প্রতিভার দীপ্তিতে পরবর্তী কালে কীভাবে আলোকিত হয়েছে গোটা দেশ এবং উপমহাদেশ, একটা সংক্ষিপ্ত পরিসংখ্যান থেকেই তা আন্দাজ করা যায়। বাংলা, হিন্দি, মালয়ালম সমেত ১৩টি ভাষা-র চলচ্চিত্রের জন্য তিনি সুর করেছিলেন। এর মধ্যে আছে ৭৫টির বেশি জনপ্রিয় হিন্দি ছবি, ৪১টি বাংলা ছবি, ২৭টি মালয়ালম ছবি। এছাড়া তামিল, মারাঠি, তেলুগু, কন্নড়, গুজরাটি, উড়িয়া এবং অসমিয়া ভাষার ছবিতেও তিনি সংগীত সৃষ্টি করেছেন। তাঁর রচিত বা সুরারোপিত গানের সংখ্যা পাঁচশোর বেশি। এর মধ্যে গণসংগীত তাঁর মতে ৬০টি হলেও আরও ৪০টির মতো 'চেতনার গান' বিখ্যাত হয়েছে। এছাড়া সুর করেছেন অন্য কবি ও গীতিকারদের প্রচুর গানেও।

সলিল চৌধুরির ছোটবেলার ডাকনাম ছিল বাচ্চু। আট ভাইবোনের তৃতীয়। দুধের শিশু ছোটবোন-কে লুকিয়ে বাছুরের মতো মায়ের বুকের দুধ খেতেন বলে নাম পড়েছিল বাছু বা বাচু। পরে হয় বাচ্চু। বাবা ডা. জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরি ছিলেন আসামের চা-বাগানের ডাক্তার। উদাত্ত গলায় গাইতেন। অর্গান, বেহালা, এস্রাজ, তবলাসহ বহু যন্ত্র বাজাতে পারতেন। ঘরের গ্রামাফোনে বাজত পঙ্কজ মল্লিকের কণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীত, শচীন দেববর্মন, আঙুরবালা, নজরুলের গান আর বাখ-মোজার্ট-এর মেলোডির সঙ্গে বিঠোফেন-এর সিমফনি। শোযোক্ত তিন পাশ্চাত্য সংগীতস্রষ্টার রেকর্ডগুলো দিয়েছিলেন আইরিশ সিএমও ডা. মালোনি। এই পরিবেশেই কেটেছে সলিলের শৈশব। সঙ্গে চা বাগানের পাহাড়িয়া বাঁশি, সাঁওতাল শ্রমিকদের ঝুমুর-বিহুর সুর, গাছের শনশন, নদীর কলকল, পশু-পাখি-কীট-পতঙ্গের কলতানে এক আশ্চর্য আরণ্যক সিমফনি। ছোট বয়সেই বাঁশি বাজাতে ওস্তাদ হয়ে ওঠেন সলিল। সঙ্গে হারমোনিয়াম। বাঁশিটা কলকাতায় গিয়েও গোঁজা থাকত জামার নিচে। বুকের কাছে। বাবা-র সঙ্গে শ্রমিকদের নিয়ে নাটকে প্রথম সুরারোপ করার হাতেখড়ি। রবীন্দ্রনাথের গান শুনিয়ে ওই বয়সেই বাবা-র কাছ থেকে উপহার পান ডোয়ার্কিনের একটা ছোট হারমোনিয়াম। এটা গলায় ঝুলিয়েই পরবর্তী ছাত্র জীবনে দুর্ভিক্ষ-ত্রাণ সংগ্রহ অভিযানে গান গাইতেন সলিল। বঙ্গবাসী কলেজে পড়ার সময় বাঁশি ও এস্রাজ বাজিয়ে পুরস্কার পেয়েছেন। এক সময় এক বাইজির সঙ্গে বাঁশি বাজিয়ে নিজের খরচ জোগাড় করতেন। বাঁশি বাজিয়েছেন বিখ্যাত তিমিরবরণের দলেও। এমনকি দুর্ভিক্ষ-ত্রাণ সংগ্রহে পিপলস রিলিফ কমিটি ও ছাত্র ফেডারেশনের প্রথম যে দলটি আসাম ও বাংলাদেশ সফরে যায়, তাতে সলিলকে নেওয়া হয়েছিল বংশীবাদক হিসেবে। বাবা-র কাছ থেকে সলিল দীক্ষা পেয়েছিলেন দেশপ্রেম, শ্রমজীবী মানুষের প্রতি ভালোবাসার।

রবীন্দ্রনাথের এমন ভক্ত ছিলেন যে, ১৯৪১-এ বিশ্বকবির মৃত্যুর পর এক মাস অশৌচ পালন করেছিলেন ষোল বছর বয়সী সলিল। খালি পায়ে হেঁটে বেড়াতেন কলকাতার রাস্তায়। শুরুর দিকে রবীন্দ্র-ঘরানায় কবিতা লেখার চেষ্টা করলেও সংগীতে রবীন্দ্রনাথকে নয়, বরং নজরুল ইসলাম-কেই বেশি অনুসরণ করেছেন পরবর্তী বিস্ময়-প্রতিভা সলিল চৌধুরি। নজরুলের মতোই তিনি বলতে পারতেন, 'এক হাতে মোর বাঁশের বাঁশির, আর হাতে রণতূর্য'। সলিল তাঁর অন্তরের সব সত্য মুঠো করে যেন কোনো জনসমুদ্রের গায়ে ছড়িয়ে দিয়ে বলে গেছেন, 'আমি ঝড়ের কাছে রেখে গেলাম আমার ঠিকানা'।

রবীন্দ্রনাথের মন্দ্র সপ্তকের ভাবমগ্নতার বদলে মধ্য ও তার সপ্তকেই দেশি-বিদেশি সুরের খেলা খেলেছেন সলিল। কোনও গুরু বা ঘরানার কাছে সংগীত শিক্ষা করেননি। শেষ বয়সে গণশক্তি পত্রিকা-কে নিজেই বলেছেন, "আমি ছোটবেলা থেকে সংগীত কোনও গুরুর কাছে বা ঘরানায় শিখিনি। আমার গুরু বলতে রেকর্ড,

পরবর্তী সময়ে টেপ, টেলিভিশন প্রোগ্রাম, আন্তর্জাতিক সংগীত, অর্থাৎ আমি যা শুনেছি, সে সবই আমার গুরু"। কলকাতাতে জেঠুর বাড়িতে ছোড়দা নিখিল চৌধুরির 'মিলন পরিষদ' নামে একটা অর্কেস্ট্রার দল ছিল। সেখানে দক্ষ যন্ত্র শিল্পীদের কাছ থেকে গিটারসহ পাশ্চাত্যের বিভিন্ন যন্ত্র বাজানো আয়ত্ত করেন। তখন ছায়া সিনেমায় পর্দার পেছনে বসে নির্বাক চলচ্চিত্রের সঙ্গে এফেক্ট মিউজিক বাজাতেন মিলন পরিষদের শিল্পীরা। সলিল তাঁদের সঙ্গে বসে সে সব এফেক্ট মিউজিক আয়ত্ত করেন।

১৯৪৫-এ নেতাজির আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দি সেনাদের লালকেল্লায় বিচার করা হবে বলে ঘোষণা দিল ব্রিটিশ সরকার। সঙ্গে নাকি চট্টগ্রাম বিদ্রোহের বন্দিদেরও আন্দামান থেকে এনে আবার বিচার করা হবে। সলিল চৌধুরির কলম গর্জে উঠল, "বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা আজ জেগেছে সেই জনতা"। পরিচিত কীর্তনের সুর "যমুনে তুমি কি সেই যমুনে প্রবাহিনী" — চেনাই গেল না আঙ্গিকের পরিবর্তনে।

১৯৪৭-এ সুকান্তের মৃত্যু। 'ঠিকানা' সুর করে হাসপাতালে শোনাতে গিয়ে শুনলেন কবিবন্ধু আর নেই। পরে 'রানার' এবং 'অবাক পৃথিবী' সমেত পরপর সুকান্তের গান হেমন্ত-সলিল জুটির বিজয়পতাকা কীভাবে উড়িয়েছে তার সাক্ষী তিন প্রজন্ম। 'ঠিকানা' অবশ্য পরে ১৯৭০ সালে বম্বেতে রেকর্ড করা হয়।

ইতিমধ্যে গণনাট্য সংঘেও অতি বামপন্থার উপদ্রব শুরু। নেতারা যেভাবে চাইবেন সেভাবেই লিখতে হবে। স্লোগানধর্মী গান চাই। সলিলের বিড়ম্বনা গোপন অসন্তোষে পরিণত। আগে গণনাট্য সংঘের সর্বভারতীয় সম্মেলনে জড়ো হতেন সারা দেশের শিল্পীরা, তাঁদের নানা ভাষার, নানা সুর নানান আঙ্গিকের গান নাচ নিয়ে। সলিলের কাছে এগুলো ছিল 'মিউজিক ইউনিভার্সিটি'। সেই গণতান্ত্রিক পরিবেশ আর রইল না। কৃষকের দুঃখের গানে 'বিধি' শব্দটা থাকায় সলিলের সুর অন্য একজনের গান 'গণসংগীত নয়' তকমায় খারিজ হল। কর্মীদের হতাশা কাটাতে সলিল লিখলেন 'ও আলোর পথযাত্রী'। প্রয়োগ করলেন ভোকাল হারমনির। গড়িয়াহাটের যশোদা ভবনে গণনাট্য সংঘের নেতা ভূপতি নন্দীর বাড়িতে প্রত্যক্ষ পরিচয় বিনয় রায়, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, সুচিত্রা মিত্র, দেবব্রত বিশ্বাস প্রমুখের সঙ্গে। এখানেই বেশির ভাগ গণসংগীত লেখা। দেবব্রত বিশ্বাসের বাড়িতে পরিচয় হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। পরে একদিন ভূপতির সঙ্গে আত্মগোপনে থাকা সলিল গেলেন হেমন্তের বাড়ি। গণনাট্যে যুক্ত হলেও এই প্রতিষ্ঠিত শিল্পী সলিলের বিচারপতি ইত্যাদি গান শুনে বললেন, এগুলো তো গ্রামাফোন রেকর্ডে গাওয়া যাবে না। ফেরার পথে সিঁড়িতে হেমন্তকে সলিল বললেন, 'আরেকটা অন্যরকম গান অর্ধেক করেছি। শুনবেন?' হেমন্ত শুনলেন। পছন্দ হল। পরের দিন বাকি অর্ধেক। সবটা তুলে নিয়ে পুজোর গান হিসেবে নিজের অর্কেস্ট্রেশনে গাইলেন হেমন্ত। সুপার ডুপার হিট সেই গান, 'কোনও এক গাঁয়ের বঁধূর কথা তোমায় শোনাই শোনো'। সেই মন্বন্তরের ছবি। কিন্তু শেষে 'বঁধূর সমাধি' থাকায় পছন্দ হলো না অতিবাম নেতাদের। এটা ১৯৪৯ সালের কথা। ১৯৫১-তে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'পাল্কির গান'-এ যুগান্তর আনা সুর প্রয়োগ। সঙ্গে বেহারাদের হুন হুন। শ্রমের সমবেত সাঙ্গীতিক ধ্বনি। তারপর আরও বড় বিস্ফোরণ সুকান্তের 'রানার' কবিতার সুরারোপ। পাশ্চাত্য সংগীতের রীতিতে বারে বারে অক্টেভ বা সা-বদল।

হেমন্ত বললেন, এ তো হারমোনিয়ামেই তুলতে কষ্ট হচেছ! পরে স্বয়ং মুজফর আহমেদের সরস মন্তব্য, সলিল দেখছি পার্টি পত্রিকার সম্পাদকীয়ও সুর করে ফেলবে। রানার-এর জনপ্রিয়তা আজও কমেনি। এ বছরই পিতৃবিয়োগ। সংসারের ভার। বাংলা ছবিতে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের সহকারী হিসেবে সংগীতের কাজ করেছেন। কিন্তু গণসংগীত এবং চেতনার গান থামেনি। রবীন্দ্রনাথের ময়নাপাড়ার কৃষ্ণকলি মেয়ে-কে কলকাতার রাস্তায় এনে 'সেই সে মেয়ে' প্রকাশ করলেন রবীন্দ্রগানের বন্দিত শিল্পী সুচিত্রা মিত্রের কণ্ঠে। এই গানও আলোড়ন তুলল। ১৯৫৩ সালে নিজের রিকশাওয়ালা গল্পের চিত্রনাট্য নিয়ে বিমল রায়ের ডাকে বম্বে পাড়ি। সেই ছবি হিন্দিতে 'দো বিঘা জমিন' নামে সাড়া ফেলল। পুরস্কৃত হল কান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে। তারপর 'মধুমতী' ছবির সংগীতের বিপুল সাফল্য ভারতের নামী দামি সংগীত পরিচালদের সারিতে প্রতিষ্ঠা এনে দিল সলিল চৌধুলিকে।

অনেক সমালোচনা হল, প্রতিষ্ঠার পেছনে ছুটে গড্ডালিকা স্রোতে হারিয়ে গেছেন সলিল চৌধুরি। আসলে কি তাই? তা যদি হত, 'বম্বে ইয়ুথ কয়ার' প্রতিষ্ঠা করে হিন্দি-সহ নানা ভারতীয় ভাষায় অসামান্য সব চেতনার গান ও গণসংগীত সৃষ্টি করতে পারতেন না সলিল। বম্বে না গেলে সংগীতের বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা অসম্ভব ছিল। অবলিগেটো আর হারমনিক প্রগ্রেশনের প্রয়োগ কীভাবে করতে হয়, কী করে বানাতে হয় কর্ড চার্ট, সিনেমার গানেও ত্রিমাত্রিক ভোকাল হারমনি যুক্ত করা যায় কীভাবে, এগুলো আয়ত্ত হতো কী করে! এই সবই তিনি গণসংগীতেও প্রয়োগ করেছিলেন। তাঁরই প্রেরণায় কলকাতায় ফিরে ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়ার গঠন করেন রুমা গুহঠাকুরতা। সলিল চৌধুরি নিজেও কলকাতায় আসা অব্যাহত রেখেছেন বরাবর। লতাজি, হেমন্ত সমেত বড় বড় সব শিল্পীদের দিয়ে 'পুজোর গান' গাইয়েছেন। অসাধারণ সব গান। লতাজির কণ্ঠে 'সাত ভাই চম্পা জাগো রে' কাদের ঘুম ভাঙাবার ডাক দেয়, হেমন্তের কণ্ঠে 'আমায় প্রশ্ন করে নীল ধ্রুবতারা' গানে 'আর কতকাল দিশাহারা' থাকার প্রশ্ন কাদের উদ্দেশ্যে - আমরা ভাবতে বসি। এই ধরণের বহু গান, যা আগে কোনোদিন বাঙালি শোনেনি। লতাজির গলায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী অর্কেস্ট্রেশনে টাইগার হিলে সূর্যোদয় দেখার স্বপ্নভঙ্গ, আবার নবীন আশার লণ্ঠন হাতে সামনে দাঁড়ানো মা। এমন গান সলিল চৌধুরি ছাড়া আর কে ভাবতে পেরেছেন! সলিল সোভিয়েন ইউনিয়ন সফরে গিয়ে তাঁর বিখ্যাত যুদ্ধ-বিরোধী শান্তির গান 'আমাদের নানান মতে' শুনিয়ে মুগ্ধ করেছেন। পরে গেছেন আমেরিকাতেও। দুটো অ্যালবাম করেছেন সেথায়। বম্বে, দক্ষিণ ভারত হয়ে বাংলায় পাকাপাকি ফিরেছেন আট-এর দশকের গোড়ায়। সৃষ্টি থামেনি। জীবনসঙ্গিনী সবিতা চৌধুরি অত্যন্ত উঁচুমানের সংগীতশিল্পী হলেও সলিলের ছায়ায় অনেকটাই ঢাকা পড়েছেন বলে অনেকের ধারণা। কিন্তু সবিতার কণ্ঠে বউ কথা কও, সুরের ওই ঝরণা ঝরে রে ইত্যাদি গান ইতিহাস হয়ে আছে। সলিল-তনয়া অন্তরা চৌধুরির শিশু বয়সে গাওয়া ছড়া গানগুলো সলিল চৌধুরির এক অনবদ্য সৃষ্টি। 'সারাটা দেশ জুড়েই আমার ঘরবাড়ি' বা 'কেন লোকে যুদ্ধ করে' আজ যেন আরও প্রাসঙ্গিক।

সলিল চৌধুরি নিজেই বলতেন, গণআন্দোলনে যুক্ত না থেকে গণসংগীত সৃষ্টি করা যায় না। একথা নিশ্চয়ই সত্যি। শুধু গণসংগীত কেন, স্রষ্টা নিজে তাঁর চারপাশে, দেশে-বিশ্বে কী ঘটছে, কেন ঘটছে, কোনটা ঠিক কোনটা বেঠিক, কোনটা শুভ কোনটা অশুভ সে সব সম্পর্কে সচেতন না থাকলে তাঁর কাছে সত্য-সুন্দরের অনাবিল সৃষ্টি আশা করা যায় না। আমরা গভীর বিশ্লেষণে এ কথা নির্দ্বিধায় স্বীকার করতেই পারি, গণনাট্য আন্দোলন সলিল চৌধুরিকে জীবন দেখার যে চোখ দিয়েছিল, সেই চোখেই তিনি শেষ অবধি জীবনকে দেখেছেন। চেতনার একই বাঁশি বেজেছে আজীবন।

পাষাণী অহল্যা ওগো যত রাজপথ
কানপেতে কি আমার আগামনী শোন!

সলিল চৌধুরী।

ত্রিপুরায় চলচিত্র বিকাশের রূপরেখা

দীপক ভট্টাচার্য

ত্রিপুরায় সিনেমার ভুত ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমার নিজস্ব ধারণা নিয়ে কিছু কথা বলার চেষ্টা করছি। প্রকৃতপক্ষে গত ত্রিশ বছর ধরে চলচ্চিত্র বিষয়ে যত লেখা বিভিন্ন দৈনিক সংবাদপত্রে ও সংকলনে লিখেছি সে সবের বেশির ভাগই ত্রিপুরায় চলচ্চিত্র নির্মাণ ও পরিবেশন সংক্রান্ত। এমনকি বছর আঠারো আগে 'চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে ত্রিপুরা' বইতে অন্যান্য প্রবন্ধের সঙ্গে 'চলচ্চিত্র চিন্তা' বলে আলাদা একটা অধ্যায় রয়েছে যেখানে এই বিষয়গুলো নিয়ে আমার মতামত দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আজ এতদিন পরও যখন প্রায় একই বিষয় নিয়ে লেখার অনুরোধ আসে তখন বুঝতে পারি চলচিত্র বিকাশ ও সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলার অবকাশ এখনও গুরুত্বপূর্ণ রয়েগেছে। আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে যে সময় আমাদের কাহিনী চিত্র 'লংতরাই' ত্রিপুরা রাজ্যকে বিশ্ব চলচ্চিত্রের ইতিহাসে স্থাপন করেছিল সেদিনের তুলনায় আজকের পরিস্থিতি অনেকটাই ভিন্ন। প্রথমত সামাজিক স্তরে খুব কম হলেও সিনেমা সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা তৈরী হয়েছে বা বলা যায় হতে চলেছে। আগরতলায় একটা সিনেমা লেখার বিদ্যালয় এসেছে। যদিও এখনও সিনেমা তৈরী করার সঙ্গে সম্পর্কিত কোর্স সেভাবে চালু হয়নি, তবে আশা করা যায় কিছুদিনের মধ্যে এই বিষয়গুলো নিয়ে পড়াশোনা শুরু হবে। আগরতলার চলচ্চিত্র বিদ্যালয়টি কলকাতায় অবস্থিত সত্যজিৎ রায় ফিল্ম ও টেলিভিশন ইনষ্টিটিউটের অধীনস্থ হওয়ায় পঠন, পাঠন ও সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো ওদের দ্বারাই পরিচালিত হয়ে থাকে। সম্প্রতি ভারত সরকার চলচ্চিত্র বিষয়ে শিক্ষাদানেরত এস.আর.এফ.টি.আই কলকাতা ও এফ.টি.টি. আই পুনেকে ডিমড ইউনিভার্সিটির মর্যাদা দিয়েছে। এস.আর.এফ.টি.আই চলচ্চিত্র বিষয়ে স্নাতকস্তরের পাঠক্রম রচনা করার কাজে হাত দিয়েছে। আশা করা যায় আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে তা চালু হয়ে যাবে। এর সুফল আগরতলা ফিল্ম ইনষ্টিটিউট নিশ্চিতভাবে লাভ করবে। তাই ফল স্বরূপ আগরতলা থেকে কারিগরী দক্ষতায় প্রশিক্ষিত হয়ে একদল কারিগর সিনেমা নিয়ে কাজ করতে বেরুবে। সামাজিক স্তরে যে কিঞ্চিৎ সিনেমা সম্পর্কে সদর্থক ধারণা তৈরী হয়েছে তা বোঝা যায় আগ্রহী ছাত্রদের বর্তমানে চালু কোর্সগুলোতে ভর্ত্তি হওয়া থেকে। যেহেতু প্রক্রিয়াটা ধারাবাহিক সেহেতু সামাজিক স্তরে সিনেমা সম্পর্কে সদর্থক ধারণা তৈরী হওয়া বাঞ্ছনীয় কারণ, যে সকল ছাত্র পড়তে আসবেন তাদের অভিভাবকদের যদি মাধ্যমটি সম্বন্ধে ধারণায় খামতি থাকে তাহলে প্রতিভাবান ছাত্রদের আশানুরূপ অংশগ্রহণের সম্ভাবনা কমে যাবে। এই কাজটি করার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত প্রদর্শন ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং চলচ্চিত্র বিষয়ক আলোচনার ব্যবস্থা করা। একটা সময় আগরতলায় বছরে দু'দুটো চলচ্চিত্র উৎসব হতো। সেখানে সপ্তাহব্যাপী প্রচুর ভারতীয় ছবি দেখানো হতো। সেই সঙ্গে প্রথতিযশা চলচ্চিত্রকাররা এই শহরে এসে তাদের ছবি নিয়ে কথা বলেতেন। ২০০১ সালে ত্রিপুরা সরকার আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করে। আগরতলা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব নামের সেই উৎসবে জার্মান, ভেনেজুয়েলা, কানাডা, স্পেন ও ভারতীয় সিনেমা প্রদর্শিত হয়েছিল। কানাডার চলচ্চিত্র সমালোচক ও ভেনেজুয়েলার দু'জন

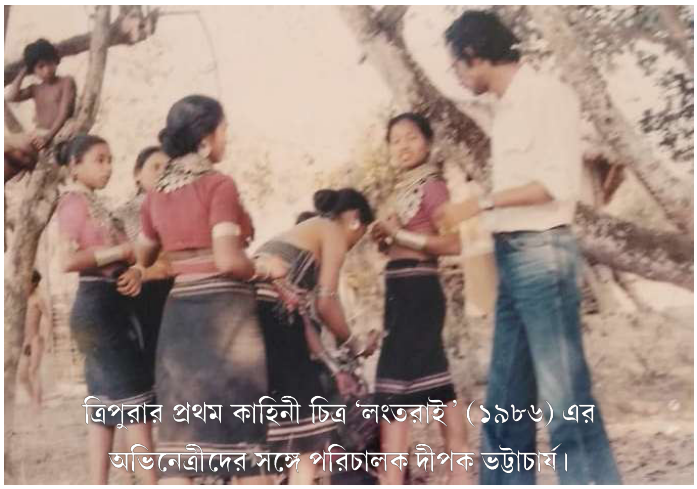

ত্রিপুরার প্রথম কাহিনী চিত্র 'লংতরাই' (১৯৮৬) এর অভিনেত্রীদের সঙ্গে পরিচালক দীপক ভট্টাচার্য।

অভিনেত্রী এই উৎসব উপলক্ষে এখানে এসেছিলেন। আমাদের তৈরী ছবি 'পিলাক' ওদের দেখানো হয়েছিল। সেমিনার হয়েছিল। সেই সময় আগরতলা সমাজে চলচ্চিত্র বিষয় নিয়ে কথাবার্তা চালু হয়েছিল। এইসব প্রদর্শনীর সঙ্গে তাল মিলিয়ে দৈনিক পত্রিকার রবিবারের সংখ্যায় চলচ্চিত্র বিষয় নিয়ে বহু লেখা বেড়িয়েছে। সেই ছিল আগরতলা চলচ্চিত্র ইনস্টিটিউট খোলার উপযুক্ত সময়। আজ যখন ইনস্টিটিউট খুলেছে তখন সমাজ জীবনে চলচ্চিত্র নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা যায় না। এখন চলচ্চিত্র উৎসব করার জন্য প্রতিযোগিতা নেই এমনকি রবিবাসরীয় কাগজেও সিনেমা নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনার প্রকাশ ঘটানো লেখা বিশেষ নজরে পড়ে না। সামাজিক স্তরে এই শূন্যতা দেখে কলকাতার এক পরিচালক যিনি এখানকার কোন এক সংগঠনের আমন্ত্রিত অতিথি হয়ে এসেছিলেন তাঁর আগরতলাকে একটি Dull শহর মনে হয়েছে। চলচ্চিত্র বিষয়ক কার্যকলাপ থেকে এই মন্তব্যের সারবত্তা নেই তা কিন্তু ভাবা যাচ্ছে না। একটু লক্ষ্য করে দেখুন, মেঘালয় থেকে ইদনিং ভালো ছবি হচ্ছে, অরুণাচল থেকে হচ্ছে, মনিপুর তো অনেক এগিয়ে। ত্রিপুরা কোথায়? চল্লিশ বছর আগে যখন ত্রিপুরায় চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু হয় তখন উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অনেকের চলচ্চিত্র সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ছিল না। গত শতাব্দীর নব্বুইয়ের দশকে ত্রিপুরা থেকে অনেক ছবি তৈরী হয়েছে। ব্যক্তিগত স্তরে বিভিন্ন মানুষ চেষ্টা করেছিলেন চলচ্চিত্র শিল্পকে একটা স্থায়ী রূপ দিতে। আজকে যে পরিস্থিতিতে চলচ্চিত্র শিল্প এখানে রয়েছে তা যে গত চল্লিশ বছরে বিশেষ উন্নত হয়নি তা বেশ বোঝা যায়। এর পেছনের কারণটা কি কখনও অনুসন্ধান করা হয়েছে? কেউ কি ভেবেছে কেন চলচ্চিত্র শিল্পের বিকাশ ঘটানো গেল না, ভাবেনি। যারা ভেবেছেন, অযাচিতভাবে পরামর্শ দিয়েছেন, তাদের কথা শোনা হয়নি। যে কারণে, চলচ্চিত্র বিষয়টা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়েছে।

চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য যেমন মেধাবী ও পরিশ্রমী একদল মানুষের প্রয়োজন হয় তেমনি দরকার হয়ে পড়ে পুঁজির। ত্রিপুরার প্রেক্ষিতে প্রথম শর্তটি পূরণ করতে পারা মানুষের জোগান পাওয়া সম্ভব। দ্বিতীয় যে শর্তটি রয়েছে তা পূরণ করা যথেষ্ট কঠিন! এখনও সরকারী কিংবা অসরকারী কোন স্তরেই অর্থ যোগান দেওয়ার মত ব্যবস্থা তৈরী হয়নি। তারপর তৃতীয় যে শর্তটি রয়েছে তা হলো প্রদর্শন ব্যবস্থা। ছবি তৈরী করে ফেলে রাখা সম্ভব নয় তা সবার সামনে মেলে ধরতে হয়। এই কাজটি করার জন্য প্রেক্ষাগৃহের প্রয়োজন। এই মুহূর্তে সারা রাজ্যে প্রদর্শন ব্যবস্থা অত্যন্ত সীমিত। আগরতলার বাইরে সম্ভবত একটি আইনক্স রয়েছে। বাকী রাজ্যে চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা নেই। তাহলে ছবিটি করে কোথায় দেখানো হবে? ছবি প্রদর্শন ব্যবস্থার সঙ্গে একদল ব্যবসায়ী জড়িয়ে আছেন যাদের নিয়ন্ত্রণে সিনেমা হলগুলো থাকে। প্রকৃতপক্ষে তারাই ঠিক করেন কোন্ ছবি কোথায় কতদিন চলবে। বিষয়টা বেশ জটিল। এই তৃতীয় পর্যায়ে এসে ছবির পরিচালক এবং প্রয়োজক সম্পূর্ণভাবে পরিবেশক ও হল মালিকের উপর নির্ভর হয়ে পারেন। এই চিত্রটা সর্বত্রই এক। অনেক কষ্ট করে একটা ছবি তৈরী করতে পারলেই চলবে না। যেহেতু ত্রিপুরা রাজ্যের মত ছোট একটা রাজ্যে চলচ্চিত্র নির্মাণ ও তা পরিবেশন করার কোন বন্দোবস্ত গড়ে ওঠেনি সেইজন্য এই বিষয়টা নিয়ে রাজ্যসরকারের নীতি প্রণয়ন করার অবকাশ রয়েছে। ফিল্ম ইনস্টিটিউটে ছাত্র পাঠানো থেকে শুরু করে ছবি তৈরী করে পরিবেশন করা এই সমগ্র প্রক্রিয়াটাকে চলচ্চিত্র শিল্প বিকাশের চেষ্টা হিসেবে দেখতে হবে এবং উৎসাহদানের জন্য রাজ্য সরকারকে তাদের সামর্থ অনুযায়ী এগিয়ে আসতে হবে। কিভাবে তা সম্ভব সে বিষয়ে এবার আলোচনা করছি।

আলোচনার সুবিধার্থে সমগ্র বিষয়টিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নিচ্ছি —

১। ত্রিপুরা ফিল্ম এণ্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট।

২। স্বাধীন চলচ্চিত্রকার।

৩। প্রদর্শন ব্যবস্থা। ৪। চলচ্চিত্র উৎসব।

বর্তমানে যদিও চলচ্চিত্র বিষয় নিয়ে পড়াশোনা পুরোপুরি শুরু হয়নি তথাপি উদ্দেশ্য যেহেতু এই বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করে শিক্ষিত হয়ে সিনেমা তৈরী করবে তাই এই সব প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ছেলে মেয়েদের কথা সবার আগে বিবেচনা করতে হবে। এই বিদ্যালয় থেকে বেড়িয়ে আসা ছাত্রদের কাজের ব্যবস্থা করার জন্য রাজ্য সরকারকে নির্দিষ্ট নীতি প্রণয়ন করার কথা ভাবতে হবে। ধরা যাক প্রতিবছর পাঁচ লক্ষ টাকা ছবি তৈরী করার জন্য বরাদ্দ করা হলো। সেই টাকা পাঁচজনকে সমানভাবে দেয়া হবে। সেই টাকায় বছরে পাঁচটি ছবি তৈরী হবে। খুব সঙ্গত কারণে ঐ টাকায় বড় ছবি করা সম্ভব নয়। ছোট ছবি বিশেষ করে তথ্যচিত্র নির্মাণ করা যেতে পারে। এবার রাজ্য সরকার

স্থির করবেন এই পাঁচটির মধ্যে তিনটি হতে পারে, ত্রিপুরার সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, জীবনী, পরিবেশ, অরণ্য ও জানোয়ার এবং পর্যটন বিষয় নির্ভর বিশ্বাসযোগ্য ও তথ্যনিষ্ঠ ছবি, বাকী দুইটি ছবি হবে রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক কাজকর্মের রূপরেখা ও সাফল্য নিয়ে। এই বিষয় নির্বাচন সম্পূর্ণভাবে রাজ্য সরকার নিয়ন্ত্রণ করবে। সমগ্র বিষয়টাতে স্বচ্ছতা রাখার জন্য বিজ্ঞাপন দিয়ে আবেদনপত্র আহ্বান করা হবে। এই বিষয়টা সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে তবে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে ইনষ্টিটিউট থেকে পাশ করা ছেলেমেয়েদের। এই ছবিগুলো তৈরী হয়ে গেলে রাজ্য সরকার প্রয়োজনমত সেগুলো নির্দিষ্ট স্থানে প্রদর্শনের জন্য পাঠাবেন এবং উপযুক্ত মনে হলে চলচ্চিত্র উৎসবেও পাঠানোর উদ্যোগ নেবেন।

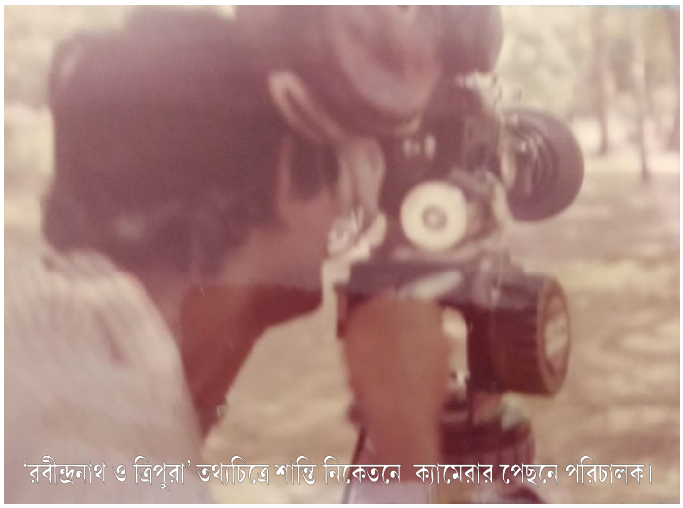
'রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা' তথ্যচিত্রে শান্তি নিকেতনে ক্যামেরার পেছনে পরিচালক।

এবার যে সকল স্বাধীন চলচ্চিত্রকার এই রাজ্যে রয়েছেন যারা নানা প্রতিকূলতার মধ্যে চলচ্চিত্র চর্চা তা যত ক্ষুদ্রাংশই হোক না কেন করে চলেছেন এবং ত্রিপুরার ফিল্ম ইনষ্টিটিউট থেকে পাশ হওয়া টেকনেশিয়ান যেমন, সিনেমাটোগ্রাফার, এডিটর, সাউণ্ড ইঞ্জিনিয়ার সহ অন্যান্য বিভাগের প্রশিক্ষিতদের নিয়ে যে সকল সিনেমা ত্রিপুরার বিষয় ও ভাষায় তৈরী হবে বা হতে যাচ্ছে তাদের জন্য কোন উৎসাহজনক নীতি নেওয়া যায় কিনা দেখা যাক। যেমন :– (১) সরকারী বাউলো ওটিডের প্রয়োজনে স্বল্প মূল্যে ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া। (২) যে সকল স্থান ব্যবহার করার জন্য অনুমতির প্রয়োজন তা দিয়ে দেওয়া। (৩) কাহিনী চিত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজককে উৎসাহ ভাতা রূপে কিছু টাকা ফিরিয়ে দেওয়া তা ছবি প্রদর্শন থেকে যে রাজস্ব সরকার আয় করবে, ফিরিয়ে দেওয়া যেতে পারে। (৪) রাজ্য সরকার যদি মনে করে তাহলে বিশেষ কোন সিনেমাকে বিভিন্ন উৎসব বা প্রদর্শন ব্যবস্থায় পৌঁছে দিতে সাহায্য করা। (৫) রাজ্য সরকার উপযুক্ত মনে করলে ছবির প্রিন্ট ও কিনে নিতে পারে।

এবার হচ্ছে প্রদর্শন ব্যবস্থা। আগেই উল্লেখ করেছি এই মুহূর্তে ত্রিপুরার অধিকাংশ মানুষ সিনেমা দেখার প্রথাগত বন্দোবস্তের সুযোগ পান না। সমস্ত সিনেমা হল বন্ধ হয়ে গেছে। তার পরিবর্তে গড়ে ওঠেছে মুষ্টিময় কয়েকটা আইনক্স। দক্ষিণ ভারত ছাড়া প্রায় সর্বত্র একই চিত্র দেখা যায়। পশ্চিমবাংলায় সিঙ্গল স্ক্রিন হলের সংখ্যা বর্তমানে একশতে ঠেকেছে বলে আক্ষেপ শোনা যায়। এই পরিস্থিতিতে সিনেমাকে বাঁচাতে হলে সিনেমা হলের সংখ্যা বাড়াতে হবে। কেন এই কথা বলা হচ্ছে? প্রথমতঃ এই ধরণের প্রদর্শন ব্যবস্থা সারা রাজ্যজুড়ে গড়ে উঠলে, সব অংশের মানুষের কাছে সিনেমাকে পৌঁছে দেওয়া যায়। যেমনটি আগে ছিল। ১৯৮৫ সালের তথ্যপঞ্জী থেকে জানা যায় ঐ সময় ত্রিপুরা রাজ্যে স্থায়ী ও অস্থায়ী লাইসেন্স প্রাপ্ত সিনেমা হলের সংখ্যা ছিল ৩৮টি। ঐ হলগুলোতে একেকটা শোতে প্রায় পনেরো হাজার দর্শক ছবি দেখতে পারতেন। ঐ সব হল বন্ধ হয়ে এখন সারা রাজ্যে যে প্রদর্শন ব্যবস্থা চালু রয়েছে সেখানে সর্বমোট ৩/৪টি স্ক্রীন রয়েছে। দর্শক সংখ্যাও কম। সবচেয়ে বড় কথা এই ধরণের ব্যবস্থা শুধুমাত্র শহরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠায় সব অংশের মানুষ বঞ্চিত হয়ে রইলেন। তাছাড়া, সিঙ্গল স্ক্রিনের টিকিটের হার বর্তমানে চালু আইনক্সের চেয়ে কম। প্রকৃতপক্ষে বর্তমানে সিনেমা দেখার সুযোগ শহরে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের লোকেদের মধ্যেই সীমিত রয়েছে। বিকল্প কোন ব্যবস্থা না থাকায় এখানে যারা গাঁটের পয়সা খরচ করে শর্ট ফিল্ম তৈরী করেন তাদের ঐসব ফিল্ম দেখানোর জন্য ইউটিউব চ্যানেলের উপর নির্ভর করতে হয়। এই পদ্ধতিতেও ছবি দেখার সুযোগ খুবই সীমিত সংখ্যায় মানুষের আয়ত্তাধীন। তাহলে দেখা যাচ্ছে এখন যে ব্যবস্থা

চলছে তাতে করে প্রথম থেকেই দর্শক সংখ্যা সীমিত হয়ে রয়েছে। ত্রিপুরা ফিল্ম ইনষ্টিটিউট থেকে বেড়িয়ে যে ছেলে মেয়েরা ছবি তৈরী করবেন তা দেখাবেন কোথায়? আর কারাইবা দেখবেন? এই ছবিগুলো দেখানোর জন্য আইনক্স কর্তৃপক্ষের কোন দায় নেই। সেইজন্য ছবি দেখাতে হল ভাড়া করতে হবে যা খুবই ব্যয়সাধ্য। সেই পথও অধিকাংশের জন্য খোলা নেই। ছবি প্রদর্শন করতে হলে বিকল্প ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। এখানেই রাজ্য সরকারের সহযোগিতা প্রয়োজন।

এই বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই যে চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা রাজ্য সরকারের অগ্রাধিকারের মধ্যে পড়ে না। যতদিন পর্যন্ত সহজ প্রদর্শন ব্যবস্থা অসরকারী পর্যায়ে আবার গড়ে ওঠছে ততদিন পর্যন্ত রাজ্য সরকারের সহযোগিতা না পাওয়া গেলে, ত্রিপুরা ফিল্ম ইনষ্টিটিউট থেকে শিক্ষিত হয়ে তারা কি কাজ করতে পারছেন সে সম্বন্ধে জনমানসে কোন ধারণাই তৈরী হবে না। রাজ্য সরকারের তত্ত্বাবধানে যা করা যেতে পারে, (১) সারা রাজ্যে সরকারী যত টাউন হল বা ঐ ধরণের প্রেক্ষাগৃহ রয়েছে সেগুলোতে অন্ততপক্ষে সপ্তাহে দুইদিন সন্ধ্যায় নিয়মিত চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর বন্দোবস্ত করা। দিনগুলো নির্দিষ্ট থাকবে যাতে করে দর্শক সিনেমা দেখার উদ্দেশ্য নিয়েই আসতে পারেন। (২) যে সকল শর্টফিল্ম ইদানিং তৈরী হচ্ছে তাদের জন্যও এই হলগুলো ন্যুনতম ভাড়ার বিনিময়ে খুলে দেয়া হোক। (৩) সর্বপোরি ফিল্ম ইনষ্টিটিউটের ছাত্রদের কাজের নমুনাও নিয়মিত প্রদর্শিত হওয়ার সুযোগ তৈরী হবে। এই ব্যবস্থা চালু হলে বেশীর ভাগ মানুষের কাছে সিনেমা পৌঁছুবে এবং মাধ্যমটি সম্পর্কে আগ্রহ তৈরী হবে। এছাড়া, অন্ততঃপক্ষে মাসে একদিন স্কুল ও কলেজে চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা। এভাবে ছেলেদের মধ্যে চলচ্চিত্র বিষয় নিয়ে আগ্রহ তৈরী হতে সাহায্য করবে। এই সকল ছাত্ররাই এখান থেকে বেড়িয়ে ফিল্ম ইনষ্টিটিউটে পড়তে যাবে।

এবার চলচ্চিত্র উৎসব কেন দরকার সে বিষয়ে দু'চার কথা বলার চেষ্টা করছি। দুই ধরণের চলচ্চিত্র উৎসব হতে পারে। একটা আমাদের দেশের বিভিন্ন ভাষায় তৈরী হওয়া ছবি নিয়ে একটি উৎসব। অন্যটি পৃথিবী জুড়ে যত ছবি তৈরী হচ্ছে সেখান থেকে বাছাই করে কিছু ছবি নিয়ে উৎসব। আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রদেশে কি কাজ হচ্ছে মানুষ তার জীবনের অভিজ্ঞতা কিভাবে প্রতিনিয়ত তার জীবনে প্রতিফলিত করছে এই সম্বন্ধে একটা ধারণা ছবিগুলো থেকে করা সম্ভব হবে। সত্যি কথা বলতে, আমরা উত্তর-পূর্বাঞ্চলে তৈরী হওয়া ছবি সম্বন্ধেই বিশেষ জানি না। সেখানে মারাঠি, তামিল, মালয়ালম ভাষায় কি ধরণের চলচ্চিত্র তৈরী হচ্ছে সে সম্বন্ধে জানা তো খুবই কষ্টকর। এই ধরণের চলচ্চিত্র উৎসব যদি বছরে একবার একটা নির্দিষ্ট সময় করা যায় তাহলে সামগ্রিকভাবে সিনেমা সম্পর্কে সমাজজীবনে অনুসন্ধিৎসা তৈরী হবে। এই সমস্ত বিষয়গুলোই চলচ্চিত্র বিকাশ প্রক্রিয়ার অংশ। এখান থেকেই ধীরে ধীরে চলচ্চিত্র শিল্প রূপে গড়ে ওঠার সম্ভাবনা তৈরী হবে।

মানব সভ্যতার ইতিহাসে চলচ্চিত্রকে নবীন শিল্প রূপে বিবেচনা করা হয়। এই নবীন শিল্পের সৌষ্টব গড়ে ওঠে অন্যসব শিল্পকলার অংশগ্রহণে। আশা করা যায় চলচ্চিত্র শিল্পের বিকাশ হলে সাহিত্য সৃষ্টি, সঙ্গীত অনুশীলন ও চিত্রকলার মত বিষয়গুলো নিয়ে মননশীল চর্চার এক অনুপম পরিবেশ তৈরী হবে। তবেই তো ত্রিপুরা আবার শিল্প চর্চার ক্ষেত্রে অগ্রণী হয়ে ওঠবে!

আগরতলায় যেদিন ফটোগ্রাফী চর্চার জন্য ব্যক্তিগত উদ্যোগে রাজ অন্দরে যন্ত্রপাতি ও ক্যামেরা এসেছিল সেদিন সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য প্রদেশের মানুষদের কল্পনাতেও এই বিষয়টি ছিল না। অতীতের সেই গৌরবজ্জল কাজকর্মের হাত ধরে এগিয়ে যেতে হলে সার্বিক সমন্বয় ও ঐক্যবদ্ধভাবে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে হবে। তবেই সম্ভব হবে ত্রিপুরার সাহিত্য সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে চলচ্চিত্র মাধ্যমে বিশ্ব দরবারে পুনরায় পৌঁছে দেওয়া!

ছবি : দীপক ভট্টাচার্য।

ধর্ম এবং প্রজ্ঞা: হিন্দুত্ববাদের খোঁজ

প্রদীপ ভৌমিক

ধর্মকে আমরা বিভিন্ন দৃষ্টি ভঙ্গিতে উপলব্ধি করি। কিন্তু ধর্ম চর্চা কি কেবল পূজা? কিছু রীতি নিয়ম, কিছু আলোচনা বা সমালোচনা? না, ধর্ম জ্ঞান! সঠিক অর্থে ধর্ম প্রজ্ঞা! তর্কের বিষয় নয়, অনুধাবনের বিষয়। আমাদের বিশাল জ্ঞান ভান্ডারকে শত শত বছর ধরে তো উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়নি। সেটা আমাদের দুর্বলতা। আমাদের অজ্ঞতা। হিন্দু ধর্ম পৃথিবীর প্রচীনতম ধর্ম। সত্যিকার অর্থে "বেদ" বৈদিক সংস্কৃত ভাষায় লিখিত এক অকল্পনীয়, অননুকরণীয় মহাগ্রন্থ।

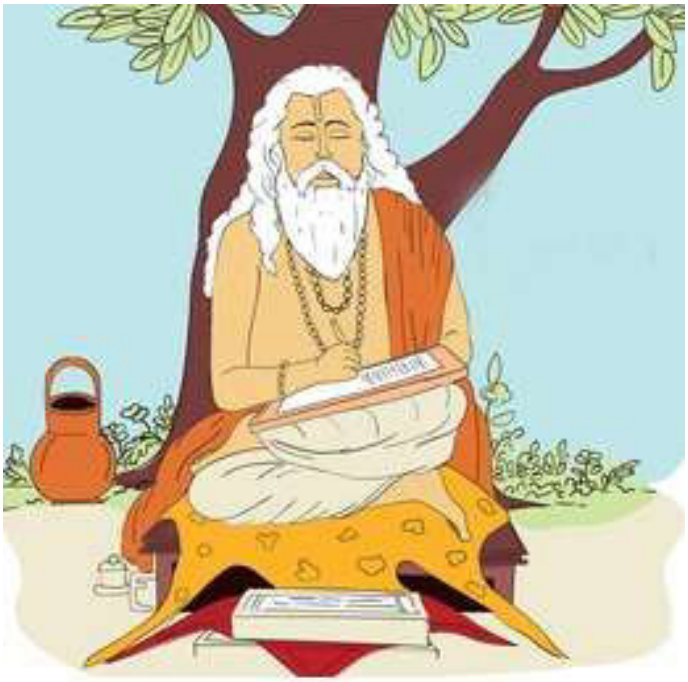

ইতিহাস :

যে সময়কার ইতিহাস আমরা জানি সেটাকে যদি প্রাচীন যুগ, মধ্য যুগ এবং আধুনিক যুগে ভাগ করি তাহলে কোন যুগেই হিন্দু ধর্মের অসাধারণ জ্ঞান ভান্ডার সঠিক ভাবে উন্মোচিতই হয়নি। প্রাচীন যুগে হিন্দু ধর্মের জ্ঞান ভান্ডার কেবল মাত্র একটি ছোট্ট অংশের মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। গুরু গৃহ অর্জিত বিদ্যাকে সর্ব সাধারণের উপকারের জন্য হয়তো ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি। অথবা যে টুকু জন সমক্ষে কোন না কোন ভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল সেটা কেবল মাত্র উচ্চারিত শব্দের মাধ্যমে (শ্রুতি) এবং যে কারণে কালের বিবর্তনে বিশাল জ্ঞান ভান্ডার রূপান্তরিত হয়ে যখন সর্বজনে পৌঁছায় তখন সেটাকে দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার কতটা করা সম্ভব হয়েছিল সেটা বলা দুষ্কর। তবে প্রাচীন ভারতভূমিতে বিদ্যার্জনের যে আকুতি, জন মানসে জ্ঞানের যে ব্যাকুলতা ছিল সেটা হয়তো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে হিন্দুধর্মের মূল অন্তরাত্মার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ ছিল।

মধ্যযুগে ভারত ইতিহাস সর্বদাই অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। বারং বার বিদেশী আক্রমন ভারতের তথা বৈদিক হিন্দুত্ববাদের অন্তরাত্মাকে ছিন্ন বিছিন্ন করে গেছে। জাতি সংঘর্ষ এবং জাতের সংমিশ্রন ভাবের ''জিনগত'' বৈশিষ্ট্যকে বিভিন্ন ভাবে নষ্ট করে দিয়েছে। সে সঙ্গে মধ্য যুগের সাহিত্যের বিকাশ বেশীর ভাগ সময়ে সঠিক পথে ধাবিত না হয়ে, পরবর্তিত সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত হয়। "রেঁনেসাস" বা নবজাগরণ পরবর্তী ভারত নিজেকে পুনঃ আবিষ্কারের চেষ্টায় জাগ্রত হলেও বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত মিশ্র সংস্কৃতি বৈদিক হিন্দুত্ববাদের মূল ধারা থেকে প্রায়ই সংস্কারের সন্মুখীন হয়। কিন্তু অত্যন্ত শক্ত ভিতের উপর তৈরী বৈদিক সংস্কৃতি কখনো হারিয়ে যায়নি। সে কোন না কোন রূপে প্রবহমান ছিল, আছে এবং থাকবে।

প্রাচীন প্রজ্ঞা এবং বর্তমানের প্রয়োজনীয়তা ঃ

হিন্দুত্ববাদ কেবল একটি ধর্ম নয়। এটা আধ্যাত্মিক ধারনা যা অনেক মনীষীর সাধনা লব্দ প্রজ্ঞা সেটা শত সহস্র বছর ধরে জনমুখে উচ্চারিত। আজকে সেটাকে আধুনিকতার মোড়কে সম্পূর্ণ ছাপার অক্ষরে আমরা পেয়ে থাকি। এ আমাদের পরম সৌভাগ্য। কিন্তু আধ্যাত্মবাদ বা বেদের শিক্ষা কি কেবল কিছু শ্লোক বা গাঁথা, না কি একটি সম্পূর্ণ মহাপুস্তক? যা জীবনের সমস্ত আঙ্গিককে এক বিরাট গ্রন্থের আকারে তুলে ধরেছে। এটা সাধারণত বলা হয় বেদ প্রথমে ছিল কেবল 'শ্রুতি' পরবর্তি সময়ে বৈদিক সংস্কৃত ভাষায় মহাগ্রন্থ চারটি বেদ হিসাবে রচিত হয়। এগুলি রচনা করতে কয়েকশ বছর সময় লেগে গেছে। শোনা যায় মহর্ষি 'বেদব্যাস' ঋক, সাম, যজু এবং অথর্ববেদের বিন্যাস করেছিলেন। প্রত্যেকটি বেদের বক্তব্য এবং আলোচ্য বিষয় সম্পূর্ণ ভিন্ন। তা সত্বেও এই পুস্তকগুলি মানব জাতিকে একটা পূর্ণ সত্ত্বা প্রদান করে। প্রত্যেকটি বেদ আবার সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ এই চারভাগে বিভক্ত।
প্রথম দুটি ভাগ প্রধানত ব্রহ্মচর্য এবং গার্হস্থ্য জীবন সম্পর্কে বর্ণনা করেছে। আরণ্যক ও উপনিষদে রয়েছে চতুরাশ্রমের শেষ দুটি ভাগ বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস জীবনের বর্ণনা।

এ ছোট্ট আলোচনা থেকে এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে বেদ অসীম জ্ঞানী ও প্রাজ্ঞ মানুষের বক্তব্যের নির্যাস। যদিও বৈদিক হিন্দুরা বিশ্বাস করেন বেদ একটি অপৌরুষেয় অতিমানবীয় গ্রন্থ।

আমাদের দুর্বলতা :

বিভিন্ন আলোচনা এবং রচনা থেকে এটা জানা যায় বেদ এর রচনা কাল খ্রীষ্ট জন্মের কয়েক শত বছর পূর্বে। অথবা কেউ একে সিন্ধু সভ্যতাকালীনও মনে করেন। সময় বা কাল যাই হোক না কেন বেদের রচনা স্থান নি:সন্দহে তৎকালীন ভারতবর্ষ।

অতএব ধরে নেওয়া যায় আমাদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এক বিশাল সম্পদের উত্তরসূরী। কিন্তু আমরা এ সম্পদকে আজও যথোপযুক্ত মর্যাদার জায়গায় নিয়ে যেতে পারিনি, এটা আমাদের দুর্বলতা।

সম্পদের ভুল ব্যবহার ঃ

আধুনিক ভারতবর্ষে অনৈতিক ব্যক্তির কোনো অভাব নেই। আমাদের সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় ঐতিহ্যকে ব্যবহার করে কিছু লোক বাবংবার বিভিন্ন নামে পরিচিত হয়ে অর্থ রোজগার এবং চারিত্রিক অধ:পতনের রাস্তা তৈরী করেছে। আবার অনেকে সেটাকে রাজনৈতিক উর্বর ভূমি হিসাবে বেছে নিয়েছেন। আরেক দল নিজেকে অতি আধুনিক প্রমাণ করার চেষ্টায় দেবদেবী নিয়ে যথেচ্ছ অপকল্প তৈরী করে বৈদিক হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বকে ম্লান করার চেষ্টা করছেন।

এক দল নিজেদের নাস্তিক, অন্যদল আস্তিক প্রমাণ করতে গিয়ে যেন জীবনের চলন পদ্ধতিকেই অস্বীকার করছেন! হিন্দু ধর্মই বোধ হয় একমাত্র ধর্ম যেখানে এই ধর্মাবলম্বীরা নিজ ধর্মকে অস্বীকার করছে অথবা নোংরা ভাবে অসৎ ব্যবহার করছে। তারাই দেবী স্বরস্বতী নিয়ে কুমন্তব্য করতে পারেন। অথবা দেবী দুর্গাকে কুরুচি পূর্ণভাবে রূপ দিয়ে নিজের শিল্পী সত্বা বিকাশের অপচেষ্টা করতে পারেন!

পরিশেষে ঃ

দেবী দুর্গার আগমন উপলক্ষে এ রচনা কেবলমাত্র আত্মসমালোচনা নয়। ভবিষ্যতে আমাদের এ বিশাল সাংস্কৃতিক এবং ধার্মীয় সম্পদকে জনতার আলোচনার পরিসরে এনে ভারতবর্ষকে 'জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন' প্রদানের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা মাত্র।

ॐ असतो मा सद् गमय
तमसो मा ज्योतिर् गमय
मृत्योर् मामृतं गमय॥

oṁ asato mā sad gamaya
tamaso mā jyotir gamaya
mṛtyor mā amṛtam gamaya.

ত্রিপুরার মন্দির মসজিদ স্থাপত্য

তাপস দেবনাথ

ভারতে স্থাপত্য শিল্প বহু পুরনো। মূলত পাথর কেটে গুহা, মন্দির ইত্যাদি গড়া হয়েছে। অজন্তা-ইলোরা, মহাবলীপুরমে বিশাল বিশাল পাহাড়ের পাথর কেটে মন্দির, গুহাচিত্র গড়েন শিল্পীরা। অজন্তা গুহা তৈরি হয় খ্রিস্ট পূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে ষষ্ঠ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। ইলোরা গুহা সপ্তম খ্রিস্টাব্দ থেকে দশম শতক পর্যন্ত। ষষ্ঠ-সপ্তম শতকে তৈরি হয় মহাবলীপুরম্। কষ্টসাধ্য এসব কাজ করেছেন এদেশের শ্রমজীবী মানুষই। কথায় আছে সভ্যতার চাকা এগিয়ে নিচ্ছেন শ্রমজীবী মানুষ। প্রাসাদ নির্মাণও ছিল এরকম কষ্টসাধ্য। সেসব ঘরানা হিন্দুরীতি মেনে করা হয়। যদিও বৌদ্ধদের দাবি তাদের মন্দির ভেঙ্গে গড়ে উঠেছে এসব হিন্দু মন্দির!

চতুর্দশ দেবতা মন্দির (শিববাড়ী) উদয়পুর।

পাথর কেটে মন্দির তৈরির আগে হরপ্পা মহেঞ্জোদারো সভ্যতা পোড়ামাটির সামগ্রীর ওপর নির্ভরশীল ছিল। মুঘল আমলে আসে অন্য আরেক ঘরানা। তুর্কি ও আফগানরা পারস্য ও মধ্য এশিয়া থেকে স্থাপত্যের নতুন রীতি ও কলাকৌশল আমদানি করে। সেসব আরবরা আবার নিয়ে আসে রোম থেকে। নতুন নতুন ধারণার উদ্ভবে ও বিনিময়ের ফলে ভারতীয় স্থাপত্যের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা দেয়। একটি মিশ্র ধারার প্রবর্তন হয়। সেভাবেই গড়ে ওঠে মন্দির-মসজিদ-প্রাসাদ।

বাংলায় পাথরের অভাব ছিল। উত্তর, দক্ষিণ, পশ্চিম থেকে পাথর এনে কিছু গড়বার ফরমাস দেওয়া ছিল ব্যয় সাপেক্ষ। মাটি, খড়, পর্ণ ও ছন — সেই সঙ্গে বাঁশ, কাঠ দিয়ে তৈরি কুটিরে থাকতে অভ্যস্ত শিল্পীদের পক্ষেও সুলভ উপকরণ ও সরল যন্ত্রপাতির ব্যবহার ছিল সহজসাধ্য। এসব বাড়ির চালে যাতে বৃষ্টির জল জমে না থাকে এজন্য চালাঘরের উদ্ভব হয়। দোচালা চারচালা আটচালা বাড়ি। ইটের ব্যবহার শুরু হলেও চালাঘরের আদলে গড়া হয় মন্দিরও। ধীরে ধীরে এখানেও গম্বুজ, শিখর রীতি মেনে মন্দির তৈরি হতে থাকে। মসজিদ তৈরি হয় শ্বেতপাথরের কারুকাজ খচিত।

ত্রিপুরায় পাকা বাড়ি নির্মাণের ইতিহাস বেশি দিনের নয়। সাড়ে পাঁচশো ছয়শো বছরের মতো। এখানকার ভৌগোলিক অবস্থান, যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব সর্বোপরি অর্থনৈতিক অবস্থা দুর্বল থাকায় এই অঞ্চলের পাকা বাড়ি তৈরি হতে সময় নেয়। ফলে পার্বত্য ত্রিপুরায় যেসব মন্দির দেখা যেত এগুলো ছন, বাঁশের তৈরি। ধীরে ধীরে মাটির দেওয়াল ওপরে টিন। ইটের ব্যবহার শুরু হলেও চাল বা ছাদ টিনের। আধুনিক যুগে এসে নানা রীতির মন্দির তৈরি হচ্ছে। দেখা গেছে মূলত রাজাদের ধর্মই প্রজারা গ্রহণ করতেন। শৈব, শাক্ত ও পরে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেন ত্রিপুরার রাজারা। সেভাবেই গড়ে ওঠে মন্দির। কিন্তু ত্রিপুরার রাজারা বরাবরই সর্বধর্ম সমন্বয়ের ওপর জোর দিয়েছেন।

অধ্যাপক কার্তিক লাহিড়ীর অভিমত, 'বাংলাদেশে মধ্য পর্বে (মুসলমান বিজয়ের পর) বাঙালী স্থপতিরা এক নতুন ধরণের মন্দির নির্মাণ শৈলী প্রবর্তন করেন। বাংলার গ্রামেগঞ্জে শহরে চতুষ্কোণ বা আয়তাকার নকশার ভিত্তিতে বাঁশ বা কাঠের খুঁটির সঙ্গে মাটির দেয়াল বা বাঁশের বেড়ার উপর ধনুকাকৃতি দোচালা, চারচালা বা আটচালার ঘর দেখা

যায় বাঙালি ঘরের দেবতাদের ঐসব সাধারণ কুঁড়ে ঘরে রাখা হতো। স্থপতিরা সেই সব ঘরের আকৃতি অনুকরণ করে স্থায়ী আলয় নির্মাণে সচেষ্ট হন, ফলে এক নতুন রীতির উদ্ভব হয়, ভারতীয় স্থাপত্যে যা বাংলা রীতি নামে পরিচিত'। ত্রিপুরায় বাংলার স্থাপত্য রীতির অনুকরণের কারণ আলাদা নয়। ত্রিপুরা বরাবর বাংলাকে আদর্শ মেনেছে। ভাষা থেকে অন্যান্য রীতিনীতির প্রভাব পড়েছে ত্রিপুরায়। মূল কারণ, সমতল ত্রিপুরার পুরোটাই বাঙালি অধ্যুষিত। রাজকাজে যেমন, তেমনি উন্নত কৃষিকাজে বাঙালিদের অংশগ্রহণ রাজ্যের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করেছে। শিক্ষা দীক্ষায় উন্নত বাঙালিদের কদর বেশি ছিল রাজ দরবারে। ত্রিপুরার উপকরণের অভাব ও আবহাওয়া বিরাট অট্টালিকা তৈরির পক্ষে বাধা নিশ্চয়ই। উপরন্তু পাহাড় ও বনময় হওয়ার ফলে অঞ্চলটি দুর্গম ছিল এবং অগম্যও। রাজ্যের পাহাড়গুলোতে আবার পাথরের অভাব। যোগাযোগের অভাবে দূর থেকে পাথর বয়ে এনে মন্দির তৈরি করা শুধু কষ্টসাধ্যই নয়, প্রায় অসম্ভব ছিল। এছাড়া তেমন আর্থিক সঙ্গতি ত্রিপুরার মহারাজদের ছিল কিনা সন্দেহ। 'রাজমালা'-র বিবরণ অনুযায়ী প্রতিবেশী রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধ ত্রিপুরার রাজাদের প্রায় দৈনন্দিন ঘটনা ছিল। যুদ্ধের খরচ চালাতে গিয়ে রাজস্ব প্রায় নিঃশেষ হয়ে যেতো। তাই নানাভাবে রাজ্যের যে আয় হতো, সেই আয় থেকে অন্যান্য খরচ চালিয়ে বিরাট কিছু কীর্তি রেখে যাওয়া সম্ভব ছিল না। ত্রিপুরায় জমির ভারবহন ক্ষমতাও যথেষ্ট না হওয়ার ফলে এবং ইট ও সীমিত মাল মসলা নিয়ে বিশাল গৃহ তৈরি করা যায় না। সেজন্য ত্রিপুরার দেবালয়গুলি দৈর্ঘ্যে প্রস্থে উচ্চতায় ছোটো-খাটোই ছিল।

কুটিরের নির্মাণ রীতি অনুকরণ করে বাংলার নিজস্ব রীতিতে প্রথমে দো-চালার প্রবর্তন হয়েছিল বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। দোচালার অনুকরণে যে মন্দির নির্মিত হয়, তাকে 'এক বাংলা' মন্দির বলা হয়ে থাকে। ত্রিপুরায় এ শ্রেণীর মন্দির চোখে পড়ে না। কেবল হরি মন্দিরে (জগন্নাথ দিঘির পূর্ব পাড়, উদয়পুর) তোরণটি দোচালা ধরণের। উদয়পুরের আওলিয়া বদর সাহেবের মোকামটিও ইটের তৈরি দোচালা। দোচালার মতোই 'এক বাংলা' মন্দিরের ছাদ কচ্ছপের পিঠের মতো উত্তল।

বাংলা স্থাপত্য শৈলীর মধ্যে এরপর উল্লেখযোগ্য হচ্ছে চালা মন্দির। 'এক বাংলা', 'জোড়বাংলা' উভয়ই চালা মন্দির। তবু চালা মন্দির বললে সচরাচর আমরা চারচালা, আটচালা বুঝে থাকি। দক্ষিণ ভারতেও চালা রীতির নিদর্শন আছে, তবে এগুলির আলসে বাংলাদেশের আলসের মতো বক্রাকৃতি নয়, আর বাঁকানো আসলেই হচ্ছে বাংলাদেশের ইসলামী অট্টালিকার একটি বিশেষত্ব। বাংলাপ্রদেশে শুধু চার চালা মন্দির বিরল হলেও চারচালার উপর একচূড়া বিশিষ্ট মন্দিরের নিদর্শন পাওয়া যায়। এরপর আমরা পাই রত্নমন্দির। চালচালার নিরাভরণ কোন ভরাট ও অলংকৃত। চারকোণে চারটে চূড়ার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মধ্যেখানে আর একটি চূড়ার পরিকল্পনা হয়েছে। 'পঞ্চরত্ন', 'নবরত্ন', 'ত্রয়োদশরত্ন' প্রভৃতি বহু রত্নযুক্ত মন্দির বাংলায় দেখা যায়।

দেশভাগের সময় রাজন্য ত্রিপুরার সমতল অংশ — যা চাকলা রোশনাবাদ নামে পরিচিত — তা পড়ে যায় বর্তমান বাংলাদেশে। মূল ভূখণ্ডের এক-তৃতীয়াংশ নিয়ে বর্তমান ত্রিপুরার ভৌগোলিক অবস্থান। দেশভাগের পর চাকলা রোশনাবাদ বা সমতল ত্রিপুরার মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে পার্বত্য ত্রিপুরায় চলে আসেন। সঙ্গে আসে তাদের সংস্কৃতি। গড়ে ওঠে মন্দির, মসজিদ, দরগা, মঠ, গির্জা। রাজন্য আমলে চাষাবাদের জন্য আনা হয় অভিজ্ঞ কৃষকদের। ফলে জুমচাষ ভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থার বাইরে সমতল জমি চাষের অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়। দেশভাগের পর পার্বত্য ত্রিপুরায় বেশি মানুষ আসায় জমির ওপর চাপ পড়ে। এরপরও দুই জনগোষ্ঠীর মানুষের মেলবন্ধনে গড়ে ওঠে সম্প্রীতির সংস্কৃতি। হিন্দু-মুসলিম সমন্বয়ের একটি ধারা বহু বছর ধরে ত্রিপুরায় বহমান। ত্রিপুরার মন্দিরগুলির দিকে তাকালে স্পষ্টই হিন্দু রীতির সঙ্গে ইসলাম ও বৌদ্ধ স্থাপত্য রীতি মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। অন্যদিকে পূজা অর্চনায় ব্রাহ্মণ্য রীতির সঙ্গে সঙ্গে মিশিছে আদিবাসীদের কিছু কিছু রীতি। অনুষ্ঠিত পূজা অর্চনায় বলিদান প্রভৃতি ব্যাপারগুলিও নেহাৎ কম হয় না। এগুলি আদিবাসী রীতিনীতির প্রভাব এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আদিবাসী অংশের মানুষ মূলত প্রকৃতি পূজারী। বাঁশ দিয়ে কাল্পনিক মূর্তি গড়ে তার সামনে মোরগ, কবুতর, পাঁঠা, মহিষ বলি দেওয়া চিরচরিত প্রথা। ব্রাহ্মণ্যবাদ এসব আচার অনুষ্ঠানের গ্রহণ করতে পারেনি।

এখনও ওদের কিছু নিজস্বতা বেঁচে আছে। রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ মন্দিরগুলোর ইতিহাস খুঁজলে এই সত্য প্রতিভাত হয়।

ত্রিপুরার মন্দিরগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, উদয়পুরের ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দির, ত্রিপুরেশ ভৈরব মন্দির (শিববাড়ি), জগন্নাথ বাড়ি, ভুবেনেশ্বরী মন্দির, গুণবতী গুচ্ছ মন্দির, হরি মন্দির, কমলা সাগরে কসবা কালীমন্দির, আগরতলার দুর্গাবাড়ি, লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ি, উমা মহেশ্বর মন্দির, শিববাড়ি, বুদ্ধমন্দির, পুরাতন আগরতলার চতুর্দশ দেবতা মন্দির।

ত্রিপুরায় যেসব মন্দির নির্মিত হয়েছে, তার মধ্যে প্রাচীনতম মন্দিরটি ১৬শ শতাব্দীর প্রথম দিকের। সেজন্য ত্রিপুরার মন্দিরের স্থাপত্যগত সাদৃশ্য পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ বাংলায় মুসলমান আগমনের পর সে পর্বের নির্মিত মন্দিরগুলির মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। বাংলায় মধ্য পর্বে বাঙালী স্থাপতিরা এক নতুন ধরনের মন্দির নির্মাণ শৈলী প্রবর্তন করেন। স্থানীয় স্থাপত্য প্রবণতাকে শিল্পীরা যথেষ্ট আয়ত্ব করেছিলেন। অতিরিক্ত বর্ষণের অবিরল জলধারা অপসারিত করার জন্য বাঁকা চালের গড়ন বিশেষ উপযোগী, ক্রমে এই বাঁকা ছাদ করা প্রথাবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়। মুঘল আমলেই কুটিরের আদলে বাংলাদেশে প্রচুর মন্দির নির্মিত হয়েছিল, বিশেষ করে স্থানীয় উপকরণ (পাথরের বদলে ইটের ব্যবহার) ও আবহাওয়া (স্যাঁতস্যাঁতে)-র জন্য বাংলার অট্টালিকাকে সুদূর আকাশগামী করা সম্ভব নয়, এমন কি দৈর্ঘ্যে প্রস্থে তার আয়তনও সীমিত করা হয়, অন্যদিকে বাংলা মন্দিরের ভারবহন ক্ষমতা বেশি নয়, সেজন্য এই রীতির মন্দির দ্রাবিড় রীতির মন্দিরের মতো আকার প্রকার উচ্চতায় কোনোটাতেই বিরাটত্ব অর্জন করতে পারেনি। অবশ্য ইট দিয়েও বড় অট্টালিকা ও মন্দির তৈরি করা সম্ভব, তার প্রমাণ পাহাড়পুর বা বিহারের নালন্দা। কিন্তু এগুলি ব্যতিক্রম হিসেবেই গণ্য। বিশেষজ্ঞদের মতে বাংলার স্থাপত্যরীতি তার নিজস্ব বৈশিষ্টে ভারতীয় স্থাপত্যে একটি জায়গা করে নিয়েছে। মনে করেন অধ্যাপক কার্তিক লাহিড়ী।

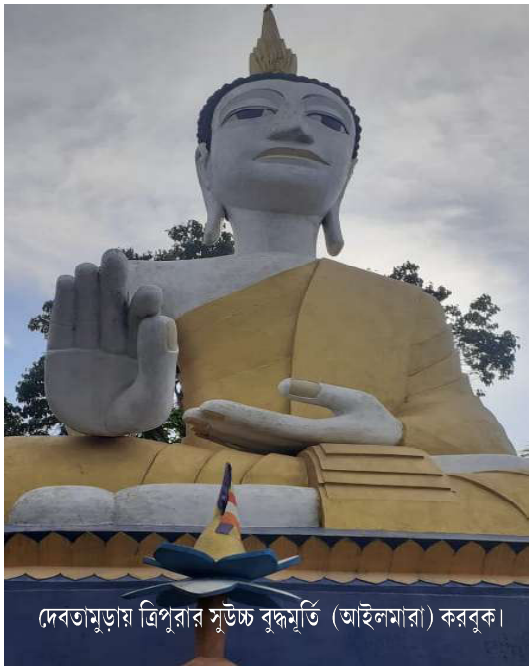
দেবতামুড়ায় ত্রিপুরার সুউচ্চ বুদ্ধমূর্তি (আইলমারা) করবুক।

বাংলার সঙ্গে ত্রিপুরার যোগ বহুদিনের। রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক দিক দিয়েই শুধু নয়, ভাষার দিক দিয়েও বাংলার সঙ্গে ত্রিপুরার যোগ কয়েক শতাব্দীর। ত্রিপুরার অধিবাসীদের মধ্যে সংখ্যা গরিষ্ঠ তিপ্রা ও রিয়াংদের ভাষা ভোট-বর্মী গোষ্ঠীর অন্তর্গত, বোড়ো পরিবারভুক্ত। এসব ভাষার লিখিত রূপ নেই, যে প্রয়াস ও প্রযত্নে মৌখিক ভাষা লিখিত স্তরে উন্নত হয়, রাজা কিংবা প্রধানদের মধ্যে তেমন চেষ্টা আদৌ দেখা যায়নি কোনোদিন। তার উপর ত্রিপুরার রাজপরিবার তাঁদের সংস্কৃতি ও আদালতের ভাষা হিসাবে বাংলা ভাষাকেই গ্রহণ করেছিলেন পঞ্চদশ শতাব্দীতে। এর ফলে বাংলার সঙ্গে ত্রিপুরারযোগাযোগ নিবিড় হয়েছিল সন্দেহ নেই। সেই ঘনিষ্ঠতার ফলে ত্রিপুরার মন্দির নির্মাণে বাংলার মন্দির স্থাপত্য শৈলীর ছাপ পড়ে গভীরভাবে।

প্রাক মুসলমান পর্বে বাংলায় যে চার ধরনের মন্দির নির্মিত হতো (যেমন ভদ্র বা পীড় দেউল, রেখ বা শিখর দেউল, স্তুপযুক্ত ভদ্র বা পীড় দেউল, শিখরযুক্ত ভদ্র বা পীড় দেউল) তার নিদর্শন ত্রিপুরায় মেলে না। যদিও বর্তমান শতাব্দীতে নির্মিত মন্দিরে এর একটি মিশ্র রীতি দেখা যায়। ('বাংলার মন্দির', হিতেশ্বর স্যান্যাল।) অদ্রীস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'টেম্পলস অব ত্রিপুরা'য় দেখিয়েছেন, ত্রিপুরার মন্দিরে এমন উপাঙ্গ আছে যা হিন্দু বা বৌদ্ধ

স্থাপত্যে দেখা যায় না। হিন্দু মন্দিরে চার কোণায় ঠেসনা (Buttress)) দেখা যায় না। কিন্তু ত্রিপুরার মন্দিরে ঠেসনা লক্ষ্য করা যায়। এগুলি মুসলিম মিনারের অনুকরণ। অধ্যাপক কার্তিক লাহিড়ী আমাদের জানান, 'ত্রিপুরায় আটচালা মন্দিরের নির্দেশন খুব একটা চোখে পড়ে না। ত্রিপুরায় যে সব মন্দির ভগ্ন, অর্ধভগ্ন ও অক্ষত দেখা যায়, তার সবগুলি চালা মন্দির। এক্ষেত্রে মধ্যযুগের বাংলা রীতি এখানে অনুসৃত হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু চালার উপর স্থাপিত অংশটি ত্রিপুরার মন্দিরকে বিশেষত্ব দান করেছে। চার চালার উপরে বিবর্ধিত রূপের নিদর্শন ত্রিপুরা ছাড়া ভারতের আর কোথাও দেখা যায় না। ত্রিপুরার অসংখ্য মন্দির ঐ একই রীতিতে নির্মিত হয়েছে। সেজন্য আমরা স্বচ্ছন্দে এই মন্দির স্থাপত্য রীতিকে ত্রিপুর শৈলী ত্রিপুরা রীতি বা ত্রিবেগ শৈলী, ত্রিবেগ রীতি নামে অভিহিত করতে পারি।

ত্রিপুরার মহারাজারা হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেছেন। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির ধারা এসে মিশিছে এখানে। প্রধানত আরাকান ও মায়ানমারের বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি পার্বত্য চট্টগ্রামের মধ্যে দিয়ে এ অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করেছে। বৌদ্ধ ধর্মের ছাপ ত্রিপুরার মন্দির স্থাপত্যে স্পষ্ট লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে মন্দিরের মস্তক অংশে স্তূপের কিংবা তারই বিবর্ধিত রূপের অস্তিত্ব বৌদ্ধ প্রভাবের কথা স্মরণ করায়। বিশেষ করে মুকুন্দ মাণিক্যের সময় থেকে বাংলার নবাবদের সঙ্গে যুদ্ধ প্রায় দৈনন্দিন ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। এই যুদ্ধ ঘটার অন্যতম কারণ ছিল হাতি সংগ্রহ। সে সময় যুদ্ধে হাতির একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল এবং ত্রিপুরার হাতি অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও নানা কাজের উপযোগী, ফলে সুলতানদের দৃষ্টি পড়েছিল ত্রিপুরার উপর। তবে ১৭২৯ সালের আগে পর্যন্ত ত্রিপুরার সমতল অংশ মুঘল অধিকারভুক্ত হয়নি। যা চাকলা রোশনাবাদ নামে খ্যাত।

এর আগে ১৬১৮ সালে রাজধানী উদয়পুর দখল করে আড়াই বছর ধরে রাজত্ব চালায় মুঘল বাহিনী। এই একটি ঘটনা ছাড়া পার্বত্য ত্রিপুরা বরাবর স্বাধীনতা রক্ষা করে চলতে পেরেছে, যদিও রাজা নির্বাচনে সুলতানদের প্রভাব লক্ষিত হতো। গৌড়ের সঙ্গে যোগাযোগ ঘনিষ্ট হওয়ার ফলে ইসলামী প্রভাব বাড়তে থাকে, বিশেষ করে ইসলামী স্থাপত্যের প্রভাব পড়ে ত্রিপুরার দেব-দেউলে। ত্রিপুরার সব মন্দিরই দিঘি বা নদীর ধারে অবস্থিত। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মন্দিরগুলি সুউচ্চ বাঁধানো চত্বরের উপর স্থাপিত এবং বেষ্টনী প্রাচীর আছে। মন্দিরে প্রবেশের জন্য তোরণ নির্মিত হতো, কখনো ইট কখনো শ্লেট জাতীয় পাথরে। তোরণগুলি বেশিরভাগ চারচালা, কেবল উদয়পুরের জগন্নাথ দিঘির পূর্ব পাড়ে অবস্থিত হরি মন্দিরটির তোরণ দোচালা। মন্দিরের তোরণ সিঁড়ি যুক্ত। বর্তমানে বহু মন্দিরের আবেষ্টনী প্রাচীর ধ্বংস হলে গেলেও, প্রধান প্রধান মন্দিরগুলি প্রাচীর বেষ্টিত ছিল। উদয়পুরের বিখ্যাত মহাদেব বাড়ির প্রাচীর এখনও বিদ্যমান। জগন্নাথ দিঘির দক্ষিণ পশ্চিম কোণে 'জগন্নাথ বাড়ির চতুর্দিকে ইট নির্মিত প্রশস্ত দেয়াল দিয়ে পরিবেষ্টিত ছিল। পশ্চিম দিকের দেয়ালের ভগ্নাবশেষের উপর দিয়া বর্তমান সড়ক নির্মিত হইয়াছে।' (উদয়পুর বিবরণ, ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, পৃঃ ১৬, এবং শ্রীরাজমালা, চতুর্থ লহর, পৃঃ ৯১)।

১৯২২ সালে পুরাতত্ব সর্বেক্ষণ বিভাগের সুপারিন্টেনডেন্ট কে. এন. দীক্ষিত উদয়পুরের প্রাচীন কীর্তিসমূহ ভ্রমণ করে যে মন্তব্য করেছেন, এখানে তার কিছু উল্লেখ করছি। রাজ্যের একমাত্র শ্লেট পাথরের তৈরি ভগ্নপ্রায় জগন্নাথ মন্দির সম্পর্কে তিনি লিখেছেন ... "This temple is the most important of all the manuments at Udaipur, but has unfortunately fallen into such a state of neglect that a considerable outlay is necessary to preerve it in proper order. It is built in a style characteristic of the later Mohammadan period. It is square in plan with a passage on the east, facing the entrance and recesses in the walls on the other three sides. The top crowned by a dome with a valuted roof in pure Mohammdan fshion. The stone used in the building is a kind of ash coloured slate stone. Some ratherbig blocks of stone are used in the construction of the temple. There has been no attempt at decoration. There are no images on the building through a few niches are to be found on the exterior walls. The temple was built in 1661. A.D. in the reign

of Govinda Manikya, and was originally dedicated to Vishnu. ত্রিপুরায় মুসলিম সুফি সাধকদের আগমন পাঁচশো বছরের বেশি হবে না। বর্তমান বাংলাদেশের শ্রীহট্টে প্রায় সাতশো বছর আগে শাহজালাল আসার পর বাংলায় সুফি-মরমী মুসলিম ধর্মের প্রসার ঘটতে থাকে। শাহজালালের শিষ্য সুফি সাধক বদর সাহেব ত্রিপুরার রাজধানী উদয়পুর আসেন। এরপর ১৬১৮ খ্রিস্টাব্দে মুঘলরা উদয়পুর দখল করে। আড়াই বছর রাজধানী দখল করে নিজেদের শাসন কায়েম করেছিল। এই সময়ে একটি মসজিদ তৈরি করেছিল। যা মোঘল মসজিদ নামে খ্যাত। মসজিদটি এখনও ভগ্নপ্রায় অবস্থায় রয়েছে।

জগন্নাথবাড়ী (উদয়পুর)

ভারতে বিশেষ করে উত্তর ভারতে বারবার বিদেশী আক্রমণ ঘটেছে। কিন্তু আশ্চার্য্যের বিষয় বিদেশীরা শাসক হিসেবে শাসন করতে এসে শেষ পর্যন্ত ভারতের দেহে লীন হয়ে গেছে। অবশ্য মুসলমানদের আগমনের পর হিন্দুদের সঙ্গে তাদের ভুল বোঝাবুঝি কিছুকাল ধরে চলে। কিন্তু পাশাপাশি বসবাসের ফলে সেই ভুল বোঝাবুঝির অবসান হতে থাকে এবং পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদানের রাস্তা বেশ চওড়া হয়ে ওঠে। জ্ঞান বিজ্ঞান সাহিত্য, সংস্কৃতি এমন কী ধর্মের চিন্তা ভাবনায়ও। এর ফলে কিছু কিছু পরিবর্তন দেখা দিতে থাকে এবং সমন্বয়ের ধারাটি সংঘাতের মধ্য দিয়েও বেগবান ও স্রোতোময় হয়ে ওঠে। নতুন নতুন ধারণার উদ্ভবে, বিনিময়ে ভারতবাসী লাভবান হয়ে উঠযত থাকে ক্রমে ক্রমে।

এর ফলে ভারতীয় স্থাপত্যের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা দেয়। তুর্কি এবং আফগানরা পারস্য ও মধ্য এশিয়া থেকে স্থাপত্যের নতুন রীতি ও কৌশল আমদানি করে। বাড়ি বানাতে তুর্কিরা খিলান ও গম্বুজের ব্যবহার করতো ব্যাপকভাবে। যদিও এগুলো আরবরা রোম থেকে নিয়েছিলো বাইজেনন্টেনীয় সাম্রাজ্যের মাধ্যমে। তবু তারা এগুলোকে উন্নত ও নিজের মতো করে নেয়। তীক্ষ্ণ খিলান অবশ্য বিমের উপর ভর দিয়ে থাকে না। বাঁকাভাবে পাথর বসিয়ে বসিয়ে তেমন করা হয়, আর গম্বুজ উঠে আসতো ছাদের ভেতর থেকেই ফাঁপা অর্ধ-বৃত্তাকারে। এই দুটোর জন্য লাগে আঙ্কিক জ্ঞান ও প্রযুক্তির কৌশল। ভারতীয়রা এসব জানতো না এমন নয়, কিন্তু এ ব্যাপারে তত দক্ষ হয়ে ওঠেনি তারা, অবশ্য তার দরকারও হয়নি তাদের।" (মন্দির মসজিদ দরগা মঠ : কার্তিক লাহিড়ী, ত্রিপুরা দর্পণ)

সমবেত প্রার্থনার জন্য মুসলমানদের বড় ঘেরা জায়গার দরকার পড়তো। চৌকো বা আয়তকার উপাসনার জায়গা প্রথম দিকে তিন দিক দেয়াল দিয়ে তৈরি করা হতো। উপরে কোনো ছাদ ছিল না তখন। পশ্চিমের দেয়ালে অবশ্য কুলঙ্গি থাকতো। কিন্তু এতবড় জায়গার মাথার উপর ছাদ দেবার পরিকল্পনা করতে গিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। শেষে বহুথামের উপর নির্ভরশীল ছাদের নির্মাণ বাতিল করে খিলান ও গম্বুজের চলন করা হয়। এ ফলে বড় হল ঘরের ছাদ তৈরির সমস্যা তো মেটেই সঙ্গে সঙ্গে নান্দনিক সৌন্দর্যও বেড়ে যায়।

মসজিদ বা সমাধি সৌধ তৈরির কাজে কিন্তু ভারতীয় কারিগরই নিযুক্ত হতো। তারা হুবহু পারসী পদ্ধতি রূপায়িত করতো না। অলংকরণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে তারা ভারতীয় রীতি মিশিয়ে ফেলতো। ভারতীয় প্রতীকের সঙ্গে মিশে যেতে থাকে ইসলাীয় নকশা, এমন কি নির্মাণ রীতিতে দুই পদ্ধতি একই সঙ্গে ব্যবহৃত হতে থাকে। এই ভাবে ভারতের মাটিতে ধীরে ধীরে জন্ম নেয় একটি নতুন স্থাপত্য শৈলী যাকে বলা যায়, ইন্দো ইসলামিক বা ভারতীয় ইসলামিক রীতি। এই রীতি অবশ্য ভারতের সব অঞ্চলে

একই রকম থাকে নি। বিভিন্ন অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য নিয়ে গড়ে ওঠে নানা এবং বিশিষ্ট স্থাপত্য রীতি। বাংলা রীতি যার মধ্যে অন্যতম।

ত্রিপুরার সবচেয়ে পুরানো মসজিদের নির্দেশন মেলে উদয়পুরে। আগেই উল্লেখ করেছি, ঐ মসজিদটি মুঘল মসজিদ নামে পরিচিত। যশোধর মাণিক্যের রাজত্বকালে (১৬০০-১৬১৮) মুঘলরা ত্রিপুরা আক্রমণ করে। বাংলার মোগল সুবেদার ত্রিপুরার রাজার কাছে রাজস্ব হিসেবে হাতি ও ঘোড়া পাঠাতে বলে। তার উত্তরে ত্রিপুরা নৃপতি বলেন,

"হস্তি না দিব আমি সেখানে না জাইব।
যুদ্ধ করিয়া আমি মজল খেদাইব।"

(রাজমালা, শিক্ষা অধিকার ত্রিপুরা, ১৯৬৭, পৃঃ ৬৭)। মুঘল ও ত্রিপুরার মহারাজের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। তার বিবরণ 'রাজমালা' এবং 'বাহারিস্তানই ঘায়েরী'তে পাওয়া যায়। এ যুদ্ধে ত্রিপুরা মহারাজের হার হয়, এবং উদয়পুরে অবস্থানকালে মুঘলগণ বিজয় চিহ্নস্বরূপ একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিল। তার কাজ শেষ করার সুযোগ ঘটেনি। কলেরা দেখা দিলে আড়াই বছর পর তারা উদয়পুর ছেড়ে পালিয়ে যায়। পুরাতন রাজবাড়ি যাওয়ার পথে গোমতী নদীর পাড়ে মসজিদটি আজও মুঘল বিজয়ের সাক্ষ্য স্বরূপ দাঁড়িয়ে আছে।

'ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিশ বৎসর ধর্মনগর বিভাগ' গ্রন্থের লেখক ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত লিখেছেন। "উপযুক্ত লোকের তত্ত্বাবধানে মাটি খনন করা হইলে এই বিভাগের অনেক স্থানেই প্রাচীন কীর্তির আরও সন্ধান পাওয়া যাইবে আশা করা যায়। খোয়াই বিভাগে 'বিবির দরগা' 'বার আউলিয়া টিলা'র বিশেষ পরিচয় জানা গেলে বোঝা যেতো ইসলামী স্থাপত্যের কোনো নির্দেশন ছিল কিনা সেখানে। উদয়পুর, সাব্রুম বা সোনামুড়া প্রভৃতি অঞ্চলে এরকম নির্দেশন ছিল কিনা আজ তা জানার উপায় নেই। তবু ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত তাঁর বিরণের একাধিক গ্রন্থে সেই নির্দেশনের কথা তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। উদয়পুরে গাজীর দরগা বলে কথিত দরগাটি "বিজয় সাগরের পশ্চিম পাড়ের কাছে একটি টিলার উপরে অবস্থিত ছিল, এবং তার 'চতুর্দিকের ছাদের চিহ্ন এখনও বর্তমান আছে। এর কাছেই একটি মন্দিরের চিহ্নও আছে। উক্ত ছাদ পরিবেষ্টিত স্থান, সমসের গাজীর নির্মিত দরগা বলে অনেকে মনে করে। এই দরগার কার্য আরম্ভ হইয়াছিল মাত্র শেষ হওয়ার কোন লক্ষণ দেখা যায় না।" (উদয়পুর বিবরণ, ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিশ বৎসর ১৩৪০ ত্রিপুরাব্দ, পৃঃ ২০১)।

আগরতলা মসজিদ রোডের জামে মসজিদ উল্লেখযোগ্য। হাজি রহিম বক্স নামে একজন ব্যবসায়ী ছিলেন, তাঁর বাড়ি ছিল পশ্চিমবঙ্গের হুগলিতে। বর্তমান মসজিদ পট্টি রোডের উপর তাঁর আট দরজাওয়ালা দোকান ছিল। সে দোকানে বন্দুক, গোলা বারুদ থেকে স্নো পাউডার সব কিছু পাওয়া যেতো। ঐটিই তখন সব জিনিসের একমাত্র দোকান ছিল । তিনি খুব সজ্জন ছিলেন। তাঁরই চেষ্টায় সম্ভবত ১৯২০ থেকে ১৯২২/২৩ সালের কোনো সময়ে মসজিদটি তৈরি হয়। অনেকে একে সরকারি মসজিদও বলে থাকেন। মহারাজ ইমাম -এর জন্য ভাতাদি দিতেন বলেই মানুষ একে সরকারি মসজিদ বলতেন।

ত্রিপুরার সবচেয়ে সুন্দর অপূর্ব শিল্প সুষমা মন্ডিত মসজিদ হলো আগরতলায় শিবনগরস্থিত গেদু মিয়াঁ-র মসজিদ। উত্তর পূর্ব ভারতে এরকম সুন্দর মসজিদ খুবই কম দেখা যায়। আব্দুল বারিক ওরফে গেদু মিয়াঁ খুব সামান্য অবস্থার মানুষ ছিলেন। প্রথম জীবনে ছিলেন রাজার মাহুত। এরপর তিনি মোটর গ্যারেজের কর্মী হন এবং মোটর চালনা শিখে নেন। ড্রাইভিং শিখে গেদু মিয়াঁ তদানীন্তন চীফ সেক্রেটারির ড্রাইভার হন এবং ফাঁকে ফাঁকে ঠিকেদারির কাজ করতে থাকেন। ত্রিপুরার মহারাজা পুজোর সময় আদিবাসী সরদারদের নিয়ন্ত্রণ করতেন রাজধানীতে। হোম ভোজন করাতেন। সেই সময় তাদের থাকার জন্য ছেটো ছোটো কুটির তৈরি করতে হতো। গেদু মিয়াঁ সেই কুটির বানানোর কাজ করতে থাকেন। আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মহারাজা বীর বিক্রম ও দুর্জয় কর্তা তাঁকে আগরতলা বিমান বন্দর তৈরি করার ঠিকেদারিতে নিযুক্ত করেন। এই কাজে তিনি প্রায় সাত লক্ষ টাকা লাভ করেন বলে খবর। একটি কথা চালু আছে ... ল্যাংড়া জাতীয় ঘাস পবিষ্কার করে তিনি নাকি 'ল্যাংড়া ট্রি কাটিং' দেখিয়ে প্রতিটির ক্ষেত্রে একটাকা করে বিল করেছিলেন। যেহেতু বিমানবন্দর নির্মাণ করতে ব্রিটিশরা নির্দেশ দিয়েছিল, তারাই এজন্য অর্থ দিয়েছিল। ফলে ব্রিটিশদের পক্ষে ল্যাংড়া যে ঘাস, গাছ নয়,

বোঝার উপায় ছিল না। রাজার অর্থ দফতরও বিষয়টি অনুমোদন দিয়েছে বলে কথিত আছে। এছাড়া তিনি একটি ব্যাঙ্কও চালু করেন। এই সব টাকা থেকেই তিনি মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু করেন। যদিও আগরতলার বহু মানুষ চাঁদা দিয়ে তাকে সাহায্য করেন বলে জানা গেছে। শোনা যায়, গেদু মিয়াঁ মসজিদের সমস্ত উপকরণ, এমন কি কারিগর পর্যন্ত ঢাকা থেকে আনেন। মসজিদটির নির্মাণ শুরু হয় ১৯৪২ সাল নাগাদ। শেষ হতে সময় লাগে পাঁচ- ছয় বছর। মসজিদটি বানাতে তখন প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা খরচ হয় বলে প্রচার ছিল। গেদু মিঁঞা এই মসজিদ নির্মাণ করে ত্রিপুরার ইতিহাসে অমর হয়ে থাকলেও তার সংগঠন আঞ্জুমান ইসলামিয়া ত্রিপুরাকে পাকিস্তানের সঙ্গে জুড়ে দিতে ষড়যন্ত্র করেছিল। সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এজন্য তিনি খলনায়ক চিহ্নিত হয়ে থাকবেন। তাঁর মৃত্যুও রহস্যজনক। বিদূর কর্তার বাড়িতে চায়ের আসরে তাঁর মৃত্যু হয়। সে সময় আগরতলার নাগরিকদের মধ্যে এই খবর চাউর হয়, 'তার চায়ে বিষ ছিল'।

২০১১-১২ সালে রাজ্য সরকার গেটসহ কারুকাজ খচিত মসজিদ, তার চত্বর সংস্কার করেছে। আগের দ্বিতল গেটের জায়গায় শ্বেতপাথরে গড়া হয় নতুন গেট। এই মসজিদে ঈদের নামাজ আদায় করা হয়।

উদয়পুর থেকে পালাটানা হয়ে মেলাঘর যাওয়ার পথে গোমতী নদীর পাড়ে একটি সুদৃশ্য মসজিদ রয়েছে। ইট পাথরে তৈরি মসজিদটি গেদু মিয়াঁর মসজিদ থেকে সুন্দর না হলেও তার সৌন্দর্য কম নয়। ১৯৪১-৪২ সালে ব্যক্তিগত উদ্যোগে মসজিদটি নির্মাণ করান কাকড়াবনের একজন ফকির। তার একটি ঘোড়া ছিল। মানুষ তাকে মামা বলতেন। তিনি অন্য রাজ্য থেকে পাথর ও দক্ষ শ্রমিক আনিয়ে এই মসজিদ গড়েন।

এটা কাকড়াবন মসজিদ হিসেবে পরিচিত। এতে পাথরের কাজ খুব চমৎকার। উদয়পুর জগন্নাথ মন্দিরের পাশে একটি মসজিদ রয়েছে। ১৮০৭ সালে এটি তৈরি হয়েছিল। প্রথমে বাঁশের বেড়া টিনের ছাউনি দিয়ে গড়া হয়। বর্তমানে এখানে দালান বাড়ি হয়েছে। এছাড়া কারুকাজ খচিত ধর্মনগর, সোনামুড়ার দুর্গাপুর ও সোনামুড়া মসজিদ উল্লেখযোগ্য।

স্বকৃতজ্ঞ ঋণ স্বীকার

(১) বৃহৎ বঙ্গ: দীনেশ চন্দ্র সেন। (২) মন্দির মসজিদ গির্জা মঠ : কার্তিক লাহিড়ী। (৩) বাংলার মন্দির : হিতেশ্বর সান্যাল। (৪) রাজমালা: কালী প্রসন্ন সেন। (৫) ত্রিপুর রাজধানী উদয়পুর : দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ গোস্বামী। (৬) মাণিক্য শাসনাধীন ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিশ বৎসর, উদয়পুর বিবরণ, ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিশ বৎসর : ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত। (৭) ত্রিপুরা বুরুঞ্জি : রত্নকন্দলি ও অর্জুন দাস।

ছবি : অমিতাভ দাশ

ডিমাতলী মসজিদ (রাজনগর) বিলোনিয়া।

ছবি: সংগৃহীত

কালোপাহাড় ডাকে আয় !

প্রাণময় সাহা

"সবুজ পাহাড়, গুল্মলতা
বিশাল নীল আকাশ
লিখছে দেখ পংতিমালা
গড়তে অবকাশ।"

প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য বুকে ধরে আকাশের মেঘ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে থাকা দুই উচুঁভূমি। অনন্তকাল অমরপুর আর গন্ডছড়াকে প্রাচীর হয়ে আগলে রাখা যেন দুই বাহুবলী। কালঝাড়ি ও ধলাঝাড়ি। প্রকৃতির নিজের হাতে সাজানো ওই পাহাড়ী গহীন অরণ্য একসময় ছিল বাঘ, ভালুক, হাতি ও নানা প্রজাতির বানর সহ বন্যপশুদের এক নিরাপদ আশ্রয়স্থল। কালের বিবর্তনে অনেক বন্যপ্রাণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তবুও বাতাসে ভেসে আসে সুরেলা পাখীর কলতান। দেখা মেলে ভালুক, ময়ালসাপ, বনবিড়াল, বাঘডাস, বানর ইত্যাদি। পাহাড়ের হাতছানিতে ছুটে আসা পর্যটক বিমুগ্ধ নয়নে দেখেন পাদদেশের সেই বিস্তৃত জলাভূমি। ডম্বুর হ্রদ।

মায়াবী সেই পাহাড়ের হাতছানিতে যদি কেউ ছুটেও আসেন তাকে পাদদেশেই থেকে যেতে হবে? মন বিষন্ন হলেও সন্তুষ্ট থাকতে হবে ডম্বুর হ্রদের বুকে জেগে থাকা নারকেলকুঞ্জ দেখে। কারণ দেশ-বিদেশের পর্যটকদের পদচারণা নারকেলকুঞ্জে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকলেও দার্জিলিঙের টাইগার হিল সদৃশ কালাঝাড়ি পাহাড়ের পুরান ধনঞ্জয় পাড়ার মন ভোলানো অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আজও পর্যটকদের স্পর্শ পাওয়ার অপেক্ষায় প্রহর গুণছে। অ্যাডভেঞ্চার প্রেমীদের জন্য বিমর্ষ বদনে অপেক্ষা করছে মঈন টিলার সবুজ বৃক্ষরাশি।

ঘনজঙ্গল, লতাগুল্মের বাহারে সজ্জিত উঁচু পর্বতশ্রেণীকে দূরের লোকালয় থেকে নিকষ কালো দেখতে হওয়ার জন্যই বোধহয় পাহাড়টির নাম কালাঝাড়ি। এই কালাঝাড়ির পাদদেশ থেকে রাইমা সরমা নামে দুই নদী বাংলাদেশের মেঘনা নদী হয়ে বঙ্গোপসাগরে মিশে যাওয়া গোমতী। আবার ওই রাইমা সরমা নামের দুই বোনের তথা দুই নদীর উৎপত্তি নিয়ে নানান রূপকথা প্রচলিত রয়েছে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জাতি জনজাতি অংশের মানুষদের মধ্যে। রূপকথার সপক্ষে রয়েছে অসংখ্য দেবদেবীর প্রাচীন মূর্তি, পাহাড়, জল আর মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস, যুক্তি তর্ক ইত্যাদি। একসময়ে এই কালাঝাড়ি পাহাড়ের পাদদেশে ছিল জাতি জনজাতি উভয় অংশের মানুষের বসবাস। রাইমা সরমা নদীর অববাহিকায় অবস্থিত ছিল বোলংবাসা নামের জনবসতি। বাজার হাট, দোকান পাট, বাড়িঘর দোর সবই ছিল বোলংবাসায়। বোলংবাসার আত্মিক যোগাযোগ ছিল অমরপুরের ও গণ্ডাছড়ার সাথে। কালাঝাড়ির পাহাড়ের বুক চিড়ে নিজেদের তৈরি করা হাটা পথেই অমরপুরের, গণ্ডাছড়ার ও বোলংবাসার মানুষেরা তিল, কার্পাশ, পাট ইত্যাদি কাধে বয়ে যাতায়াত করতেন। পথে ক্ষুন্নিবিত্তি করার জন্য সকলের সঙ্গেই থাকতো কাচা কলা পাতায় মোরানো ভাতের মোচা (পেকেট)। কালাঝাড়ির পাহাড়ের উঁচু মঈন টিলাই ছিল পথিকদের বিশ্রামের স্থান। কালাঝাড়ি পাহাড়ের মঈন টিলা এতটাই উঁচুতে অবস্থিত যে মঈন টিলার উপর থেকে অমরপুর শহরের ও গণ্ডাছড়ার জনবসতির জনবসতির অববাহিকা অঞ্চল এবং বর্তমানের ডম্বুর লেইকের একটা অংশ প্রত্যক্ষ করা যায়। মঈন টিলার পুরান ধনঞ্জয় পাড়া থেকে পূর্ব দিকের সূর্যোদয়ের এবং পশ্চিম দিকের সূর্যাস্তের অপরূপ দৃশ্য নয়ন মনকে সার্থক করে তোলে। মেঘের স্পর্শের অনুভূতি আর হালকা মেঘের আনাগোনা প্রত্যক্ষ করে পাহাড় বেয়ে উপরে উঠে সমস্ত ক্লান্তি উধাও হয়ে যায়। নানান পশুর ডাক এবং পাখীর কলতানে, প্রজাপতির উড়ে যাওয়ার মতো প্রকৃতির নয়নাভিরাম অপূর্ব দৃশ্য মনপ্রাান ভরিয়ে দেয়। অ্যাডভেঞ্চার প্রেমী পর্যটকদের জন্য কালাঝাড়ির মইন টিলা যথার্থ উপভোগ্য স্থান। সূর্যোদয়ের দৃশ্য অবলোকন করতে গাটের

টাকা খরচ করে দার্জিলিঙের টাইগার হিলে ছুটে যেতে হবে না, যদি রাজ্যের পর্যটন দপ্তর কালাঝাড়ি পাহাড়ের মঈন টিলার পুরান ধনঞ্জয় পাড়াটিকে পর্যটকদের ভ্রমণের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়। হাতে মেঘের স্পর্শের অনুভূতির স্বর্গীয় সুখ অনুভব করা যায়। বর্তমানে অমরপুরের পাহাড়পুর ভিলেজ থেকে পাহাড়ি হাটা পথে ঘন জঙ্গল ভেদ করে ছড়া নালা ঝোপঝাড় ইত্যাদি পেরিয়ে চড়াই উৎরাই বেয়ে কালাঝাড়ি পাহাড়ের মঈন টিলার পুরান ধনঞ্জয় পাড়ায় পৌছানো যায়। যদিও একসময় ওই মঈন টিলাই ছিল রাজ্যের বাঘাবাঘা জঙ্গীদের নিরাপদ আস্তানা। জঙ্গীরা সমতল থেকে অপহরণ করে কালাঝাড়ি পাহাড়ের গহীন অরণ্যে লুকিয়ে রাখত এবং জঙ্গী নেতারা নিজেরা তাদের সাগরেদদের নিয়ে মঈন টিলার উপরের নিরাপদ আস্তানায় দিন যাপন করতেন। আর মঈন টিলার নিরাপদ আস্তানা থেকেই পুলিশ প্রশাসনের যাবতীয় গতিবিধি লক্ষ্য রাখতেন। রাজ্য পুলিশের টিপিএস অফিসার রাজু রিয়াং অমরপুরের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক থাকাকালীন সময়ে জঙ্গী বিরোধী অভিযানে গিয়েই কালাঝাড়ি পাহাড়ের পুরান ধনঞ্জয় পাড়ার অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের হদিস পান। পরবর্তি সময়ে বিধায়ক রঞ্জিত দাস অমরপুর ব্লকের বিডিও উৎপল দাস সহ স্থানীয় একদল যুবক সরেজমিনে কালাঝাড়ি পাহাড়ের পুরান ধনঞ্জয় পাড়া ও মঈন টিলা পরিদর্শন করে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর মেঘের কোমল স্পর্শে অভিভূত হতেই পর্যটনের প্রাদ প্রদীপে আসতে শুরু করে। আর তারই ফল স্বরূপ গত বছরের কালাঝাড়ি পর্যটন উৎসব ত্রিপুরা রাজ্যের একটা বিশাল

কালাঝাড়ি পাহাড়।

অংশকে বছর বছর বন্যা থেকে রক্ষা করতে এবং রাজ্যে একটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যেই কালাঝাড়ি পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে প্রবাহিত হওয়া গোমতী নদীর উৎস স্থলে বাঁধ নির্মাণ করা হয়। যা ডুম্বুর জলপ্রপাত হিসাবেও পরিচিত। বাধের ফলে সৃষ্ট আনুমানিক ৪১ বর্গকিলোমিটার আয়তনের ডুম্বুর হ্রদ কিংবা জলাশয়টি রাইমা ও সরমা নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত এবং এর আকৃতি অনেকটা তীরের মতো ছোট ড্রামের সাদৃশ্য যা শিবের ডমরু'র মত দেখতে। যা থেকেই ডমরু থেকেই ডুম্বুর নামের উৎপত্তি বলে কেউ কেউ মনে করেন! ডুম্বুর হ্রদের মাঝে ৪৮টির মতো ছোট-বড় দ্বীপ রয়েছে যার মধ্যে নারকেল কুঞ্জই সবচেয়ে সুন্দর ও আকর্ষণীয়। ডুম্বুর বাঁধ নির্মাণের ফলেই রাইমা-সরমা নদীর সঙ্গম স্থলের অববাহিকায় অবস্থিত বোলংবাসা নামক জনবসতি জলের তলায় তলিয়ে যায়। পুরোপুরিই অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায় বোলংবাসাসহ পার্শ্ববর্তী বেশ কয়েকটি জাতি-জনজাতির বসতির। ডুম্বুর বাঁধ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন হোক বা না হোক ওই বাঁধের ফলে বাস্তুভূমি উচ্ছেদ হওয়া মানুষের দীর্ঘশ্বাস প্রশ্বাসের উপরেই বিশালাকায় হ্রদ বা জলাধার তৈরী হয়ে যায়। ওই সময়ে ডুম্বুর জলাশয়ে প্রাকৃতিক ভাবেই প্রচুর মাছের সন্ধান মেলে। বিশালাকার রুই, কাতল, মৃগেল, কারফু, ঘইন্না, গজার ইত্যাদি প্রজাতির বড় মাছের পাশাপাশি মকা, টেংরা, পুঠি, কই, মাগুর, শিং এবং বিক্ষিপ্ত ভাবে কাইক্কা, পাবদা, গুলাইয়া, চিংড়ি, চান্দা ইত্যাদি ছোট মাছের জন্য প্রসিদ্ধ লাভ করে ডুম্বুর জলাশয়। কিন্তু একটা সময় সরকারী বেসরকারী মাছ চোরেদের উৎপাতে ও জঙ্গীদের দৌরাত্ম্যে এবং সঠিক

পরিকল্পনার অভাবে ডুম্বুর জলাশয়ের মাছের যোগান কমতে কমতে বর্তমানে রিক্ত অবস্থায় পৌঁছায়। ডুম্বুর জলাশয় যে মহকুমায় অবস্থিত সেই গণ্ডাছড়া মহকুমার মানুষই ডুম্বুর জলাশয়ের মাছের আস্বাদন পাওয়া থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। মাছের যোগান কমে যাওয়ায় উন্নত মাছ চাষের লক্ষ্যে ডুম্বুর জলাশয়টি বর্তমানে কোন এক বেসরকারী সংস্থার হেপাজতে চলে গেছে বলে খবর? পাশাপাশিসরকারিভাবেও মাছ উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা কিন্তু অব্যাহত রয়েছে ডুম্বুর জলাশয়ে।

ডুম্বর বাঁধের ফলে লেকের মাঝেই অর্থাৎ বোলংবাসার বুকে গড়ে উঠা আটচল্লিশটির মতো ছোট বড় দ্বীপের একটি নারকেল কুঞ্জ নামে খ্যাত। ডুম্বুর জলাশয়ের ওই দ্বীপে এক সময় কৃষি দপ্তর থেকে কয়েকশো নারকেল চারা লাগানোর পর কৃষি কর্মীদের একান্ত তত্ত্বাবধানে ও তাদের প্রচেষ্টাতেই চারাগুলি সুদৃশ্য নারকেল গাছে পরিণত হয়েছে। আশির দশক থেকেই নারকেল বাগানে পিকনিক প্রেমীদের আনাগোনা শুরু হয়ে যায়। অপর্যাপ্ত যোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্যেই ডুম্বুর জলাশয়ে জলকেলি করতে আর ডিঙ্গি নৌকায় নারকেল কুঞ্জ ভ্রমণে পিকনিক প্রেমীদের ভীড় বাড়তে থাকে। লোকের মুখে পরিচিতি পেতে শুরু করে নারকেল বাগান। কিন্তু বাদ সাধে জঙ্গী তৎপরতা। এক সময় জঙ্গীদের নিরাপদ আস্তানায় পরিণত হয় নারকেল বাগানসহ তৎসংলগ্ন অঞ্চলসমূহ। উগ্রবাদীদের তৎপরতায় অচিরেই ভ্রমণ পিপাসু ও পিকনিক প্রেমীদের নারকেল বাগানে যাতায়াত বন্ধ হয়ে যায়। জঙ্গী উৎপাতে এবং পর্যাপ্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে নারকেল কুঞ্জের গাছগুলি বিলুপ্ত হতে হতে হাতে গোনা কয়েকটিতে পরিণত হয়। আগাছায় ভরে গিয়ে মাথা সমান ঘন জঙ্গলে পরিণত হয় সাধের নারকেল কুঞ্জ। স্বভাবতই পিকনিক প্রেমীরা নারকেল কুঞ্জ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। ওই সময়েই ডুম্বুর জলাশয়ের পাহাড়ায় নামানো হয় রাজ্যের সসস্র বাহিনীর জওয়ানদের। বছর দশেক আগে থেকেই রাজ্যে শান্তি সম্প্রীতির বর্তমান ফিরে আসতেই ডুম্বুর জলাশয় আর নারকেল বাগানও ছন্দে ফিরে ক্রমেই প্রাদপ্রদীপে আসতে শুরু করে। ভ্রমণ পিপাশু পর্যটকদের ও পিকনিক প্রেমীদের আনাগোনা বাড়তে থাকে ডুম্বুর লেইকের নারকেল কুঞ্জে। সময়ের দাবীতে রাজ্যের পর্যটন দপ্তর ও নারকেল কুঞ্জের উন্নয়নে হাত লাগায়। দেশ বিদেশের পর্যটকদের নিকট আকর্ষণ বাড়াতে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেয় রাজ্য পর্যটন দপ্তর। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অব্যবস্থা থাকলেও ইতিমধ্যে আদর্শ পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত হওয়ার দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছে নারকেল কুঞ্জ। ডুম্বুর হ্রদের জলে ভ্রমণের অভিজ্ঞতাকে কেউ কেউ সুইজ্যারল্যাণ্ড কেউ আবার আমাদেরই ভূস্বর্গ কাশ্মীরের ডাল লেকের সাথে তুলনা করতে শুরু করেছেন। তবে এটাও ঠিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর ডুম্বুর জলাশয়টিকেও নয়নাভিরাম নারকেল কুঞ্জকে এবং তার আশপাশের অন্যান্য ব-দ্বীপগুলিকে সাজিয়ে গুছিয়ে পর্যটকদের নিকট আরও আকর্ষণীয় করে তোলা যায়। আর সেটা করতে পারলে কৃত্রিম হ্রদ ডুম্বুর এবং নারকেল কুঞ্জ প্রতিযোগিতার বাজারে সমগ্র দেশের মধ্যে না হোক সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে অন্যতম আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে। অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও নিরিবিলি শান্ত পরিবেশে ও টাটকা খাবার দাবারের জন্য নারকেল কুঞ্জ ইতিমধ্যে পর্যটকদের মনে দাগ কাটতে সক্ষম হয়েছে। আর এই ডুম্বুর জলাশয় যে মাছ চাষের জন্য উর্বর তার আর প্রমাণের প্রয়োজন নেই। দরকার শুধু সদিচ্ছা আর সচ্ছ মানসিকতার।

রাজ্যের রাজধানী আগরতলা থেকে কমবেশী একশো কুড়ি পচিশ কিলোমিটার দূরে অবস্থান নারকেল কুঞ্জ পর্যটন ক্ষেত্রের। বিভিন্ন সড়ক পথে নারকেল কুঞ্জ পর্যটন কেন্দ্রে পৌঁছানো যায়। তবে সব থেকে সহজে পৌঁছানোর জন্য রাজধানী থেকে সড়ক পথে অমরপুর পৌঁছে সেখান থেকে গণ্ডাছড়া সদর পেরিয়ে তৈচাকমা হয়ে দেড় দুই ঘন্টার জার্নির মাধ্যমে সহজেই নারকেল কুঞ্জে পৌঁছানো যায়। আবার অমরপুর থেকেই সবুজের সমারোহ উপভোগ করতে করতে জল পথে গোমতী নদীর উৎসে হ্রদের অফুরন্ত ঘন নীল জলরাশি ভেদ করে মুক্ত আকাশের নিচে দিয়ে মাছরাঙ্গাদের ডাক শুনতে শুনতে নৌকায় ভ্রমণের অ্যাডভ্যানচার আর উপভোগ্য অভিজ্ঞতা অর্জনের

মধ্য দিয়েও নারকেল কুঞ্জে পৌঁছানো যায়। অনুরূপ ভাবে গণ্ডাছড়া সদর থেকে ডুম্বুর জলাশয়ের উপর দিয়ে হস্ত চালিত নৌকা কিংবা স্পিডবোটে চেপেও নারকেল কুঞ্জে পৌঁছানো যায়।

অন্যান্য পর্যটন ক্ষেত্রের মত ডুম্বুর হ্রদ কিংবা নারকেল কুঞ্জ বাণিজ্যিক ভাবে ঠিক ততটা উন্নত না হলেও দেশ বিদেশের পর্যটকদের ভিড় কিন্তু লেগেই আছে নারকেলকুঞ্জে । অনলাইনে অগ্রীম বুকিং ব্যতীত নারকেল কুঞ্জে রাত্রি যাপন এখন অসম্ভব ব্যাপার। তবে সুখের কথা হলো নারকেল কুঞ্জের পাশেই একটি দ্বীপে বেসরকারী উদ্যোগে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত মালিকানাধীন কয়েকটি রিসোর্ট তৈরী হয়েছে। সর্বসুবিধা সম্পন্ন না হলেও একেবারে অসুবিধাও হয় না। ডুম্বুর জলাশয় ও নারকেল কুঞ্জ যে ভাবে ভ্রমণ পিপাসু পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হচ্ছে তাতে করে পর্যটন নিগমের কর্তাদের নারকেল কুঞ্জের পরিকাঠামোগত উন্নয়নে এবং আধুনিকরণে আরও মুন্সিয়ানা দেখাতে হবে।

এজন্য অবশ্যই প্রয়োজন উন্নত পর্যটন অবকাঠামো। উন্নত সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা। আধুনিক সর্ব সুবিধা যুক্ত পর্যাপ্ত থাকার ও খাবারের জায়গার ব্যবস্থা। পর্যটন-বান্ধব সুবিধা যেমন কটেজ, বেঁস্তোরা, ইকো-ট্যুরিজম প্রকল্প ইত্যাদি। চালু করতে হবে প্রফেশনাল গাইডেড ট্যুর। এছাড়া জল দূষণ প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। স্থানীয় সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাও একান্ত জরুরি। জলাশয়ের জলজ বাস্তুতন্ত্র এবং বিভিন্ন প্রজাতির মাছের সমৃদ্ধি ইত্যাদি ঠিকঠাক করতে পারলে অত্র অঞ্চলের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ শক্ত পোক্ত হবে। পর্যটন শিল্পের গতি হবে বেগবান।

পর্যটন নিগম ডুম্বুর হ্রদ সহ নারকেল কুঞ্জের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও কালাঝাড়ি পাহাড়ের প্রাকৃতিক সম্পদ ও সৌন্দর্যকে পর্যটকদের সামনে তুলে ধরার জন্য এখনও পর্যন্ত তেমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। কালাঝাড়িপাহাড়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর ডুম্বুর জলাশয়ের নারকেল কুঞ্জ ত্রিপুরার আর্থিক বিকাশের লুকানো রত্ন ভাণ্ডার। কালাঝাড়ি পাহাড়ের মঈন টিলার মায়াবী সৌন্দর্য, ভ্রমণ বিলাসী অ্যাডভেঞ্চার প্রেমীদের জন্য একটি অন্যতম গন্তব্য হয়ে উঠতে পারে। এজন্য প্রয়োজন শুধু একটু আন্তরিক পরিকল্পিত দৃষ্টিভঙ্গি!

ডম্বুর হ্রদ। ছবি : প্রাণময় সাহা

পুজো সংখ্যার তথ্য তালাশ

সঞ্জীব দে

দুর্গাপুজো তার রূপ পরিবর্তন করেছে অনেকদিন। মূর্তি থেকে শুরু করে মন্ডপ, আলোক কোথায়ও নেই সেই সাবেকিয়ানা। আধুনিক নানা সংযোজন, বিয়োজনে পুজো অবয়ব পাল্টে উৎসবে রূপান্তরিত হয়েছে। সময়ের হাত ধরে উৎসবেও লেগেছে নিত্যনতুন রঙ। ভিন্ন কলেবর হিসেবে যুক্ত হয়েছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সামাজিক কর্মকান্ড এবং শারদ স্মরণিকা। বর্তমান সময়ে দুর্গোৎসব শারদ স্মরণিকা বা পুজো সংখ্যা ছাড়া কেমন যেন অসম্পূর্ণই মনে হয়। দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে সারা বিশ্বে বাংলাভাষায় অসংখ্য পুজো সংখ্যা বের হয়। পুজো সংখ্যা আর উৎসব যেন মিলেমিশে এক হয়ে গেছে।

সম্ভবত ১২৭৯ বঙ্গাব্দ থেকে দুর্গাপুজাকে কেন্দ্র করে শারদ বা পুজোসংখ্যা ওতোপ্রোত ভাবে জড়িয়ে গেছে। ১৮৭২ সালে কেশবচন্দ্র সেন সম্পাদিত সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 'সুলভ সমাচার', ছুটির সুলভ নামে প্রথম শারদীয়া সংখ্যা প্রকাশ করে। এক পয়সার সেই বিশেষ সংখ্যা বেরোয় ১২৮০ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে। তারপর থেকে 'সাধনা' ভারতবর্ষ, বঙ্গবাণী, আনন্দবাজার প্রভৃতি পত্রিকা পুজো সংখ্যা প্রকাশ শুরু করে। তখনকার দিনের নামী লেখকেরা যেমন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রভাকুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখেরা এতে লিখতেন।

অনেক মনে করেন , অকালবোধনের সঙ্গে শারদ সাহিত্য মিলেমিশে একাকার হয়ে যাওয়ার নেপথ্যে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। পুজোর ছুটি সংস্কৃতি প্রিয় বাঙালি শুধুই কি অবসরে কাটাবে? ১২৯৮-এর অগ্রহায়ণ মাসে প্রথম প্রকাশিত হয় 'সাধনা' পত্রিকা। 'ছুটির সুলভ' প্রথম শারদীয় সংখ্যা হতে পারে তবে, বাঙালি প্রথম বার শারদ তৃপ্তির রসদ পায় এই পত্রিকাতেই। ১২৯৯ বঙ্গাব্দে সাধনা পত্রিকার ভাদ্র-আশ্বিন যুগ্ম সংখ্যা শারদ সংখ্যা হিসেবেই প্রচারিত হয়েছিল। সে সংখ্যা বোধ হয় সেরা শারদ সংখ্যার একটি! কারণ, সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শারদ গল্পের লেখক ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। ১৩২৫বঙ্গাব্দ রবীন্দ্রনাথের ছোট জামাই নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 'পার্বতী' পত্রিকার শারদীয়া বার্ষিকী সম্পাদনা করেন। এখানেই সম্ভবত প্রথম পুজোর গান রবীন্দ্রনাথ জমা দেন। গানটি ছিল 'শরতেআজ কোন অতিথি এল প্রাণের দ্বারে...।' প্রথম শারদ উপন্যাস ছাপা হয় শারদীয়া বসুমতীতে। ইংরেজি ১৯২৬খ্রীঃ প্রথম পুজো সংখ্যা বের করে আনন্দবাজার পত্রিকা। তার বেশ কিছু বছর পর তাতে প্রথম উপন্যাস ছাপা হয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শহরতলী', রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত বড় গল্প 'রবিবার' প্রকাশিত হয় এখানেই। পরের বছরই উপন্যাস 'ল্যাবরেটরি'।

দেশ পত্রিকার শারদ সংখ্যা প্রথম প্রকাশ পায় ১৩৪১ বঙ্গাব্দে আর সুবোধ ঘোষের 'ত্রিযামা'ছিল দেশ-এ প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস, যা বেরিয়েছিল ১৩৫৬ বঙ্গাব্দে। এর পর ষাটের দশক থেকে পূজাবার্ষিকীতে একাধিক, এমনকি ছয়-সাতটি করে উপন্যাস। সমকালের বিখ্যাত

লেখকেরা সেগুলি লিখতেন। যেমন পুরানো দেশ পত্রিকার সংখ্যা খুললেই দেখা যাবে প্রথমেই অবশ্য উপস্থিতি রবীন্দ্রনাথের, তাঁর অপ্রকাশিত লেখা বা চিঠিপত্রের সম্ভার। তারপরেই থাকত রবীন্দ্রনাথ বিষয় প্রবন্ধ, নিবন্ধ। তারাশঙ্কর, মানিক, বিভূতি, সতীনাথদের যুগের পর তাঁদের ব্যাটন ধরেন সমরেশ বসু, রমাপদ চৌধুরী, বিমল কর, জ্যোতিন্দ্র নন্দী, সুনীল, শীর্ষেন্দু, সমরেশ মজুমদারেরা। সত্যজিতের হাত ধরে ফেলুদার সঙ্গে আমাদের পরিচয় পুজো সংখ্যায়। অধিকাংশ কিশোর-কিশোরী কিকিরা, প্রফেসার শঙ্কু, গোগল, কর্নেল আর ম্যাজিশিয়ান-এর সঙ্গে পূজাবার্ষিকী আনন্দ-তেই পরিচিত হয়েছে।

পুজো সংখ্যা যেন বাঙালির একান্ত নিজস্ব সংস্কৃতির চর্চা। বাঙালির শারদীয়া ছুটি তখনই পরিপূর্ণ হয়, যখন হকারের হাত থেকে শারদ সংখ্যা হাতে আসে। নবীন-প্রবীন লেখক শারদ সংখ্যা পাওয়ার জন্য মুখিয়া থাকেন। কিন্তু শিউলি আঘ্রাণ মাখতে মাখতে শারদ সংখ্যা পড়ার অভিজ্ঞতা এ প্রজন্মের নেই এবং কথা উঠেছে মানুষের পড়ার প্রবণতা কমছে। শারদ সাহিত্য বোধ হয় সে তথ্য ভুল প্রমাণ করে। সেকাল থেকে একাল দিকে দিন শারদ সংখ্যা বাড়বাড়ান্ত অগুন্তি বাণিজ্যিক পত্রিকায়, ব্লকজিন, এমনকি ই-ম্যাগাজিনেও নতুন নতুন কলম পূজাবার্ষিকীকে সমৃদ্ধ করছে। এখন আর তখনকার সময় ও সাহিত্যে বিস্তর ফারাক থাকতেই পারে তবে হ্যাঁ, এখনও বহু সংখ্যক মানুষ উৎসবকে উপলক্ষ করে অক্ষর এবং তখনকার সময় ও সাহিত্য বিস্তর ফারাক থাকতেই পারে তবে হ্যাঁ, খনও বহু সংখ্যক মানুষ উৎসবকে উপলক্ষ করে অক্ষর এবং ভাষার সঙ্গে জুড়ে যাচ্ছেন বা জুড়ে থাকতে চাইছেন, এতে অন্বেষণের মৃদুআলো যদি আরও কিছুদিন টের পাওয়া যায়, মন্দ কী!

ত্রিপুরায় শারদ স্মরণিকা বা পুজো সংখ্যা প্রকাশের ইতিহাস নেহাৎ কমদিনের নয়। হাতে পাওয়া তথ্য বলছে ১৯৪৯সালে অনিল ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'সমাচার' এবং বীরেশ চক্রবর্তী সম্পাদিত 'ত্রিপুরা' পত্রিকাই প্রথম প্রকাশ করে শারদ সংখ্যা। প্রথম ক্লাব ভিত্তিক যে শারদ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল তা সম্ভবত সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত ক্লাবের উদ্যোগে। ১৯৭৩ সালের সেই পুজো সংখ্যার সম্পাদক ছিলেন দেবব্রত দেব। এই সংখ্যায় দীর্ঘ উপন্যাস লিখেছিলেন সমীর রায়, কবিতা লিখেছিলেন সলিল কৃষ্ণ দেববর্মন, প্রদীপ বিকাশ রায়, সত্যব্রত চক্রবর্তী, শঙ্খপল্লব আদিত্য। প্রবন্ধ লেখেন রামপ্রদ দত্ত (পল্টুদা), গল্প লিখেছেন ভীষ্মদেব ভট্টাচার্য প্রমুখ। ত্রিপুরা দর্পণ পত্রিকার শারদ সংখ্যা প্রকাশ শুরু হয় ১৯৯০ সাল থেকে। এছাড়া গোপাল রায় সম্পাদিত 'গনসংবাদ পত্রিকা', ধীরাজ গুহ সম্পাদিত 'আরোহন' এরও শারদ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এছাড়াও দৈনিক সংবাদ, স্যন্দন পত্রিকা, মানুষ পত্রিকা, ত্রিপুরা ভবিষ্যৎ, আজকের ফরিয়াদ , সত্য কথন, শারদ সংখ্যা প্রকাশ করে। পূর্বাভাসের এখন চলছে ২৮তম সংখ্যা। রামঠাকুর সংঘ, মডর্ন ক্লাবও শারদ সংখ্যা প্রকাশ করে। ৮০'র দশকে অরুন্ধতীনগরের অরবিন্দ সংঘে প্রয়াত কবি আশিস দাসের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'বোধন'। পরবর্তীতে অনিয়তভাবে তা প্রকাশিত হয়ে চলেছে। বিগত বছরগুলিতে এর সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন নাট্যকার শুভাশিস চৌধুরী । সমীরণ রায় সম্পাদিত "রাজধানী আগরতলা" শারদ সংখ্যা প্রথম প্রকাশ হয়েছিল ১৮৭৬ সালে।

ক্লাবের পুজো সংখ্যাগুলোর মধ্যে যেমন মৌচাক, পুন্নাগ, সংহতি, ত্রিবেনী , নতুন আকাশ, বৈজয়ন্তী, বলাকা, শারদ প্রকাশ, প্রবাহ, ভুবনডাঙা, বর্তমান সময় ইত্যাদি। বিলোনীয়া থেকে হরিপ্রসাদ মজুমদার সম্পাদিত পত্রিকা "প্রহরী প্রকাশিত হয় ২০০৬ সালে। কৈলাসহর থেকে নেতাজী মেমোরিয়াল ক্লাবের শারদ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৪২৮ বঙ্গাব্দে। ত্রিবেনী সংঘের শারদ সংখ্যা 'ত্রিবেনী' (সম্পাদক মন্ডলী)। জনকল্যান সমিতির শারদ সংখ্যা 'ঐকতান' (রনজিৎ চক্রবর্তী, এখন গৌতম ব্যানার্জি), সংঘশ্রী ক্লাবের প্রয়াস (দ্বৈত সম্পাদক), উন্নয়ন সংঘের উন্মীলন (দ্বৈত সম্পাদক), কোরাস ক্লাবের 'অভিযান' । এছাড়া বীরেন্দ্র ক্লাবের শারদ সংখ্যা, শিবনগর মর্ডান ক্লাব ও আমরা তরুণ দলের শারদীয়া মধুপর্ণা, ২০২২, 'প্রতিবিম্ব' (২০২৪) সম্পাদক পার্থ সারথি দেব, শঙ্কর বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বর্তমান সময়' (১৪১৭বঙ্গাব্দ, শারদ সংখ্যা), শারদীয় সোমবার ১৪১৪, সম্পাদক চারু চন্দ্র কর। উদয়পুর থেকে সুব্রত দেবের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক পত্রিকা 'ত্রিপুরা সময়' উৎসব সংখ্যা ২০১৫। ইয়ুথ ক্লাবের সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষের

(১৪১০) পুজো সংখ্যা 'রাঙ্গমাটি' সম্পাদক দীপঙ্কর দেব, বিবেক সংঘের দুর্গাপূজার রজতজয়ন্তী বর্ষের (২০০৮) শারদা সংখ্যা 'বিবেক' সম্পাদক বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য, সম্পাদনা সহযোগী অমিতাভ দাশ, উদয়পুর বাজার সর্বজনীন দুর্গোৎসব (ফ্লাওয়ার্স ক্লাব), শারদ স্মরণিকা (২০১৮), চাঁদের পাহাড় উৎসব সংখ্যা। সাব্রুম ভারত সংঘের পূজা সংখ্যা 'শারদ অর্ঘ', সম্পাদক অপু দে। বিলোনীয়া নেতাজি ক্লাবের শারদ সংখ্যা, সৃজা, আর্য, দক্ষিণী এগুলোও মূলত শারদ সংখ্যা। রাজ্যের একেবারে শেষ প্রান্ত চুড়াইবাড়ি থেকে ১৯৯৭ সাল থেকে প্রকাশিত হয় শতদল শারদ সংখ্যা। যার প্রথম সম্পাদক ছিলেন রাহুল ভট্টাচর্য, পরে তা সম্পাদনা করছেন রতন চন্দ। শব্দনীল শারদ সংখ্যা সম্পাদনা করছেন ঋষিকেশ নাথ। বিজয় পালের সম্পাদনায় ২০০৬ সালে 'প্রান্তর' প্রকাশিত হয়েছিল। জ্বালা, সম্পাদক দিলীপ দাস, যদিও জ্বালা পত্রিকাটি কবি অনিল সরকারসহ অনেকেই বিভিন্ন সময় সম্পাদক হিসাবে ছিলেন। প্রথম প্রকাশ ১৯৮০ সাল, (প্রথম শারদ সংখ্যা করেন ১৯৮৪সালে)। সাব্রুম থেকে প্রকাশিত 'বিজয়া', সম্পাদক সঞ্জীব দে, প্রথম প্রকাশ ২০১১। 'কৃষ্টি' সম্পাদক কবিতা ভট্টাচার্য (শারদ সংখ্যা), 'শব্দনীল' হৃষিকেশ নাথ (শারদ সংখ্যা), কৈলাশহর থেকে প্রলয়েন্দু চৌধুরীর সম্পাদনায় সাপ্তাহিক কাগজ 'ত্রিপুরা প্রবাহ' শারদ সংখ্যা। আর্য শারদ সংখ্যা 'সমর বিশ্বাস, 'দক্ষিনী' শারদ সংখ্যা প্রথম প্রকাশ ২০২৮সাল। টুটন চক্রবর্তী ও সুরজিৎ সরকার সম্পাদিত 'সৃষ্টলোক', মনুতট শারদ সংখ্যা গোপাল চন্দ্র দাস, 'সৃষ্টি শারদ সংখ্যা শ্রীমান দাস, সৈকত মজুমদার প্রথম প্রকাশ ২০১৩।

নাট্যকার সুভাষ দাসের সম্পাদনায় প্রকাশিত শারদ সংখ্যা আরশিনগর (প্রথম প্রকাশ ২০১৬ সাল)। 'তরুণ' শারদ সংখ্যা প্রথম প্রকাশ ২০১৪সাল, সম্পাদক অঞ্জনকুমার সাহা, বিশালগড়। 'উত্তরণ' শারদ সংখ্যা ২০১১, উৎসব সমাচার গোবিন্দ ধর। 'চেতনা' শারদ সংখ্যা ২০২১ বিশালগড় রাউৎখলা যুব সংস্থা। শারদ সংখ্যা উত্তরমেঘ ২০১০ সাল থেকে প্রকাশিত, 'দৈনালী' মিঠু মল্লিক বৈদ্য ২০১৯ শারদ সংখ্যা। ধলাই থেকে জহর দেবনাথের সম্পাদনায় 'প্রবাহ' শারদ সংখ্যা প্রথম প্রকাশ ২০০০সাল, বিশালগড় অফিসটিলা যুবক সংঘের শারদ সংখ্যা 'চন্দ্রিমা' প্রথম প্রকাশ ২০১৩ সাল। দেশের কথা পত্রিকার উদ্যোগে ১৯৯৬ সালে বিজয় পালের সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয় শারদ 'শিশুমহল' , বর্তমানে নিয়মিত সম্পাদনা করছেন রঞ্জনা দত্ত। বীরেন দত্ত যখন 'দেশের ডাক' সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক তখন তাঁর উদ্যোগে প্রকাশিত হয়েছিল পুজো সংখ্যা। প্রতিভা সাব্রুমের প্রথম শারদ সংখ্যা (১৯৮৮সাল) সম্পাদক হরিহর দেবনাথ, সহযোগিতায় অনাদি চৌধুরী। ১৯৯০ সালে লোক সংস্কৃতি শারদ সংখ্যা সম্পাদক ডঃ রনজিৎ দে, বিজয়া ২০১১সাল ,সম্পাদক শ্রীমান দাস, সৈকত মজুমদার।

এছাড়া ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেড (বি.এস.এন.এল) থেকে কিশোর রঞ্জন দে সম্পাদিত 'শারদ সঞ্চার' ১৪০৮, ১৪০৯)। প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো (পি.আই.বি) থেকেও 'প্রবাহ' নামে শারদ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে।

পুনশ্চঃ পুজো সংখ্যাকে কেন্দ্র করে প্রতিবছরই নতুন নতুন লেখক কবি উঠে আসেন। ক্লাবগুলো মোটা অংকের বাজেট নির্ধারন করেন ঠিকই কিন্তু পুজো সংখ্যার লেখকদের জন্যে কোন সম্মান দক্ষিনার ব্যবস্থা থাকে না। এক্ষেত্রে পুজো উদ্যোক্তাদের একটু ভাবনা চিন্তা করার অনুরোধ রাখছি। 'প্রবাসী'তে প্রবন্ধ লিখে অর্থ লাভ করে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, "মাসিক পত্র থেকে এই আমার প্রথম আর্থিক পুরস্কার।"

ছবি: সঞ্জীব দে

দীপার উত্তরসূরী অলিম্পিয়ান কে?

সরযূ চক্রবর্তী

রাজ্যের অলিম্পিয়ান জিমন্যাস্ট দীপা কর্মকারের উত্তরসুরী কে? প্রশ্নটি সহজ হলেও বর্তমান সময়ে এর কোন জবাব নেই। আগামী দুটি অলিম্পিকেও সম্ভাবনা কম! তাহলে?

রাজ্যে খেলাধূলার সুদীর্ঘ ইতিহাসে অলিম্পিকের আঙ্গিনায় বিচরণের সংখ্যা নগণ্য। সোমদেব দেববর্মন ২০১২ লণ্ডন অলিম্পিকে ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি নিয়ে টেনিসে নেমেছিলেন। আর দীপা ২০১৬ রিও অলিম্পিকে শেষ মুহূর্তে কোয়ালিফাইং টুর্নামেন্টে লড়ে ভল্টিং টেবিলে ছাড়পত্র পান। পদকের যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত লড়ে অল্পের জন্য ব্রোঞ্জ হাতছাড়া করে চতুর্থ হন।

এরপর শুধুই হতাশা। টোকিও অলিম্পিক (২০২১) ও সর্বশেষ প্যারিস অলিম্পিক (২০২৪) ত্রিপুরা শূন্য ভারতীয় দল গেছে। আসছে ২০২৮ লস এঞ্জেলস অলিম্পিক। সেখানেও ভারতীয় দলে ঢোকার মত খোলোয়াড় আপাতত নেই! এমন কি ২০৩২ অলিম্পিকেও একই অবস্থা।

এরাজ্যে খেলাধূলার চর্চা প্রচুর। কিন্তু গোটা বিষয়টা দিশাহীন। ফলে জাতীয় ক্ষেত্রে এবং আন্তর্জাতিক আসরে এরাজ্যের খেলোয়াড়দের সাফল্য একেবারে নেই বললেই চলে। দীপ যতটা সময় ছিলেন, সেসময় কিছু সাফল্য ছিল। এরপর ধীরে ধীরে সেই ধারা অস্তমিত। অন্ধকারে নিমজ্জিত ভবিষ্যত প্রজন্ম!

সোমদেব ত্রিপুরার হলেও তার ক্যারিয়ার পুরোটাই তৈরী হয়েছে রাজ্যের বাইরে। চেন্নাই থেকে আমেরিকা পর্যন্ত একটা বিশাল লড়াই ছিল তার। ফলে এশিয়ান গেমসে স্বর্ণপদক জয় থেকে আন্তর্জাতিক আসরে চারটি গ্র্যাণ্ডস্লামের লড়াইয়ে তাকে দেখা গেছে ভারতের তেরঙ্গার নীচে।

দীপা'র অলিম্পিকের প্রস্তুতির প্রায় পুরোটাই ছিল দিল্লীতে। সেখানেই তার দ্রোণাচার্য কোচ বিশ্বেশ্বর নন্দী এবং বিদেশী কোচরা (কিছুটা সময়) তাকে তৈরী করেছেন। যার সুফল রিও অলিম্পিকে তার স্বপ্নের লড়াই।

কিন্তু প্রশ্ন একটাই — এরপর? ত্রিপুরার ভাঁড়ার শূন্য! জুডোতে খেলো ইণ্ডিয়া স্কিমে ভূপালে রয়েছে অস্মিতা। বিলোনীয়ার এই মেয়েটি চেষ্টা করে চলেছে। কিন্তু অলিম্পিকে যোগ্যতা অর্জন বিশাল ব্যাপার। অস্মিতা কি পারবে সোমদেব, দীপাদের এলিট ক্লাবে নিজেকে নিয়ে যেতে? সেটা সময়ই বলবে। এর বাইরে ধারেকাছে নেই কেউ।

দিশাহীন খেলাধূলা হলে এর পরিণতি এমনটাই হবে। খেলাধূলা এরাজ্যে বিস্তর চলছে। কিন্তু এর কোন দিশা নেই। লক্ষ কোটি টাকা খরচা করেও কোন লাভ হবে না যদি না অলিম্পিয়ান তৈরীই কোন সুনির্দিষ্ট ও সঠিক পরিকল্পনা থাকে। আমাদের রাজ্যে খেলোয়াড় থেকেও বেশী প্রাধান্য পান কর্মকর্তারা। আর এর ফলে কোন পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ নিতে পারে না! এ আগেই পরিকল্পনাগুলোর অপমৃত্যু হয়। আমরা যে তিমিরে ছিলাম সেখানেই থেকে যাই!

প্যারিস অলিম্পিকে বিভিন্ন দেশ নিজেদের যে উচ্চতায় নিয়ে গেছে, আমাদের কল্পনাও সেই সাফল্য ছুঁতে পারবে না। ১০০ মিটার স্প্রিন্টে সেকেণ্ডের ভগ্নাংশ সময়ের হিসেবে ফয়সলা হয়েছে তিনটি পদকই। উসাইন বোল্টের রেকর্ড অক্ষত থাকলেও ১০ সেকেণ্ডের নীচে ছিল প্রায় সব এথলেটের লড়াই। অকল্পনীয় এই সাফল্য। যে মেয়েটি রিও অলিম্পিকে দীপা'র সাথে লড়ে তাক লাগিয়েছিল, সেই আমেরিকান জিমন্যাস্ট সিমনা বাইলস টোকিও-তে মানসিক সমস্যায় খেলতে পারেন নি। আট বছর পর ফের প্যারিসে স্বমহিমায় ফিরেছেন, পদক জিতেছেন, দেশকে গর্বিত করেছেন। এই লড়াই করার মতো এথলেট গোটা ভারতবর্ষেই কম। জেভলিন থ্রোয়ার সোনার ছেলে নীরজ তো সবাই হয় না। আর ত্রিপুরা বিষয়গুলো ভাবতেই পারে না। ফলে খেলাধূলায় দৈন্যদশা চলছে। মানসিক দিক থেকে আমাদের ছেলেমেয়েরা অনেক পিছিয়ে। কবে আমরা দীপার উত্তরসূরী পাবো? স্পষ্ট করে বললে অন্ধকারে হাতড়ে চলেছি আমরা। এর শেষ কোথায়? সময় দেবে সেই উত্তর!

লোকসংগীতের প্রাণপুরুষ ঃ অমর পাল

সুবিমল ভট্টাচার্য

১৯৬২-৬৩ সালের ঘটনা। একটি অনুষ্ঠান বাড়িতে লাউড স্পিকারে গ্রামোফোন রেকর্ডের গান বাজছিল। শুনে থমকে দাঁড়ালাম। কারণ কণ্ঠটি বড়ো মধুর কিন্তু অচেনা। গানের প্রথম অংশটা মনে আছে ঃ

না বাজাইত বন্ধু তোমার / রাধা নামের বাঁশুরি
যাব না যমুনার ঘাটে / ভরিতে আর গাগরি।

বাংলা গানের স্বর্ণযুগের শিল্পীদের মধ্যে কয়েকজন পুরুষ কণ্ঠশিল্পীর নাম মনে করতে গিয়ে শ্যামল মিত্র, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সনৎ সিংহ, অখিলবন্ধু ঘোষ ও শচীন দেববর্মণের নাম মনে এল। কিন্তু এই শিল্পীদের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে মিল খোঁজার চেষ্টা করেও বুঝতে পারলাম যে ঠিক এঁরা কেউ নন। গানটি আমাকে মোহবিষ্ট করে তুলল। গানটি আবারও বাজায় কিনা সেই আশায় দাঁড়িয়ে রইলাম এবং অবশেষে আবারও গানটি বেজে উঠল। গানটি শেষ হওয়া মাত্র সব সংকোচ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে অনুষ্ঠান বাড়ির একজনকে রেকর্ডে উল্লিখিত শিল্পীর নাম জানাতে অনুরোধ করলাম। তিনি দেখে এসে জানালেন — নতুন একজন আর্টিস্ট, নাম অমর পাল। সঙ্গে সঙ্গেই আমার মনে পড়ল এ তো সেই 'প্রভাতী' গানের শিল্পী — যাঁর 'রাই জাগো, রাই জাগো' গানটি রেডিয়োতে ভোরবেলা শুনতে পাই।

পরদিনই রেকর্ডটি কিনে অগণিত বার শুনেছিলাম। গানের সুরকার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। রেকর্ডের গায়ে গানটিকে পল্লিগীতি বলে লেখা থাকলেও আমার কাছে গানটি পল্লি সুর (Folk music) মিশ্রিত আধুনিক গান বলে মনে হয়েছিল। ভারতের গর্ব শচীন দেববর্মণের আধুনিক বাংলা গানে গ্রাম্য সুরের যে আভাস পেতাম, শিল্পী অমর পালও শচীনকর্তার গায়কীর ধারায় প্রভাবিত। অমর পাল অনেকের কাছে সংগীত শিক্ষা করলেও তিনি শচীন দেববর্মণের গায়ন ভঙ্গির দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিলেন বলে স্বীকার করেছেন। গত শতাব্দীর চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে হিন্দুস্থান রেকর্ডে প্রকাশিত শচীন দেববর্মণের সব গানই শিল্পী অমর পাল গাইতে পছন্দ করতেন এবং শচীন দেববর্মণের সঙ্গে কোনো দিন সাক্ষাৎ করার সুযোগ না পেলেও মনে মনে তাঁকেই গুরুপদে বরণ করে নিয়েছিলেন। শচীন দেববর্মণের জন্মশতবর্ষে ত্রিপুরা সরকারের সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে যে স্মারক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে অমর পালের 'গুরুদক্ষিণা' শীর্ষক শ্রদ্ধার্ঘের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করা যেতে পারে—

"যে সুর সাধকের সঙ্গে কোন দিন আমার সাক্ষাৎ পরিচয়ের সুযোগ হয়নি, তাঁকেই আমি মন প্রাণ দিয়ে গুরুপদে বরণ করে নিয়েছি। .... জীবনের শেষ প্রান্তে এসে মনে হয় যে শচীন দেববর্মণ যদি সে যুগে পল্লীগীতি না গাইতেন, তাহলে আমিও বোধ হয় লোকসংগীত শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারতাম না।" অমরদার পাশাপাশি শচীনকর্তার গানের প্রতি আমারও গভীর অনুরাগ। নিজের অজান্তেই তাঁর গায়কীর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছি । সে কথা শুনে আমার লেখা দুটি ভাটিয়ালি গান তিনি রেকর্ড করেছিলেন। এজন্য অমরদার কাছে আমি অবশ্যই কৃতজ্ঞ। অমর পালের সংগীত শিক্ষার কথা বলতে গেলে গুরু হিসেবে প্রথমে যার নাম উল্লেখ করতে হয় তিনি হলেন তাঁর মাতা ঁদুর্গাসুন্দরী পাল। মায়ের কণ্ঠে মনসা মঙ্গলের পাঁচালি, গোষ্ঠলীলা, প্রভাতী, সারি গান শুনে শুনে কিশোর অমর লোকসংগীতের প্রতি আকৃষ্ট হন। কিশোর বয়সে অমরের গান শুনে সকলেই অবাক হত এবং শিল্পীর জন্মস্থান ব্রাহ্মণবাড়িয়ার (বর্তমানে বাংলাদেশ) গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে তাঁর কণ্ঠস্বরের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার শচীন ভট্টাচার্য নামে একজন কবিরাজ ছিলেন। তিনি পেশায় কবিরাজ হলেও নেশায় ছিলেন একজন সংগীতপ্রেমী গীতিকার। তিনিই অমর পালকে বাবা আলাউদ্দিন খাঁয়ের ছোটোভাই ওস্তাদ আয়াত আলী খাঁর কাছে শাস্ত্রীয় সংগীত শিক্ষার জন্য নিয়ে গেলেন। শাস্ত্রীয় সংগীতে কিছুটা দক্ষতা অর্জন করতে না পারলে কোনো ধরণের গানই ঠিকমতো গাওয়া যায় না। লোকসংগীত চর্চার ক্ষেত্রে গুরু আয়াত আলী খাঁর কাছ থেকে প্রাপ্ত তালিম তাঁর জীবনের পরম সঞ্চয়। কিছু বছর যেতে না যেতেই এই গুরুর কাছে সংগীত শিক্ষায় ছেদ পড়ল। কারণ অমরদার তখনকার অভিভাবক ও পথ প্রদর্শক কবিরাজ শচীন ভট্টাচার্য তাঁকে কলকাতায় নিয়ে গেলেন এবং লোক সংগীতের তৎকালীন খ্যাতনামা শিল্পী সুরেন চক্রবর্ত্তী ও তাঁর ভাই গিরিন চক্রবর্তীর কাছে

সংগীত শিক্ষালাভের ব্যবস্থা করলেন। অমন মধুক্ষরা কণ্ঠ সম্পদের দরুন ১৯৫১ সালে আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের অনুমোদিত শিল্পী হিসেবে সংগীত পরিবেশনের সুযোগ পেলেন। তার কিছুদিন পরেই 'সেনোলা' রেকর্ড কোম্পানি থেকে শিল্পীর প্রথম গ্রামোফোন রেকর্ড প্রকাশিত হল যার একটি গান ছিল 'কোন গেরামের কন্যা গো তুমি'। প্রতিভার গুণে অমরদা একে একে অনেক গুণীজনের সংস্পর্শে আসতে পেরেছিলেন। কবি শৈলেন রায়, রাইচাঁদ বড়াল, পঙ্কজকুমার মল্লিক, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র প্রমুখ খ্যাতনামা শিল্পীরা অমর পালের কণ্ঠসম্পদে মুগ্ধ হয়েছিলেন। ফলে নানা অনুষ্ঠান, রেকর্ড ও ছায়াছবিতে গান করার সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন।

অমর পালের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে তিনি লোকসংগীতের মৌলিকত্ব ও মর্যাদা রক্ষার ব্যাপারে সদা সচেতন ছিলেন। ব্যতিক্রমী শিল্পী বলেই সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জনের পথ ছেড়ে দিয়ে কথা ও সুরের প্রকৃত মিলন ঘটিয়ে সংগীত সৃষ্টিতে প্রয়াসী থেকেছেন। প্রভাতী, ভাটিয়ালি, জারি, সারি, ঝুমুর, ভাওয়াইয়া, চটকা, বাউল প্রভৃতি সবজাতীয় লোকসংগীতে তিনি অনন্য। তাছাড়া অর্ধশতাধিক ছায়াছবিতে তিনি নেপথ্য শিল্পী হিসেবে কণ্ঠ দিয়েছেন।

বরেণ্য চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের 'হীরক রাজার দেশে' ছবিতে 'আমি কতই রঙ্গ দেখি দুনিয়ায়' গানটি গাওয়ার জন্য তিনি একটু বেশি গর্ববোধ করেন। কিন্তু শ্রোতা হিসেবে আমার মনে হয় এই গানটি খুব সহজ সুরে বাঁধা। শিল্পীর সংগীত জীবনের গোড়ার দিকে দেবকী বসু, তপন সিংহ, অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় প্রমুখ পরিচালকের ছবিগুলিতে তিনি অনেক বেশি মর্মস্পর্শী গান গেয়েছেন। নিমন্ত্রণ, শিউলিবাড়ী, হাঁসুলী বাঁকের উপকথা প্রভৃতি ছবির গান আরো হৃদয়গ্রাহী। 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' ছবিতে সুধীন দাশগুপ্তর সুরে গাওয়া গানগুলো আমার বিবেচনায় সর্বশ্রেষ্ঠ।

অর্ধশতাব্দী কাল যাবৎ শিল্পী অমর পালের সঙ্গে আমার পরিচয়। ত্রিপুরার লোকসংগীত শিল্পী শ্রী অমিয় দাস (গায়িকা অরুন্ধতী হোম চৌধুরীর সংগীত গুরু) ও আমার আমন্ত্রণে ১৯৬৬ সালে অমর পাল প্রথম আগরতলায় সংগীত পরিবেশন করতে এসেছিলেন। আমাদের সেই পরিচয় ঘনিষ্ঠতম সম্পর্কে পরিণত হয়েছিল। ১৯৭৫ সালে আমি আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে অনুমোদিত গীতিকার হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করি। অথচ তার আগেই ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আমার রচিত একটি গান বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের সময় পূর্বপাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর আক্রমণে নিহত অসংখ্য মুক্তি যোদ্ধার রক্তে বাংলাদেশের নদীর জল রঞ্জিত হয়েছিল। এই প্রেক্ষাপটে বিয়াল্লিশ বৎসর পূর্বে গ্রামোফোন রেকর্ডে প্রকাশিত গানের প্রথম স্তবকটি উদ্ধৃত করছি ঃ

"বুড়ি গঙ্গা নদী রে / তোর
বুকে ডিঙা আমি ক্যামনে রে
ভাসাই / পানি যে তোর
রক্তে রাঙা / বৈঠা কান্দে
তাই।"

প্রাণস্পর্শী সুরে গাওয়া শিল্পীর এই গানটি তখন জনপ্রিয়তার জোয়ারে ভাসল। এই রেকর্ডটির বিপননের সাফল্যে উজ্জীবিত হয়ে হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানি তিন মাসের মধ্যে অমরদাকে দিয়ে দুটি এম.পি. রেকর্ডে আরো চারখানি গান প্রকাশ করল — যার মধ্যে 'ইয়াহিয়ার পাঁচালী' শীর্ষক আমার লেখা একটি ব্যঙ্গগীতিও অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রকৃতপক্ষেই ১৯৭১-৭২ সালে প্রকাশিত মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গানগুলি শিল্পী অমর পালের সংগীত জীবনের অগ্রগতির একটি উল্লেখযোগ্য পথ পরিবর্তন (Turning point) বলে আখ্যায়িত করা যেতে পারে।

অমরদার যা কণ্ঠমাধুর্য তাতে তিনি অনায়াসে আধুনিক বাংলাগানসহ অন্যান্য সব ধরণের গান গাইতে পারতেন। কিন্তু নদীমাতৃক বাংলার সন্তান বলেই তিনি গ্রাম্য লোকজীবনের কথা ও কাহিনিকেই তাঁর সংগীতের মূল বিষয় বলে মনে করতেন। 'ধলেশ্বরী নদী রে', 'মাঝি বাইয়া যাও

রে', 'ভাটি গাঙের মাঝি' প্রভৃতি ভাটিয়ালি গান যখন তিনি পরিবেশন করেন, তখন তিনি তাঁর শিল্পী সত্তা ভুলে গিয়ে নিজেকে নদীর বুকে বৈঠা বাওয়া একজন মাঝি বলেই মনে করেন। মাঝির জীবনের সাথে একাত্ম হয়ে যাওয়ার এই ভূমিকাই একজন লোকসংগীত শিল্পীর যথার্থ পরিচায়ক। সত্তর বছরের অধিককাল পর্যন্ত লোকসংগীত সাধনায় তিনি নিমগ্ন ছিলেন। এত দীর্ঘকাল যাবৎ এমন কঠিন সাধনায় মগ্ন থাকার জন্য একমাত্র তাঁকেই লোকসংগীতের প্রাণপুরুষ বলে আখ্যায়িত করা যেতে পারে!

বিভিন্ন রেকর্ড কোম্পানি থেকে শিল্পীর অনেক গান প্রকাশিত হলেও হিন্দুস্থান রেকর্ডস্-এর সংকলনে রয়েছে তার কালজয়ী গানের অ্যালবাম। 'প্রভাতী' গানের অনবদ্য সংকলন ছাড়াও গ্রামীণ লোকগীতির মধ্যে ধানকাটার গান, নবান্নের গান, রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলার গানসহ গ্রাম্য জীবনযাত্রা বিষয়ক নানা ধরনের গান তিনি গেয়েছেন, তবে তাঁর লালনগীতি ও ভাটিয়ালি গানের কোনো তুলনাই নেই। আমার রচিত কয়েকটি ভাটিয়ালি গানের মধ্যে 'ভাটি গাঙের মাঝি', 'তিতাস একটি নদীর নাম' ও অসমের বিহুগীতে প্রভাবান্বিত সুরে 'পানসা জলে পানসী ভাসে' গানগুলি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। ২০০৪ সালের ২৬ ডিসেম্বর 'সুনামি'র সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণহানি হয়েছিল। সুনামির ধ্বংসলীলা নিয়ে একটি প্রাচীন গানের কথা ও সুরের অনুকরণে আমি যে গানটি রচনা করেছিলাম সেটিই সম্ভবত অমরদার কণ্ঠে আমার রচিত শেষ গান। গানটি উদ্ধৃত করছি:

"সাগর ডুবাইলি রে, সাগর ভাসাইলি রে / অকুল দরিয়ায় বুঝি কুল নাই রে।/ কুল নাই সীমা নাই অথৈ দরিয়ায় পানি সমুদ্দুরে দেখাইল যে মৃত্যুর হাতছানি/অতল দরিয়ায় বুঝি কুল নাই রে।"

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার। যেসব বাউল গানের সুর অবলম্বনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনবদ্য সব গান রচনা করেছেন সে সব গানের একটি সংকলন 'রবীন্দ্রনাথের ভাঙাগান' নামক ক্যাসেটে 'ভারতীয় সংগীত পরিষদ' (BSP) থেকে ২০০৫ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। বাংলার লোকসংগীতকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এই গানগুলিসহ অমরদার সব গান সংরক্ষিত হওয়া উচিত। সুখের কথা. 'বাংলা সংগীত মেলা' উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকার অমরদার একশত কুড়িটি গানের স্বরলিপি গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। শিল্পী অমর পালের জীবন ও সংগীত নিয়ে একাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে শিল্পীর ছাত্র শ্রীসঞ্জয়কুমার মিত্র রচিত 'সুজন রসিক নাইয়া' নামক জীবনালেখাটি এককথায় অনবদ্য। এছাড়া ইতিমধ্যে দুটি তথ্যচিত্রও তৈরি হয়েছে। শিল্পী অমর পাল নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান। তাঁর অগণিত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রাণেশ সোমকে শিল্পীর যথার্থ উত্তরসূরি বলা যেতে পারে!

অমর পাল ভারত সরকারের সংগীত নাটক অ্যাকাডেমি পুরস্কার, লালন পুরস্কারসহ অসংখ্য পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। তাঁর ড্রয়িং রুমে আর স্মারক রাখার জায়গা নেই। ভারতের বাইরে নানা দেশে তিনি লোকসংগীত পরিবেশন করেছেন। হাজার সম্মান ও পুরস্কারের পাশাপাশি যে কথাটি উল্লেখ করতেই হয়, তা হল লক্ষ লক্ষ অনুরাগী শ্রোতার কাছ থেকে প্রাপ্ত সম্মান ও ভালোবাসাটাই শিল্পীর পরম প্রাপ্তি। ২০১২ সালে শিল্পীর একানব্বইতম জন্মদিনে আমি শ্রদ্ধা জানাতে তাঁর কুঁদঘাটের বাড়িতে উপস্থিত থাকতে পেরেছিলাম। অনাড়ম্বর অথচ আন্তরিক পরিবেশে শিল্পীর সেই জন্মদিন আমরা সবাই মিলে পালন করেছিলাম। সংগীত শিক্ষার্থী, সাংবাদিক ও অনেক গুণীজন সেদিন শ্রদ্ধার্ঘ্য নিয়ে হাজির হয়েছিলেন। অমরদার প্রবীণ ছাত্র প্রদীপকুমার বাড়ইয়ের অনুরোধে আমি শিল্পীর পাশে বসে ছবি তুলতে বাধ্য হয়েছিলাম।

অমরদার পূর্বসূরি বা তাঁর সমকালীন সংগীত শিল্পীরা তাঁর সাংগীতিক প্রতিভা সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। এই প্রসঙ্গে স্বনামধন্য সংগীতশিল্পী প্রয়াত ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের কাছ থেকে শোনা একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। গত শতাব্দীর সত্তরের দশকে গ্রামোফোন কোম্পানি থেকে আধুনিক গানের শিল্পীদের দিয়ে লোকসংগীতের একটি লং প্লেয়িং রেকর্ড প্রকাশ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। অধিকাংশই প্রখ্যাত লোকসংগীত শিল্পী নির্মলেন্দু চৌধুরীর সংগীত পরিচালনায় গান রেকর্ড করেছিলেন। ধনঞ্জয়দার কাছে জেনেছিলাম যে তিনি অমর পালের ট্রেনিং-এ গান রেকর্ড করার ইচ্ছা কোম্পানিকে জানিয়েছিলেন। অথচ অমরদা তখন হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানির শিল্পী। শেষ পর্যন্ত ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের মতো স্বনামধন্য শিল্পীর ইচ্ছে অনুযায়ী অমরদার শিক্ষণে, 'গুরু কই রইলা গো' এবং 'অচেনা এক পাখি আমার' গান দুটি রেকর্ড করা হয়েছিল। এই ঘটনা থেকে আমরা শিল্পী অমর পালের প্রতিভার যথার্থ মূল্যায়নের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পেয়েছি।

পুলিশ-কথন

কৃষ্ণেন্দু চক্রবর্তী

ফ্ল্যাশব্যাক

অনেক কাল আগের কথা। আশির দশকের শুরু। ক্লাশ সেভেন এর নিতান্ত বালক মফঃস্বল স্কুল থেকে অ্যাডমিশন টেস্ট দিয়ে রাজধানীর নামী স্কুলে চান্স পেয়েছে। প্রথম দিন। পুলিশ অফিসার বাবা সাথে করে নিয়ে গেলেন। স্কুলের বহর ও বাহার দেখেই তো পেটে আরশোলা। হেডমাস্টার মশাই কে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম সেরে উঠে দাঁড়াতেই কম্বুকণ্ঠে উচ্চারিত হল ... "বড় হয়ে কি হবে? " বালকটির ততোধিক বালকোচিত ও বিগলিত প্রানিপাত ... "এস পি হব।" ... (বিস্ফারিত জিওগ্রাফি) কেন? ... চোর কে ধরে পেটাব আর ভাল লোককে আইস্‌ক্রিম খাওয়াব।

সেই শুরু। সরলমতি ও তরলগতি আবালটি কি আর জানত চোর যদিও বা ধরা গেল, তাকে লাঠ্যাযোধি প্রয়োগ করা তো দুরস্থান, চিত্রগুপ্তের একগাদা ফর্ম আর মেমো ভরতেই দিন কাবার। আর আইস্‌ক্রিম খাওয়ানো? সুগার ফ্রি আর সুগারলেস এর যুগলবন্দি আল্লা-রবি কেও মাইক্রোসাইজ করে দিল এই ডায়াবেটিস ভুবনে।

রোল অন

নবীন মহকুমা পুলিশ অফিসারটি সদ্য জয়েন করেছে কমলপুরে। এস ডি পি ও অফিসে অনেক পুরনো ইনকামবেন্সি বোর্ড। কারা ছিলেন আগে। বেশির ভাগ অক্ষর ধূসরিত। তবুও কষ্টে সৃষ্টে বোর্ডের প্রথম নাম টা ধরা দিল। সাল ১৯৭১। প্রথম এস ডি পি ও কৃশানু রঞ্জন চক্রবর্তী। অফিসবিমূঢ়, খানিকটা বিহ্বল ও বটে। বাবার হাত চেপে ধরে হেডমাস্টার মশাইয়ের রুমে যাবার দিনটি একেবারে ফ্রেম টু ফ্রেম কাট এন্ড পেস্ট। ইনকামবেন্সি বোর্ডের ২৫ নম্বরে জায়গা হল নবাগতের। পিতা-পুত্র এক-পঁচিশ। ঐ কমলপুরেই একদিন আলাপ হল তরুন রোয়াজার সাথে। ইন ফ্যাক্ট, কমলপুর থেকে একটু দূরে আশাপূর্ণা রোয়াজা গ্রামে। পাহাড়ে তখনো অস্থিরতার কিছুটা রেশ রয়ে গেছে। তরুন নিয়ে গেল ওর বাড়ি। সাথে এস.ডি.এম সাহেবও আছেন। সেই প্রথম শুঁটকী মেশানো বাঁশকুড়ুল আস্বাদন। সঙ্গে ধানী লঙ্কার ত্র্যহস্পর্শ। টিয়ার -গ্ল্যান্ড যেন ফ্লাডগেট ওপেন করল। কোনোমতে বেড়িয়ে তরুণকে সাথে নিয়েই ঘুরতে গেলাম ভগীরথ রিয়াং পাড়া, থাম্প্রাই পাড়া। আদিবাসীদের টংঘর। জুম চাষ হচ্ছে। জুমের কুমড়ো সেদ্ধ আর ফুটি খেয়ে টংঘরেই নিশিযাপন। সারারাত ধরে তরুণ শোনাল ওর কঠিন শৈশব আর প্রবল একরোখামির দুরন্ত কেমিক্যাল রিয্যকশনের আখ্যান। পরদিন ফিরে এলাম। কিন্তু তরুণ রইল বরাবরের মত। সাথে বাঁশকুড়ুল ও।

সাতসকালে হাজির অনিলবাবু। ছোট শহরের বড় ঠিকেদার। পেছনে একটি কন্যা। জানা গেল এটি ওনার কনিষ্ঠা। কোন এক চ্যাংড়ার উৎপাতে অতিষ্ঠ। সব শুনে থানার বড়বাবুকে বললাম একটা বিহিত করতে। তো বড়বাবু বিকেলের দিকে একেবারে চ্যাংড়াবাবাজীবন কে নিয়ে হাজির। যা হয় আর কি। ধরতে বল্লে বেঁধে আনা। একটু ধমক-ধামক দিয়ে, আর কখনো অমুখো হবিনা বলে তো ছেড়ে দিলাম। পরদিন যাচ্ছি অন্য একটি থানা পরিদর্শনে। যাবার পথে ড্রাইভার বীরমোহন কে বললাম রামদুরলভপুর চা - বাগানটা ঘুরে যেতে। খুব ফেমাস চা বাগান। অনেক দিনের ইচ্ছে। চা বাগানের শ্যামলিমায় তখন বেশ খানিকটা মোহিত। পেটে রবি ঠাকুর সবে গুড়গুড় করছেন। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের মত আচমকা জেগে উঠলাম। ঘন সবুজ বেমক্কা আলোড়িত হল মনে হচ্ছে যে। দিন কাল সুবিধের নয়। দেখে নেওয়া ভাল। দুই পি জি কে সাথে নিয়ে এগুলাম। ও হরি। এ যে আমাদের অনিল বাবুর কনিষ্ঠা তনয়া। একেবারে বক্ষলগ্না হয়ে আছেন সেই চ্যাংড়ার। এদের দেখে আমারই 'ধরণী দ্বিধা হও' গোছের অস্বস্তি। তেনারা ততক্ষণে ছিটকে দুজন দু-পাশে। মধ্যিখানে আমি হাইফেন। মরাল পুলিশিং এর রাস্তায় না হেঁটে ইচ্ছে হল একটু আলাপ করি। জানলাম ছোকরা সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট। চাকরির চেষ্টা আর প্রেমের অপচেষ্টা এক সাথেই চালিয়ে যাচ্ছে। মেয়ের বাপ সবই জানেন। প্রবল আপত্তি। ভাগাতে পারছিলেন না, তাই আমার দ্বারস্থ হওয়া। এরপর আরো বছর খানেক কমলপুর ছিলাম।

অনিল বাবু আর পা মাড়ান নি।

টেক টু

রাজভবন। অরিজিনাল নাম পুষ্পবন্ত প্যালাস। এবার যেতে হবে ওখানে। মহামান্য গভর্নরের এ ডি সি হয়ে। নন-পুলিশিং জব। ঠিক ধারনাও নেই কি করতে হবে। তবু রাজধানীতে ফেরা যাবে। রাজভবন সবার্থেই ম্যাগনিফিস্যান্ট। প্রটোকলের ব্যস্ত-সমস্ত উপস্থিতি গেট পেরুলেই মালুম হয়। সবকিছু মাপা, ছকে বাঁধা। সেক্রেটারি টু গভর্নরের ব্যস্ত-সমস্ত উপস্থিতি গেট পেরুলেই মালুম হয়। সবকিছু মাপা, ছকে বাঁধা। সেক্রেটারি টু গর্ভনরের সাথে দেখা করলাম। উনি খানিকটা আশ্বাস দিলেন। সঙ্গে করে নিজেই নিয়ে গেলেন হিজ এক্সেলেন্সির অফিসে। মাঝখানে এ ডি সির অফিসে প্রথামাফিক ধড়াচুড়ো লাগিয়ে তৈরি হয়ে নিলাম। অভিবাদন জানিয়ে সবিনয়ে পরিচয় টুকু দিলাম। গভর্নর সাহেব চাকরি জীবনে পুলিশের শীর্ষতম পদে ছিলেন। সীমিত বাক্যালাপ। হবার মধ্যে শুধু এইটুকুই হল যে আমার পুরো নামখানা সেকেন্ড টাইম রিপিট করতে বললেন ও শুনে জানতে চাইলেন আমি দক্ষিণ ভারতীয় কিনা। যাক, দিন কয়েকের মধ্যে কাজকর্ম বুঝে নিলাম। ফাস্ট লেডি আবার সাবলীল বাংলা বলেন। ট্যুরে বেরিয়ে গেলাম পাটনা। এর পর দিল্লি, হায়দেরাবাদ, কলকাতা, মুম্বাই লেগেই থাকত। স্যার ও ম্যাডাম দুজনেরই বেশ বয়স হয়েছে। অন দ্য রং সাইড অফ সিক্সটিস। শরীরও প্রায়ই গড়বড় করত সাহেবের, তবে ম্যাডাম খুব সতর্ক থাকতেন স্যারকে নিয়ে। একটা অন্যরকম এক্সপোসার হল এখানে চাকরি করতে এসে। কত মান্যিগন্যি লোকের সংস্পর্শে আসা গেল।

এই সময়েই এসে গেল অ্যানুয়াল কনফারেন্সে যাবার সুযোগ। দিল্লিতে সারা দেশের সমস্ত গভর্নর সাহেবদের সাথে মহামহিম রাষ্ট্রপতির সাক্ষাত হবে। রাইসিনার তখতে তখন "দ্য মিসাইল ম্যান"। যাবার আগেই মাথায় ঢুকে গেল যে করেই হোক ডঃ কালামের সাথে কথা বলতেই হবে। এ সুযোগ বারবার আসেনা। দিল্লী যাবার আগেই স্যার নির্দেশ দিলেন সেক্রেটারিকে। উনি কনফারেন্সের বাইরেও আলাদা ভাবে দেখা করতে চান রাষ্ট্রপতির সাথে। সেই ভাবে দিল্লিতে রাজ্যের প্রটোকল অফিসার কেও জানিয়ে দেওয়া হল। অ্যাপয়েন্টমেন্ট এর ইস্যু নিয়ে আমিও যোগাযোগ করলাম প্রেসিডেন্টের এ ডি সির সাথে। একটু আলাপও করে রাখলাম। কথাবার্তায় বুঝে গেলাম যে কোনভাবেই মনের সাধটুকু পূরণ করার উপায় নেই। কি যে করি! দিল্লি তো গেলাম। কনফারেন্স ও দুদিনে শেষ। ওদিকে প্রটোকল অফিসার সুখময় দা সুখবর আনলেন যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফাইনালাজ হয়েছে। দু দিনের মধ্যে ডি-ডে এসে গেল। সন্ধ্যেবেলা যেতে হবে। এবার আমি মরিয়া। শেষ চেষ্টা। খোদ গভর্নর সাহেবকে বিনীত ভাবে আমার অভিপ্রায়টুকু জানলাম। স্মিত হাসলেন। ততদিনে খানিকটা স্নেহের চোখে দেখেন বলে বকুনি খেলাম না। যথাসময়ে আমাদের কারকেড রাইসিনার দিকে। একাধিক ফ্রিস্কিং জোন পেরিয়ে শেষমেশ পৌঁছুন তো গেল। ওখানকার এ ডি সি এসে গভর্নর সাহেবকে নির্দিষ্ট মিটিং রুমে নিয়ে চলেও গেল। শুধু আমার কোন গতি হলনা। আমি বসে রইলাম এডিসিদের ডেসিগনেটেড চেম্বারেই। কিছুটা মনখারাপ করেই। কফিটাও বিস্বাদ লাগছিল। এত কাছে এসেও ...!! মিনিট পনের। হঠাৎ দেখি একজন সিনিয়র অফিসার ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ওখানে এলেন। "Where is the ADC from Tripura?" আমি উঠে দাঁড়াতেই বললেন ... "Come ... Come along ... H.E. is waiting" আমার তো ততক্ষণে হৃদকমলে ভূমিকম্প। তাহলে কি ...? যে রুমে আমায় নিয়ে গেলেন সেখানে গিয়ে আমি পুরো হকচক। ডঃ কালাম আর আমাদের গভর্নর সাহেব বসে আছেন। স্মিত ও সস্নেহ হাসি দুজনের মুখেই। স্যালুট করে দাঁড়ালাম। বুক দুরদুর। গভর্নর তাঁকে কিছু বললেন। উনি হেসে আমাকে কাছে ডাকলেন। কি আন্তরিক সে ডাক! কাছে গেলাম অনেকটা সম্মোহিতের মত। এও কি বাস্তব! ডাঃ এ পি জে আব্দুল কালাম আমার সামনে দাঁড়িয়ে! হাত বাড়িয়ে দিলেন। হাতে হাত রেখেই বললেন ... Keep up the glory of your uniform, Always stay positive. Never give up. তিনটি লাইন। এখনো ঠিকঠাক মনে আছে। অবিস্মরণীয় স্মৃতি। অসাধারণ অভিজ্ঞতা। ফেরার পথে ভাবছিলাম এই পুলিশ সার্ভিস যে কত বর্ণময় মুহূর্ত উপহার দিতে পারে। নিজেকে সমৃদ্ধ বোধ করছিলাম।

টেক থ্রি

জেলার এডিশনাল এস পি। পরিস্থিতি অনেক স্বাভাবিক, সুস্থির। একসময় এই জেলাতেই প্রবেশনার হয়ে ফিল্ড ট্রেনিং নিতে হয়েছিল। উদয়পুর। সরোবর নগরী। আমার খুব পছন্দের জায়গা। চার্জ নেবার তিন মাসের মধ্যেই রেগুলার এস পি লম্বা ছুটি নিলেন। আমি অফিসিয়েটিং এস পি হিসেবে কাজ করব এমনটাই নির্দেশ এল। প্রথম সাতদিন ঠিকঠাক। সহৃদয় ডি আই জি সাহেব রোজই ফোন করে খবর নেন। উনিও টেনশনে থাকেন সব সামলে উঠতে পারছি কিনা। এর মধ্যেই একদিন রাত প্রায় এগারটা। মোবাইল জানান দিল। মোবাইলের ওপাশে সবচেয়ে দূরবর্তী থানার বড়বাবু। সংক্ষেপে যা বুঝলাম প্রত্যন্ত গ্রামের এক বাড়িতে খুন হয়েছে। তাও এক দুই নয়, এক্কেবারে ত্রিপল মার্ডার। ডি আই জি সাহেবকে কোনমতে জানিয়ে দুদ্দাড় গাড়িতে উঠলাম।

যখন পৌঁছলাম, রাত একটা। প্রচুর লোক জমায়েত অত রাত্তিরেও। লোক্যাল এস ডি পি ও আর থানার ও সি যা বললেন বোঝা গেল বাড়ির মধ্যবয়সী একমাত্র পুত্রটি মানসিক ভারসাম্যহীন। খুব সম্ভবত বৃদ্ধ বাবা, মা এবং নিজের স্ত্রীকে এই লোকটি খুন করেছে। লোকটিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা। ঘটনাস্থল দেখতে গেলাম। বাড়িটির চারদিকে প্রচুর ঝোপঝাড়। টর্চের আলোয় একটা বড় পুকুর ও দেখলাম। মাটির ঘর। তেমন সচ্ছল নয়। তিনজনেরই শরীরে শার্প কাটিং উন্ড। ডেডবডিগুলো মর্গে পাঠাতে হবে কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট না আসা অব্দি inquest করা যাচ্ছেনা। ভাবলাম, বাড়ির চারদিকটা ঘুরে দেখি। পুকুরের দু কোণে দুটো নারকেল গাছ। পুকুরটা আমাকে টানছিল। সবগুলো ঘর মোটামুটি দেখে নিয়ে পুকুরের দিকে এগুলাম। সাথে আমার দুই পি জি। এতক্ষন চোখে পড়েনি, দেখলাম ... লম্বা নারকেল গাছটার গা ঘেঁষে আরেকটি নারকেল গাছ প্রায় পুকুরের জলে নুয়ে পড়েছে। অন্ধকারে ঠাহর করা যায়নি। আরেকটু এগিয়ে গিয়ে গোঁঙানির শব্দে দাঁড়িয়ে পরলাম। ঐ নারকেল গাছের পেছন থেকে আসছে। টর্চ নিভিয়ে একটু অপেক্ষা। ভাবছি, মানসিক ভারসাম্যহীন লোকের তো কোন বিশ্বাস নেই। কখন কি করে বসে। তারপর এতবড় কাণ্ড ঘটিয়েছে, এখন তো পুরোই বিগড়ে আছে। সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতেই দেখি হঠাৎ কেউ একজন ছুট লাগাল। আর ছুটতে গিয়েই ধপ্পাস। টর্চের আলোয় আর আমাদের কুইক chase এ বেশি দূর যাওয়া হলনা। কিন্তু কাছে গিয়ে আমাদের অবাক হবার পালা। একটি ১১/১২ বছরের ছেলে থরথর করে কাঁপছে। এরপর আর আমাদের বিশেষ কিছু করণীয় ছিলনা। ছেলেটি পুরো ঘটনা নিজেই দেখেছে। উন্মত্ত বাবার তাণ্ডবে মা, ঠাকুমা, দাদু কে গড়াগড়ি খেতে দেখেছে। ভয়ে পালিয়ে দুই নারকেল গাছের মাঝখানে লুকিয়ে ছিল। তখন প্রায় ভোর। সব formalities শেষ করে ঐ টুকু ছেলেকে নিয়ে আসা হল থানায়। কোন কাস্টডিয়ান নেই। এক পিসি আছেন কিন্তু তার আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ। ছেলেটির দায়িত্ব নেবার সামর্থ্য নেই। কিন্তু হাহাকার করছিলেন ওর জন্যে। বলছিলেন পড়াশুনায় বরাবরের মনযোগী বালকটির দুর্ভাগ্যের নিয়তি। ক্লাস সেভেনের ছেলেটি তখন নিশ্চুপ, পাথর। কিছু খাইয়ে ওকে ঘুমোতে বললাম। ও নিরুত্তর। শুধু নাম বল্ল ... সুমন (নাম পরিবর্তিত)। ততক্ষনে ডি আই জি সাহেবও এসে পৌঁছে গেছেন। দুপুরের দিকে সুমন কে আবার নিয়ে যেতে হবে বাড়িতে। পোস্টমর্টেম হয়ে গেছে। দাহকাজ করার কেউ নেই। পুলিশকেই দায়িত্ব নিতে হবে। এ বড় কষ্টের দৃশ্য। পরপর শোয়ানো তিনটি বডি। ছোট্ট ছেলেটিকে করতে হবে মুখাগ্নি। সরে এলাম। টের পাচ্ছিলাম বুকে বাষ্প জমছে। আপাতকঠোর এই পেশার কাঠিন্য তখন খসে পড়ার উপক্রম। বিকেলের মধ্যেই আসামি ধরা পরল, অস্ত্র উদ্ধারও হল। সমস্যা দেখা দিল সুমন কে নিয়ে। ও কোথায় যাবে? সর্বার্থেই দায়িত্ব নেবার কেউ নেই। আমার জন্যে সবচেয়ে অস্বস্তির যেটা, এ আমাকে ছেড়ে কোথায়ও যেতে রাজি নয়। মহা মুস্কিল।

শেষ অব্দি ডি এম সাহেব মুস্কিল আসান করলেন। তাঁর দ্বারস্থ হয়ে সব খুলে বললাম। ঘটনার কথা আগেই জেনেছিলেন। ওনার আদেশে সুমন আশ্রয় পেল জেলা সদরের একটি অনাথালয়ে। তবে অনেকদিন ধরে ওর চিকিৎসা চলল জেলা হসপিটালে। স্বাভাবিক ভাবেই খুব ট্রমাতে ছিল। কাউন্সেলিং ও করতে হচ্ছিল। প্রায় ৮/৯ মাস বাদে সুমন তখন অনেকটা বেটার। যেভাবে মাঝে-মধ্যে যেতাম, সেভাবেই একদিন বিকেলে ওকে দেখতে গেলাম।

Orphanage এর ইন-চার্জ জানালেন সুমন এখন অনেক সুস্থ। পড়াশুনো করতে চায়। জেনারেল ইন্টেলেক্ট অন্যান্য ইনমেটদের থেকে অনেক ভাল। ভাল লাগল খুব। নিয়ে গেলাম ওখানকার একটি বেশ নামী স্কুলে। ওকে ভর্তি করতে বিশেষ অসুবিধে হয়নি। ক্লাস সেভেনেই নিল। নিশ্চিন্ত বোধ হল। কাছাকাছি সময়েই আমার বদলির আদেশ। ততদিনে সুমন বেশ মানিয়ে নিয়েছে। মিশে গেছে সবার সাথে। দু-একবার ওর পিসি এসে দেখা করে গেছেন। ভারমুক্ত মনেই উদয়পুর ছাড়লাম।

জাম্প-কাট

স্টেট পুলিশ ট্রেনিং একাদেমি। এবার একাদেমির প্রিন্সিপালের দায়িত্ব। মাঝখানে কেটে গেছে বেশ ক'বছর। এস পি হওয়ার লক্ষ্য পূর্ণ ততদিনে। কিন্তু বাবা বা হেডমাস্টার মশাই এর মধ্যেই ফ্রেমবন্দি। যদিও ট্রেনিং এ আগে কখনো কাজ করিনি তবুও অন্যধরনের এক্সপরিয়েন্স হবে ভেবে ভালই লাগছিল। খানিকটা তাড়াহুড়োতেই জয়েন করতে হল। মাত্র কিছুদিন আগেই একাদেমিতে উত্তরণ হয়েছে দীর্ঘদিনের পুলিশ ট্রেনিং কলেজের। এখন থেকে সরাসরি নিযুক্তপ্রাপ্ত সাব-ইন্সপেক্টর বা ডি এস পি দের এখানে বেসিক ট্রেনিং শুরু হবার প্রবল সম্ভাবনা। ঐ সময়েই আমার একাদেমিতে পদার্পণ। কাজে যোগ দেবার তিনদিনের মাথায় প্রায় ছ'শ কনেস্টবলের বেসিক ট্রেনিং শুরু আর ঠিক দু-হপ্তার মধ্যে প্রথম ব্যাচের সাব-ইন্সপেক্টাররা বেসিক ট্রেনিং এ আসবে। চারদিকে হৈ হৈ ! অফার অফ আপয়েন্টমেন্ট নিয়ে হাজির সিলেক্টেড কনেস্টবলেরা। একেবারে ঝকঝকে, তরতাজা ছেলেগুলো। ১৮ থেকে ২১ বা ২২। এই হচ্ছে মোটামুটি রেঞ্জ। এদের দেখলেও ভাল লাগে। প্রানবন্ত। যেন টগবগিয়ে ফুটছে। পুলিশের মূল কাঠামো এরা। একাদেমির টিম অফ অফিসারস্ এদের সব কাগজ পত্তর ভেরিফাই করে নিচ্ছেন। গার্ডিয়ানরাও আছেন একটু দূরে। কেউ বাড়ি থেকে টিফিন-বাক্সে ছেলের জন্যে পরম মমতায় খাবার নিয়ে এসেছেন। মা আদর করে খাইয়ে দিচ্ছেন। কেউবা ট্রেনিং শুরু হবার আগের চেহারায় বাবা-মার সাথে লাস্ট সেলফিখানা তুলে নিচ্ছে। ট্রেনিং শুরু হলেই তো সাধের চুলগুলো বাটিছাঁটে ঘ্যাচাং। জমজমাট ব্যাপার-স্যাপার। লং শটে দেখি একখানা কাঁদোকাঁদো ফেস। এগুলাম। সুদূর রইস্যাবারি থেকে এসেছে। কোনদিন বাড়ির বাইরে থাকেনি। চারদিক দেখেশুনে ব্যাক টু প্যাভিলিয়ন মোডে আছে। একটি থালায় ভাত আর মাগুর মাছের ঝোল। রইস্যাবারিতে সুলভে মাগুর মাছ পাওয়া যায় জানতাম। মা ভাই রেঁধে এনেছেন পুত্রকে মাগুরের সাথে আদর মিশিয়ে খাওয়াবেন বলে। বকে বুঝিয়ে শুনিয়ে, দু একটি বন্ধু যোগাড় করে দিয়ে অন্তত ইমেডিয়েট রিট্রিট ঠেকান দেওয়া গেল।

যথারীতি প্রটোকল মেনে ট্রেনিং এর উদ্বোধন হল। আই জি পি (ট্রেনিং) আর অন্য সিনিয়র অফিসাররা উপস্থিত রইলেন। ছেলেদের পুলিশ ডিপার্টমেন্টে স্বাগত জানিয়ে অনুপ্রাণিত করলেন। সামান্য মিষ্টিমুখ হল। বড়কর্তারা বেরিয়ে যাবার পর আমি আবার সবাইকে নিয়ে বসলাম। একাদেমির নিয়মকানুন, প্রাত্যহিক রুটিন এগুলো নিয়ে সহকর্মীরা আলোচনা করছিলেন। আমি দেখছিলাম ওদের। ওরে সবুজ, ওরে আমার কাঁচা। পুলিশের চলার পথ পাপড়ি ছড়ানো হবেনা কিন্তু যে মানিয়ে নেবে সে টিকে যাবে। এই সবই ভাবছিলাম। এক সময় হল ছেড়ে বাইরের লনে এলাম। হলের ভেতরে তখনো আদেশ-উপদেশ চলছে। আচমকা নীরবতায় ব্যাঘাত। পেছন থেকে কেউ বলল ...

- জয়হিন্দ স্যার।
- জয়হিন্দ। কে?
- স্যার, আমি সুমন।
- সুমন? কে ভাই?

পেছনে ফিরে তাকালাম। "স্যার, আমি অনাথ আশ্রমের সুমন"। সুমন! কোন সুমন! ঘাড় ঘোরালাম। বিস্ফারিত আমি। পুরো হতবাক। সেই সুমন। অনেক বড় হয়ে গেছে। রীতিমত যুবক। অপলক তাকিয়ে আমার দিকে। সম্বিৎ ফিরল। তাই তো, সেদিনের ভাগ্যহীন বালকটি, অনাথালয়ে বেড়ে ওঠা উদাস চোখের ছেলেটিই তো সামনে দাঁড়িয়ে। রিক্রুট কনেস্টবলের চেস্ট নম্বর লাগানো। নিয়তির কি অদ্ভুত খেল। আমার মুখে রা কাড়ছেনা। নিচু হয়ে প্রনাম করতে এল। জড়িয়ে ধরলাম। সুমন কাঁদছিল।

সম্মিলিত সাংস্কৃতিক চর্চা ঃ সামান্য ভাবনা

লক্ষ্মণ কুমার ঘটক

‘কেউ বলে না, কেউ বলে না, কে কতটা প্রিয়, সবাই ভাবে গাছের মতো সবাই সবার প্রিয়”।

সময় এমন একটি অনুভূতি, যার স্বাভাবিক প্রকাশই হলো পরিবর্তন। একসময়, গত আট ও নয়ের দশকে, ত্রিপুরার প্রায় প্রতিটি অঞ্চলে পাড়াভিত্তিক যে সাংস্কৃতিক উন্মাদনা বিরাজ করত, তার উত্তাপ আজ অনেকটাই ম্লান হয়ে এসেছে। বর্তমানে সাংস্কৃতিক চর্চা মূলত শহরকেন্দ্রিক, যেখানে প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ-সুবিধা তুলনামূলকভাবে বেশি। নাটক, যাত্রা, সঙ্গীত ও নৃত্যের মতো অনুষ্ঠানগুলোর আয়োজন এখন মূলত শহরের প্রেক্ষাগৃহেই সীমাবদ্ধ। শহরতলী ও গ্রামাঞ্চলে এই চর্চা নানা কারণে হ্রাস পেয়েছে, যার অন্যতম প্রধান কারণ হলো যথাযথ উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতার অভাব।

পাড়ায় পাড়ায় যেসব সামাজিক সংগঠন বা ক্লাব রয়েছে, তারা অর্কেস্ট্রা কিংবা কীর্তনের মতো অনুষ্ঠানে যতটা উৎসাহী, ঠিক ততটাই নিরুৎসাহী নাটক, যাত্রা, সঙ্গীত বা নৃত্যের ধারাবাহিক চর্চা ও পরিবেশনায়। বর্তমানে শহরতলী ও গ্রামাঞ্চলে যে সামান্য সংখ্যক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়, তার বেশিরভাগই স্থানীয় কোনো সৃজনশীল প্রয়াস নয় ; বরং বাইরের পেশাদার দলকে চুক্তির ভিত্তিতে এনে আযোজিত হয়ে থাকে। ফলে পাড়াভিত্তিক যূথবদ্ধ সাংস্কৃতিক চর্চা আজ প্রায় স্তিমিত হয়ে পড়েছে।

অবশ্য কেউ কেউ এখনও গান শেখেন, আঁকা বা নৃত্যের চর্চা করেন, তবে তা প্রায়শই ব্যক্তিগত উদ্যোগে সীমাবদ্ধ। যদি প্রতিটি পাড়ায় বছরে অন্তত একবার করে পাড়ার অপেশাদার শিল্পীদের দিয়েই নাটক বা যাত্রার আয়োজন হতো, আর তার আগে এক দেড় মাস ধরে মহড়া চলত, তাহলে পারস্পরিক মেলামেশা, মত ও অনুভবের আদান-প্রদান বাড়তো এবং সমাজ হয়ে উঠত আরও মানবিক, আন্তরিক।

এই উদ্যোগ নেবেন কে? এটাই আজকের মূল সংকট। সম্মিলিত সাংস্কৃতিক চর্চার যে কী বিপুল উপকারিতা রয়েছে, তা শুধু কেবল কথা বলে সম্ভব নয়, অনুভব করেই বোঝা যায়।

এ প্রসঙ্গে আবার ফিরে যাই আট-নয়ের দশকে। তখন, শারদীয়া দুর্গাপূজার পর, শীতের শুরুতে আগরতলার দক্ষিনে ড্রপগেট থেকে শুরু করে সিদ্ধিআশ্রম, ডুকলি, মাতৃপল্লী, হাঁপানিয়া, আমতলী প্রভৃতি এলাকায় অপেশাদার শিল্পীদের দিয়ে যাত্রা হতো। শুধু তাই নয়, স্বাধীনতা দিবস, রবীন্দ্র জয়ন্তীতে পাড়ার ছোট-বড় একসঙ্গে নাটক করতেন। এতে যে কী আনন্দ, কী উৎসাহ ছিল, তা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। নির্ধারিত দিনে যাত্রা বা নাটক দেখা নয়, এর আগে প্রতিদিনের মহড়া দেখাও ছিল আলাদা আকর্ষণ।

সিদ্ধিআশ্রম এলাকার কয়েকটি যাত্রা ও নাটকের নাম এখনো মনে পড়ে — ‘কালাপাহাড়’, ‘কার দোষ’, ‘অপরাধী কে’, ‘অচল পয়সা’, ‘সূর্য আছে আলো নেই’। এগুলো শুধুই নাটক ছিল না, বরং ছিল পাড়ার সবার একত্রিত হওয়ার উপলক্ষ। জীবনে কখনও মঞ্চে ওঠেননি এমন মানুষও উৎসাহ নিয়ে এসব চর্চায় অংশ নিতেন। সম্মিলিত সাংস্কৃতিকচর্চা ও পারস্পরিক সংহতির পরম্পরা কী আধুনিকতার ছোঁয়ায় আজ হারিয়ে গেছে? মানুষের ব্যস্ততা, সোসাল মিডিয়ার অতিরিক্ত ব্যবহার-এর অন্যতম কারণ হতে পারে?

তবুও বিশ্বাস করি যদি যথাযথ উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়া যায়, তাহলে আবার ফিরে আসতে পারে সেই হারিয়ে যাওয়া চর্চা! বর্ষার গাছের মতো তরতর করে বাড়তে পারে। একটি দুঃখজনক বাস্তবতা হলো বিভিন্ন শহরতলী বা গ্রামাঞ্চলের সেইসব নীরব, অপেশাদার সাংস্কৃতিক কর্মী বা সংগঠকদের নাম প্রায়শই বিবেচনায় আসে না। তাদের অবদান, প্রচেষ্টা কিংবা দীর্ঘদিনের নিঃস্বার্থ ভূমিকা অনুল্লেখিতই থেকে যায়। এ-ও এক ধরণের হতাশা, যা সাংস্কৃতিক বিমুখতার একটি নিঃশব্দ কারণ।

চৈতালি ভাঙ্গার দিন ও দিঘির মিছিল

অপন দাস

'চৈতালি ভাঙ্গার দিন', এই শব্দকয়টি শুনেছিলাম শ্রদ্ধেয় সুশীল দে মশাইয়ের মুখ থেকে। আজ চৈতালি ভাঙ্গার দিনের কথা বলা যাক। কিন্তু এর আগে উদয়পুর শহরের ইতিহাসের পিছনে গিয়ে প্রেক্ষাপটটি আর একটু বড় করে নেওয়া যেতে পারে। বর্তমান উদয়পুর শহর বলতে যা বোঝায় তা একদিন জলমগ্ন ছিল। কিছু টিলাভূমিকে পাশে নিয়ে শুকসাগর জলা, জামজুরি, হুরিজলা, কাকড়াবন নিয়ে তার ছিল বিস্তার। সমুদ্র প্রলম্বিত ছিল ত্রিপুরার পাহাড় পর্যন্ত। দেবতামুড়া পাহাড়ে এখনো দেখা যায় জাহাজ নোঙর করার দন্ড। স্থানীয় লোক একে দেবতা জ্ঞানে পূজা করে। দেবতামুড়া পাহাড়ের আরো পূর্বদিকে কালাঝাড়ি পাহাড় থেকে নেমে এসেছে গোমতী। উদয়পুর এসে গোমতী জলাভূমির খোঁজ পেয়ে যায়। এত বিস্তৃত জলাভূমির দেখা পেয়ে গোমতী শুয়ে পড়েছে যেন জলের বিছানায়। সে একসময় কল্পনা করা যায়, যখন কোনটা জলাভূমি, কোনটা নদী, কিছুই বোঝার উপায় নেই। এইভাবে যেতে যেতে গোমতী তার যাত্রাপথ পরিবর্তন করেছে বারবার। সারা উদয়পুর জুড়ে দিঘির রূপে গোমতীর এই পরিত্যক্ত পথকেই আমরা প্রত্যক্ষ করি। ত্রিপুরার রাজারা নদীর এই পটভূমিকা সম্পর্কে ছিলেন সম্পূর্ণ সচেতন। রাজাদের হাতের ছোঁয়ায় গোমতী নদীর কিছু কিছু পরিত্যক্ত পথ একদিন পরিণত হল দিঘিতে। শহরে দাঁড়িয়ে দু'চোখ খুললেই আমরা দেখতে পাই মহাদেব দিঘি, অমরসাগর, জগন্নাথ দিঘি, ধনীসাগরসহ আরো কত নাম জানা, না জানা দিঘি। এর কোনোটি আছে ব্যক্তিগত দখলে, কোনটি প্রহর গুনছে মৃত্যুর। কান পাতলে শোনা যায় ইতিহাসের কণ্ঠস্বর। পুরনো মানুষজন কোথায়? তাদের ছায়াও নেই কোথাও! লোকমুখে ভেসে আসে কিছু গল্প, কিছু ইতিহাস, রাজা-রানীদের কাহিনী। রাজকুমারীদের স্মৃতি বুকে নিয়ে মহাদেব দিঘির উত্তর-পূর্ব কোনায় এখনো আছে একটি দিঘি, কুমারী জলা। রাজকন্যারা এখানেই নাকি জলক্রীড়ায় মেতে উঠতেন। উদয়পুরের বাতাসে সেই সব ইতিহাসের স্পর্শ। শীতকালে দূর পরবাস থেকে চলে আসে বালিহাঁস। দিঘির বুকে ঘুরে ঘুরে এরাও বোধহয় খোঁজে ইতিহাস। কুমরীজলার সঙ্গেই মহাদেব দিঘি, তারও দক্ষিনে ধনীসাগর, এর দক্ষিনে ফুলটঙ্গী। পরপর আরও চলে গেছে দিঘির মিছিল। শূরদের দিঘি, দারুকাদিঘি, আরো একটি দিঘি পেরিয়ে সিপাহীমরা দিঘি। শোনাযায় এই দিঘিতে রাজার এক সিপাহী ডুব দিয়ে আর জীবন্ত ফিরে আসে নি। দিঘির

জগন্নাথ (পুরাণ) দীঘি

জলে ভেসে উঠেছিল তার মৃতদেহ। তাই এই দিঘির নাম সিপাহীমরা দিঘি। তার দক্ষিণে আরো একটি দিঘি পেরিয়ে বুড়া দিঘি। তারও দক্ষিণে ম্যাচ ফ্যাক্টরির পাশে এক দিঘি। তার দক্ষিনে কল্যানসাগর (মাতারবাড়ি দিঘি)। তার দক্ষিণে রায়েদের দিঘি। সর্বদক্ষিনে চন্দ্রসাগর। টাউন সোনামুড়ায় পুরোহিত পুকুর।

এইভাবে একপ্রস্থ দিঘির মিছিল শেষে উদয়পুর শহরের কেন্দ্রে এসে দেখা যায় অমরসাগর। লম্বায় সর্ববৃহৎ এই দিঘি একাই একশো। উত্তরে গোমতীর প্রবহমান ধারা, দক্ষিণে সুখসাগর জলা। অমরসাগরের পশ্চিমে রয়েছে উদয়পুরের সবচেয়ে সুন্দর দিঘি জগন্নাথ দিঘি। এ যেন সুন্দরী প্রকৃতি তার শরীর বিছিয়ে শুয়ে আছে মাঠির বুকে। তার বিস্তারও উত্তরে গোমতী পাড় থেকে দক্ষিণে শুকসাগরজলা পর্যন্ত। এই দুইয়ের মাঝে রয়েছে থানা পুকুর। এর পরের সারিতে পশ্চিম দিকে রয়েছে আরো এক সারি দিঘি। বর্তমানে যেখানে স্পোর্টস কমপ্লেক্স, সেটি ও গোমতী নদীর পরিত্যক্ত পথ অথবা বিশাল জলাশয় ছাড়া আর কিছুই নয়। লোকমুখে যা 'দাম' পরিচিত ছিল। এর দক্ষিণে রয়েছে চন্তাই দিঘি। এর দক্ষিণে দেবরায় বাড়ির পিছনের দিঘি। তার দক্ষিণে জগন্নাথ মন্দিরের পশ্চিমে রয়েছে আরো একটি দিঘি, ছেচরা দিঘি নামে যা পরিচিত। এরপর দক্ষিণ দিকে আরম্ভ হয়েছে মরানদী। এই মরা নদী রাজারবাগ থেকে খিলপাড়া পর্যন্ত বিস্তৃত। খিলপাড়ায় রয়েছে একসাথে দুটি দিঘি (জোড় দিঘি), রামসাগর ও লক্ষ্মন সাগর। তার পশ্চিমে নানুয়ার দিঘি। আরো একটি দিঘি আমরা খিলপাড়ায় দেখি। যার মাঝখান দিয়ে রেললাইন চলে গেছে। সেটি হল রাজধর নগরের দিঘি। গোমতী নদীর পশ্চিমে গকুলপুর বাজারের কাছে আছে আরো একটি দিঘি।

মহাদেব দীঘি (বিজয় সাগর)

এভাবে দিঘির পাশে, দিঘির উপরে গড়ে উঠেছে জলাশয়ের শহর উদয়পুর। মানুষের লোভ দিঘিগুলিকে নিঃস্ব রিক্ত করে দিচ্ছে। একটু খালি জলাশয় দেখলেই যেন মানুষ তার বুকে মাটি ঢেলে বাজারে বিক্রি করতে চায়। আমরা কল্পনা করতে পারি একসময় উদয়পুরে ছিল প্রায় অর্ধশতাধিক দিঘি, যা ছড়িয়ে ছিল শহরের তিনদিকে। মাঝখানে বিশাল সুখসাগর জলা। মাতাবাড়ির টিলার পা ছুঁয়ে সুখসাগর জলার বিস্তার ছিল গোমতী নদী পর্যন্ত। বাহান্নটি ছড়ার জল পাহাড় থেকে এসে যেখানে মিশেছে। সুখসাগর জলায় একদিন ছিল চৈতালিভাঙার দিন। জলার মাঝখানে বৃহৎ এক বটগাছের নিচে গভীর জলাশয়। তার জল কোনোদিনই যেন শুকোত না। চৈত্রমাসের কোনো একদিন ঢোল পিটিয়ে দেওয়া হত সুখসাগর জলার পূর্বে ফুলকুমারী, দক্ষিণে চন্দ্রপুর, পশ্চিমে খিলপাড়া সহ সংলগ্ন গ্রামগুলিতে। সবই মিলে ছুটত সুখসাগর জলার মাঝখানে সেই জলাশয়ের দিকে। সেদিন আধ কিলোমিটার জুড়ে শুধু মানুষ। কেউ জাল, কেউ পলো বা অন্য কোন মাছ ধরার সামগ্রী নিয়ে শুধু মাছ ধরে চলেছে। সে এক বিশাল কান্ড। সেদিন সুখসাগর জলার পাশের গ্রামগুলিতে 'চৈতালি ভাঙার উৎসব', আর শুধু মাছের গন্ধ।

আজ চৈতালি ভাঙার দিন শেষ। পরিবর্তিত পৃথিবীর সঙ্গে তাল মিলিয়ে উদয়পুরে শুরু হয়েছে নতুন যুগ। সুখসাগর জলার মাঝখান দিয়ে চলে গেছে রেললাইন। পুরানো চলে গেছে স্মৃতির অতলে। তবুও প্রাচীন ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে উদয়পুরের কিছু দিঘি মানুষের লোভের থাবা এড়িয়ে আজও অস্তিত্ব রক্ষার আপ্রাণ চেষ্টা করছে!

সকৃতজ্ঞ তথ্য ঋণ : সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, সুলেখক সুশীল কুমার দে।

উদয়পুরে রবীন্দ্র জয়ন্তীর একাল-সেকাল

স্বপন ভট্টাচার্য

'সিটি অব রবীন্দ্রনাথ' নামে খ্যাত উদয়পুরে কবে থেকে রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী পালন অথবা রবীন্দ্রচর্চা শুরু হয়েছিল, সেই সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য আমাদের কাছে নেই। যদিও আগরতলা তথা ত্রিপুরায় রবীন্দ্রচর্চার সূত্রপাত ঘটেছিল ১২৮৯ বঙ্গাব্দে মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের হাত ধরে 'ভগ্নহৃদয়' কাব্যগ্রন্থ পাঠের মধ্য দিয়ে। শতাব্দীকাল আগে আগরতলায় রবীন্দ্র সঙ্গীতের চর্চা হতো ব্যক্তিগত উদ্যোগে। রবীন্দ্র সঙ্গীত যখন 'রবিবাবুর গান' নামে পরিচিত, তখন থেকেই আগরতলায় রবীন্দ্র সঙ্গীতচর্চা শুরু হয়। ত্রিপুরায় সরকারিভাবে রাজআমলে প্রথম রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী পালিত হয় ১৩৫০ ত্রিপুরাব্দে অর্থাৎ ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে। আমার ধারণা ভারতীয় উপমহাদেশের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যেই প্রথম সরকারিভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন পালিত হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসিত ভারতের আর কোথাও সরকারিভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন পালিত হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসিত ভারতের আর কোথাও সরকারিভাবে রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী পালন করেছেন, এমন তথ্য খুঁজে পাইনি। এই সম্পর্কে কেউ কোন তথ্য দিলে তা ইতিহাসের এক মহার্ঘ সম্পদ বলে বিবেচিত হবে। ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে কবির আশিতম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে ত্রিপুরার সরকারি গেজেটে প্রকাশিত একটি বিজ্ঞপ্তির উল্লেখ করছি — "ত্রিপুরা রাজ্যে রবীন্দ্রনাথের অশীতিতম জন্মবার্ষিকীর জয়ন্তীর উৎসব পালন সম্বন্ধে — শ্রীবীরবিক্রমমাণিক্য আদেশ

দরবার বিষম-সমর-বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত ত্রিপুরাধিপতি ক্যাপ্টেন হিজ-হাইনেস মহারাজ মাণিক্য স্যার বীরবিক্রমকিশোর দেববর্মা বাহাদুরকে সি এস আই এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা রাজধানী আগরতলা,ইতি। সন ১৩৫০ ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ২২শে চৈত্র।

যেহেতু বাঙ্গালোর তথা সমগ্র ভারতবর্ষের গৌরব বিশ্ববরেণ্য জনপ্রিয় কবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের আগামী অশীতিতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এ রাজ্যে জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হওয়া এ পক্ষের অভিপ্রেত, অতএব আদেশ হইল যে — উক্ত জয়ন্তী উৎসব সুষ্ঠ রূপে সম্পাদনার্থ পাশ্বলিখিত ব্যক্তিগণ দ্বারা একটি কমিটি গঠন করা যায়, ইতি।

১) মহামানাবর মহারাজ কুমার শ্রীলশ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোরদেববর্মা বাহাদুর। ২) উজির ঠাকুর শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ দেববর্মা। ৩) শ্রীযুত সত্যরঞ্জন বসু, বিএ। ৪) শ্রীযুত দেবেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, এমএবিএল। ৫) শ্রীযুত ভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী, এমএ।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, কবির আশিতম জন্ম দিবস উপলক্ষে ১৩৪৮ বঙ্গব্দের ২৫শে বৈশাখ রাজধানীতে মহারাজার বিশেষ রাজদরবার বসেছিল। রাজদরবারে কবিকে 'ভারত ভাস্কর' উপাধি প্রদান করার কথা ঘোষণা করা হয়। ঐ বছর অর্থাৎ ১৩৪৮ বঙ্গব্দের ৩০শে বৈশাখ মহারাজার বিশেষ দূত হিসাবে ভূপেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী অনুষ্ঠানিকভাবে 'উত্তরায়ণ'-এ কবিকে এই সম্মান প্রদান করেন। কবি তখন অসুস্থ। এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে, তা হলো মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্য পত্নী বিয়োগের শোকের সময়ে সান্ত্বনা লাভ করেছিলেন। সেই সূত্রেই কবির কাছে রাজদূত প্রেরণ করেছিলেন বীরচন্দ্র মাণিক্য।

১৩৪৮ বঙ্গব্দের ৩০শে বৈশাখ 'উত্তরায়ণ'-এ মহারাজা বীরবিক্রম মাণিক্যের বিশেষ দূত ভূপেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী যখন কবিকে 'ভারত ভাস্কর' উপাধির রাজকীয় মানপত্র প্রদান করেন, তখন আবেগাপ্লুত কবি ত্রিপুরার সঙ্গে তাঁর সুদীর্ঘকালের সম্পর্কের উল্লেখ করে বলেন, "যে অপরিণত বয়স্ক কবির খ্যাতির পথ সম্পূর্ণ সংশয় সঙ্কুল ছিল তাঁর সঙ্গে কোন রাজত্ব গৌরবের অধিকারীর এমন অবারিত ও অহৈতুক সখ্য-সম্বন্ধের বিবরণ সাহিত্যের ইতিহাসে অভূতপূর্ব। সেই রাজবংশের সেই সম্মানমূর্ত্ত পদবীদ্বারা আমার স্বল্প বিশিষ্ট আয়ুর দিগন্তকে আজ দীপ্যমান করেছে।" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে প্রথম সম্মান জানিয়েছিলেন ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য। ঘটনা চক্রে শেষ

সম্মানও লাভ করেন ত্রিপুরার মহারাজা বীরবিক্রমমাণিক্য প্রদত্ত 'ভারত ভাস্কর' উপাধি গ্রহণ করে। ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ২২শে শ্রাবণ কবি প্রয়াত হন।

এবার মূল প্রসঙ্গে আসা যাক। কবির আশিতম জন্মজয়ন্তী উদয়পুরেও পালিত হয়েছিল। কিরীটবিক্রম ইন্সটিটিউশনের ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রয়াত শচীনমোহন চক্রবর্তীর (পরে তিনি এই বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক পদে উন্নীত হন) পরিচালনায় টাউন হলে রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী পালিত করেছিল। সেই অনুষ্ঠানের তথ্য ও বর্ণনা পেয়েছি আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর পৃথ্বীশ চন্দ্র ভট্টাচার্যের লেখা থেকে। রাজণ্য যুগে কিরীট বিক্রম ইন্সটিটিউশান ও বালিকা বিদ্যালয়ের উদ্যোগেই রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী পালিত হয়েছে। পরবর্তী সময়ে শিতিকণ্ঠ সেনগুপ্ত (রাজ্যের প্রথম রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষক), আমাদের শিক্ষক প্রয়াত ননীগোপাল চক্রবর্তী প্রমুখ শিক্ষক মহাশয়গণের পরিচালনায় রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উৎসব পালিত হয়েছে।

১৯৫১ সালের ২রা জানুয়ারী রমেশ স্কুল স্থাপিত হওয়ার পর রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উৎসব সামিল হয় এই স্কুলের ছাত্ররাও। শিক্ষক সুশীল মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রমেশ স্কুলের উদ্যোগে রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী পালিত হতো। প্রাথমিক স্কুলগুলিতেও রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উৎসব পালিত হতে দেখেছি। ১৯৫৯ সালে ছনবন নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রদ্ধেয় গোপাল মালাকার মহাশয়ের পরিচালনায় ঐ বিদ্যালয়ে বেশ ঘটা করে রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী পালিত হয়েছিল। জন্মজয়ন্তী পালনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন শিক্ষিকা ইন্দিরা ঘোষ, তিনি আমাদের কাছে 'বুকি পিসি' হিসাবে সুপরিচিতা ছিলেন। তাঁর বাবা প্রয়াত নরেন বোস উদয়পুর বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অর্থাৎ 'বড় হাকিম' ছিলেন। তাঁর বাড়ির উঠানে আমলকি গাছের নিচে পাটি বা মাদুর পেতে রিহার্সাল হতো। পাড়ার ছেলেমেয়েরা অনুষ্ঠানে অংশ নিত।

১৯৬১ সালে কবির জন্মশতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে উদয়পুরে সরকারি উদ্যোগে বিরাট অনুষ্ঠানের আয়োজন কর হয়েছিল। সে সময়ে দক্ষিণে জোনের জ্যোনাল এসডিও পার্থসারথি রায় (ডব্লিউ বি সি এস)-কে সভাপতি এবং রমেশ স্কুলের তদানীন্তন প্রধান শিক্ষক ধীরেন্দ্রচন্দ্র দত্তকে সম্পাদক নির্বাচিত করে রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী উৎসব কমিটি গঠিক হয়। ২৫শে বৈশাখ সকালে কেবিআই রমেশ স্কুল এবং বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় অংশ নেয়। সেই শোভাযাত্রাটি আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। ছেলেরা সাদা ধূতি ও সাদা পাঞ্জাবি পরে এবং মেয়েরা লাল পাড়ের শাড়ি পরে মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন। প্রখ্যাত ভাস্কর বিপুল কান্তি সাহা তখন কেবিআই এর ছাত্র। তিনি মাটি দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি মূর্তি গড়েছিলেন কবির জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে।

১৯৬১ সালে উদয়পুরের মতো জায়গায় দশদিন ব্যাপী রবীন্দ্র নাট্য উৎসব করার মতো দু:সাহস করেছিলেন উদ্যোক্তারা। কেবিআই, রমেশ স্কুল ও বালিকা বিদ্যালয় থেকে দুটি করে মোট ছয়টি নাট্যদল অংশ নেয়। বাকী চারটি নাট্যদল অংশ নেয় বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের পক্ষ থেকে।

১৯৭৮ সালে উদয়পুরে রবীন্দ্র পরিষদ গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। রবীন্দ্র পরিষদ গঠনের আগে স্থানীয় কয়েকজন সংস্কৃতি মনস্ক যুবক 'সোসাইটি' নামে একটি সংগঠন তৈরি করেন। এই সংগঠনের উদ্যোগে উদয়পুরের পূর্বতন তহশীল অফিস। 'সোসাইটি'-র উদ্যোগে কয়েক বছর কখনও বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গন, কখনও বা শীতলাবাড়ি প্রাঙ্গনে 'কবি প্রণাম' অনুষ্ঠিত হয়। 'সোসাইটি' -র সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন সুব্রত দেব, উৎপলেন্দুবিকাশ সাহা, সুভাষ দেব, শ্যামল ভট্টাচার্য (এডভোকেট), জয়শঙ্কর সাহা, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, প্রয়াত শেখর ভট্টাচার্য, প্রয়াত সাধন চক্রবর্তী, সঞ্জয় দাশ মজুমদার প্রমুখ।

রূপকার নাট্য সংস্থা রমেশ স্কুলের বিচিত্রা হলে বেশ ঘটা করে রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী পালন করেছিলেন। ত্রিপুরা রবীন্দ্র পরিষদের পক্ষে অধ্যাপক বিজন কৃষ্ণ চৌধুরী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। রমেশ স্কুলের প্রধান শিক্ষক ধীরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে ছিলেন। অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন কান্তিকুমার চক্রবর্তী। অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন ননীগোপাল বৈদ্য, পান্নালাল ঘোষ, মোহিত রঞ্জন ধর, মানিক মিঞা সহ বেশ কয়েকজন শিক্ষক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব।

আগেই বলেছি ১৯৭৮ সালে ত্রিপুরা রবীন্দ্র

পরিষদের উদয়পুর শাখা গঠনের উদ্যোগ শুরু হয়। আগরতলা থেকে অধ্যাপক বিজনকৃষ্ণ চৌধুরীকে উদয়পুর নিয়ে এসেছিলেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি উৎপলেন্দু বিকাশ সাহা। উদয়পুরে রবীন্দ্র পরিষদ গঠন পর্বে উৎপলেন্দু বিকাশ সাহা খুবই সক্রিয় ছিলেন। টাউন হলের সভা থেকেই সিদ্ধান্ত হয় বালিকা বিদ্যালয়ে রবীন্দ্র অনুরাগী সভাতেই ত্রিপুরা রবীন্দ্র পরিষদের উদয়পুর শাখা গঠিত হবে।

একদিন সন্ধ্যায় উদয়পুর উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের (বর্তমান নাম ভগিনী নিবেদিতা উচ্চতর মাধ্যমিক) প্রধান শিক্ষিকার কক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিপুরা রবীন্দ্র পরিষদের পক্ষে ডঃ ব্রজগোপাল রায় সভায় উপস্থিত ছিলেন। ঐ সভা থেকেই বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা প্রতিমা দাসকে সভানেত্রী এবং ত্রিপুরাসুন্দরী হায়ার সেকেন্ডারী স্কুলের সহকারি প্রধান শিক্ষক সঞ্জয় কুমার গুপ্তকে সম্পাদক করে ত্রিপুরা রবীন্দ্র পরিষদের উদয়পুর শাখা গঠিত হয়। যুগ্ম সম্পাদক হন রমেশ স্কুলের শিক্ষক নবদ্বীপ দাস। ত্রিপুরা রবীন্দ্র পরিষদের শাখা গঠনের পর উদয়পুর রবীন্দ্রচর্চা জোয়ার আসে। নবদ্বীপ দাসের প্রয়ণের পর বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব স্বপন চক্রবর্তী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে রবীন্দ্র পরিষদের সভাপতি পদে বৃত আছেন উদয়পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন শীতল চন্দ্র মজুমদার, সম্পাদক পদে আছেন বিশিষ্ট শিল্পী সুমিতকুমার দত্ত।

২০০৩ সাল থেকে পুরানা রাজবাড়ি প্রাঙ্গনে শুরু হয়েছে 'রাজর্ষি উৎসব'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ত্রিপুরার পটভূমিকাতে তিনটি বই লিখেছেন। রাজর্ষি, বিসর্জন ও মুকুট। তিনটি বইয়ের পটভূমি উদয়পুর। এছাড়া রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন লেখায়, চিঠিপত্রে উদয়পুর নামটি উল্লেখ করেছেন। রাজনগর গ্রামটি যদি সার্বিক ভাবে রবীন্দ্রময় হয়ে উঠে তবে তা আমাদের পক্ষে আরও গৌরবময় হবে।

ঋণ স্বীকার :

১) রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা।। গোবিন্দনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ও হিমাংশুমোহন গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত। ২) রবীন্দ্র সান্নিধ্যে ত্রিপুরা।। বিকচ চৌধুরী। ৩) রাজগী ত্রিপুরার সরকারি বাংলা।। দ্বিজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত ও সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। ৪) রবীন্দ্র পরিষদ কর্তৃপক্ষ।

SAHA MEDICAL HALL

(Chemist & Druggist)

Prop : Jayanta Saha

Mobile No. 9436131150

Cental Road, Udaipur, Gomati, Tripura

রাঙামাটির আলোকবর্তিকা!

অমিতাভ দাশ

শরত জাগ্রত দ্বারে। বর্ষা যাই যাই করছে। এমনি এক বিকেলে ঠাকুরদার ঘরে বসে তাঁর সংগে গল্প করছিলাম। হঠাৎ শুনতে পেলাম বজ্র গম্ভীর কণ্ঠে ডাকছেন "বিরাজ, বিরাজ বাড়ী আছো?" বয়সোচিত চপলতায় মুহূর্তের মধ্যেই ছুটে গেলাম সেখানে। দেখলাম ধবধবে সাদা ধুতি-পাঞ্জাবী পরিহিত এক সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে আছেন। ঠোঁট লাল। লম্বা বাঁকানো চুল ঘাড় ছুঁয়ে আছে। ডানহাতে ধরে আছেন একটি স্যুটকেস। সম্ভবত লেদার ব্যাগ? ততক্ষনে ঠাকুরদাও চলে এসেছেন। আরে শিতিবাবু যে, বলে প্রথমেই পা ছুঁয়ে প্রণাম, তাঁর নির্দেশ মেনে আমিও তাই করলাম।

সময় এগিয়েছে। ততদিনে প্রাথমিক স্কুলের গন্ডি ছেড়ে দিবা বিভাগে পড়ছি। গরমের ছুটি চলছিল। কিন্তু আম কাঁঠালের স্বাদেও মনের মিষ্টতা উধাও। কারণ ঠাকুমা বাড়ীতে নেই। তিনি ঠাকুরদার কোলকাতা সফরসংগী হয়েছেন। ফিরতে বেশ দেরীও করছেন। তাই মনে মনে সাজিয়ে রেখেছি এলে পর কীভাবে ঝগড়া করবো। বাবার মুখে শুনলাম ঠাকুরদা-ঠাকুমা এবার উঁনার কোলকাতা বাড়ীতে বেশ কয়েক দফা গেছেন। একদিকে স্ত্রী বিয়োগে চলছিল তাঁর নির্জন যাপন। অন্যদিকে নিকটজন ও শরীর দুটোই তাঁর আবদারের বশ মানতে নারাজ! বাড়ী ফিরে বাবাকে সেই বিষন্ন স্মৃতি বয়ান করতে করতে চোখের দু'কোল বেয়ে জল নামছিল ঠাকুরদার। যার ভয়ে আমরা সবাই তটস্থ তিনি কাঁদছেন! কিশোরবেলায় মাপতে পারিনি সেই সম্পর্কের গভীরতা। বুঝতে পারিনি শুধুমাত্র একজন সহকর্মীর জন্য আরেকজন সহকর্মী এভাবে কাঁদতে পারেন কিনা?

নবম, দশম ছাড়িয়ে একাদশ। দুইঠাকুমা, জেঠু (সমীর রঞ্জন) এবং বাবার (দেব প্রসাদ) মুখে নানা মিথ, মানুষ, ঘটনাক্রম শুনতে শুনতে সখের বশে রাঙামাটির তথা প্রাচীন উদয়পুরের কাহিনী শোনার, জানার কেমন যেন একটা তীব্র মোহ তৈরি হয়ে গেল! যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংগে আমাদের পরিবারের নিবিড় এবং দীর্ঘযোগ ছিল তিনি প্রথমে সেই স্কুলের সহশিক্ষক, পরবর্তীকালে প্রধান শিক্ষিক হয়েছিলেন। এটা নিছকই তাঁর সরকারী পরিচিতি মাত্র।

পাঁচের দশকের শুরুতে কোলকাতা মহানগর ছেড়ে একজন মানুষ উদয়পুরের মত প্রান্তিক শহরে এসে স্কুলে পড়াচ্ছেন। তাঁর মনের বিশালতার পরিমাপ ওখান থেকেই শুরু করতে হবে। অংক ও বিজ্ঞানের একজন দুঁদে শিক্ষক হয়েও সাহিত্য, শিল্পকলায় তাঁর পারদর্শিতা ছিল অসাধারণ। প্রবীণদের স্মৃতিচারণায় জেনেছি নাটকে তিনি সব্যসাচী। পরিচালনা, অভিনয়, গান লেখা, তাতে সুরদেওয়া এবং ছেলেদের দিয়ে গাওয়ানো, সর্বোপরি নাটকের ব্যবস্থাপনা সবেতেই সমান দক্ষ। তাঁর অভিনীত সিরাজউদ্দৌলাসহ নানা চরিত্র এখনও মিথ হয়ে আছে মঞ্চের ইতিহাসে। শুধু কী তাই, নাটকের মূল কাহিনীকে অক্ষুন্ন রেখে এক ফেরিওয়ালাকে দিয়ে গাইয়ে দিয়েছেন দাঁতের মাজন বিক্রির গান। সময়ের চেয়ে অনেক এগিয়ে থাকা বিজ্ঞাপন ভাবনার এমন সফল মঞ্চ প্রয়োগে তাঁকে শুধুমাত্র উদয়পুরের নয়, ত্রিপুরার অন্যতম অগ্রপথিক বললে বোধহয় অত্যুক্তি হবে না?

একবার বিলেতের একটি সংস্থা পরিচালিত লটারীতে প্রথম পুরস্কার জিতেছিলেন তিনি। মানুষটি চাইলে সেই বাড়তি টাকা নিজের পরিবারের জন্য অনায়াসে খরচ করতে পারতেন। কিন্তু ছাত্র বৎসল শিক্ষক প্রয়োজনীয় সব সরঞ্জাম কিনে সাজিয়ে দিয়েছিলেন স্কুলের বিজ্ঞান ল্যাবরেটরি। আর বাকী টাকা ছেলেদের খাইয়ে খরচ করেছিলেন। শুধুপাঠদানেই শিক্ষকের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়না। ছেলেদের সার্বিক উন্নয়নে শারীরিক অনুশীলন ও জরুরী। যেমন ভাবনা তেমন কাজ। ডাকলেন অনুজপ্রতিম সহশিক্ষক বিরাজ কুমার দাশকে।

দু'জনে মিলে পরিকল্পনা করে জগন্নাথ দীঘিতে নামালেন দুটো নৌকা - 'জলবিক্রম' এবং 'জলকিরীট'। সেই থেকে রোজদিন বিকেলে শুরু হল নৌকাবাইচের অনুশীলন এবং শ্রেণীভিত্তিক প্রতিযোগিতা। সুইমিং পুলও তৈরি হলো পুরাণদীঘির দক্ষিণ পাশে। প্রশিক্ষক বিরাজবাবু।

পরিকাঠামোয় নতুন সংযোজন স্কুল ইউনিফর্ম। ছেলেদের পোষাক হবে আকাশী জামা এবং সাদা প্যান্ট। প্রাক্তণীদের স্মৃতিচারণায় জানা যায় কিরীট বিক্রম ইনস্টিটিউশনের পর উমাকান্ত একাডেমীতেও তাঁর চালু করা সেই পোষাকই হয়ে গেল রাজ্যের সমস্ত সরকারী বয়েজ স্কুলের ইউনিফর্ম।

শুধু স্কুল কেন এর বাইরেও নানা সামাজিক কাজে তিনি থাকতেন অগ্রণী ভূমিকায়। রাজ্যের প্রথম সর্বজনীন দুর্গাপূজা মানে 'উদয়পুর টাউন সর্বজনীন দুর্গোৎসবে' ঘটেছিলো এক বৈপ্লবিক কান্ড! জগন্নাথ চৌমুহনী যাকে সাধারণ্যে মুচিবাড়ীর কোনো বলে ডাকা হয়,কারন সেখানে বাস করতেন মুচি সম্প্রদায়ের মানুষ। যাদের তৎকালীন প্রচলিত ব্যবস্থায় পুজো মন্ডপে প্রবেশে ছিল নানা বিধিনিষেধ । কিন্তু উদয়পুরের প্রগতিশীল পুজো উদ্যোক্তাদের পাশে থেকে সেই মুচিদের মন্ডপে নিয়ে আসা, ওদের অঞ্জলি প্রদান করানো, প্রসাদ খাওয়ানো ইত্যাদিতেও তাঁর ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। ব্রহ্মাবাড়ী (যাঁদের বাড়ীর ব্রহ্মাপূজার সুবাদে এই নামকরণ) সেই বিশিষ্টজন মহিম চন্দ্র দে মহাশয়ের বাড়ীতেও বিশেষ উপলক্ষ্যে দলিত মানুষদের পংক্তি ভোজন করানো হয়েছিল। গৃহকর্তার সংগে ওই আয়োজনে তিনিও ছিলেন অন্যতম কান্ডারী।

একবার একদল ছাত্র ভিন্ রাজ্য থেকে ফেরার পথে পানিসাগরে দুর্ঘটনায় আক্রন্ত হয়েছিলেন। আগরতলা পৌঁছে ওরা দেখলেন একজন সৌম্যদর্শন মানুষ ওদের সুস্থতা সহ সার্বিক চিকিৎসার খোঁজখবর করছেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নিয়েছেন। বদলি হয়ে উদয়পুর ছেড়ে গেলেও সেখানকার ছাত্রদের জন্য দরদ ঠিক আগের মত একই রকম রয়ে গেছে। স্কুল পরিবর্তনে তা এতটুকুও কমে যায়নি। এ ঘটনা তার অন্যতম উদাহরণ।

রাজ্যের সর্বপ্রথম শিক্ষক, শিক্ষাব্রতী হিসেবে ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের হাত থেকে গ্রহণ করেছিলেন জাতীয় শিক্ষকের সম্মাননা। পুরস্কার প্রাপ্তির সময় যদিও তিনি উদয়পুরের কেবিআই ছেড়ে আগরতলার উমাকান্ত একাডেমীর প্রধান পদে বৃত হয়েছিলেন। তবুও এই প্রান্তিক শহরকে ভালোবেসে রেখে যাওয়া তাঁর নানা সুকীর্তি চিহ্নগুলো রাঙামাটির সবুজ উপত্যকা, সুখসাগর আর পুরাণ দীঘির আকাশী জলে সাদা ঢেউয়ের লহর ছড়াবে শিতিকণ্ঠ হয়ে।

শিতিকণ্ঠ সেনগুপ্ত ও বিরাজ কুমার দাশ (কোলকাতা, ১৯৫৭)

ছবি: বিরাজ কুমার দাশের সংগ্রহ থেকে।

পুনশ্চঃ শিক্ষাব্রতী শিতিকণ্ঠ সেনগুপ্ত সম্ভবত ১৯৪৯-৫০ সালে কে.বি.আইতে অংক ও বিজ্ঞানের সহশিক্ষক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। ১লা মে ১৯৫৪সাল থেকে ১৯৫৭ সালের ৩রা অক্টোবর পর্যন্ত ছিলেন প্রধান শিক্ষক।

শতবর্ষের কথালাপ

উদয়শঙ্কর ভট্টাচার্য

(সঙ্গীত স্রষ্টা সলিল চৌধুরীর একশ বছর পূর্ণ হলো। সাংবাদিক এবং সঙ্গীত গবেষক মণীষা রায় এই নিয়েই কথা বললেন বিশ্রুত সঙ্গীতজ্ঞের সঙ্গে। একটি কাল্পনিক সাক্ষাৎকার....)

মণীষা ঃ নমস্কার সলিলদা

সলিল ঃ নমস্কার, নমস্কার।

মণীষা ঃ কেমন আছেন?

সলিল ঃ ভালো আছি। তোমরা যারা আমাকে ভালোবাসো, সবাই বলাবলি করছো, আমার নাকি একশ বছর হয়েছে। তোমরা অনুষ্ঠান সাজাচ্ছো আমাকে নিয়ে। আনন্দ হবে না!

মণীষা ঃ হ্যাঁ, আজ আমারও দ্বিগুণ আনন্দ। আপনার শতবর্ষে আপনাকেই পেয়েছি। আর পেয়েই যখন গেছি তখন আপনার কাছ থেকে কিছু কথাও শুনব আজ।

সলিল ঃ কথা! কি কথা!

মণীষা ঃ কেন আপনার নিজের কথা। আপনার হয়ে ওঠার গল্প।

সলিল ঃ (হা হা) এ আবার কিছু বাকী আছে নাকি? তোমরা যারা আমাকে পছন্দ করো, তাদের জন্য আমার গানজীবন সম্পর্কে নানা কথা বইয়ের পাতায় তো আছেই। যাদের জানার আগ্রহ সেখান থেকে পড়ে নিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়।

মণীষা ঃ আপনি এড়িয়ে যাচ্ছেন। আসলে আপনার একশ বছরে আমরা আপনাকে আর একবার ফিরে দেখতে চাই। আপনার নিজের মুখে শুনতে চাই নিজেরই গল্প।

সলিল ঃ বেশ, সাক্ষাৎকার নেবে, তা তোমার নাম কি বলতো?

মণীষা ঃ আমি মণীষা। আপনার শতবর্ষে আমাদের কাগজের জন্য একটি লেখা তৈরি করছি।

সলিল ঃ মণীষা, (হাসতে হাসতে) সাক্ষাৎকারের বিনিময়ে আমাকে কি দেবে?

মণীষা ঃ কেন, আমার উজার শ্রদ্ধা, ভালোবাসা।

সলিল ঃ বেশ বেশ, তাহলে ঠিক আছে শুরু কর।

মণীষা ঃ আচ্ছা, রাণার, গাঁয়ের বধূ এই যে গনগুলি তৈরী করলেন, কিভাবে সম্ভব হলো। এর কল্পনা কিভাবে করলেন?

সলিল ঃ এই প্রশ্নের উত্তর কথা বলতে বলতেই তুমি পেয়ে যাবে। আমার মনে হয়েছে কি জানো? 'রাণার' 'পালকি চলে', 'গায়ের বঁধূ' ইত্যাদি গান বাংলা গানে একটা নতুন ধারা নিয়ে আসতে পারবে। আর তাই হয়েছে। রাণার একটি কঠিন সুর। অনেকটা সিম্ফনির মতো। মনে পড়ে, হেমন্তদা আমাকে বলেছিলেন, 'সলিল, এত কঠিন সুর, মানুষ কি নেবে? এ যে হারমোনিয়ামে তুলতে কষ্ট হচ্ছে'।

মণীষা ঃ (হাসতে হাসতে) তাই নাকি?

সলিল ঃ হ্যাঁ, আসলে আমাদের গানে অস্থায়ী, অন্তরা ও সঞ্চারীর যে ধারা বাঁধা গৎ তাতে আমার আটকে থাকতে মন চাইতো না। লক্ষ্য করলে দেখবে, রাণারের চলতে শুরু করার সময় থেকে সুর পাল্টেছে। কর্ড, হার্মোনি পাল্টেছে। রাণার গানটিতে 'সা' পাল্টেছে অন্তত ছ'বার।

মণীষা ঃ আচ্ছা সলিলদা, নিজের সময়ে কাকে সবচেয়ে বেশি মিস করেছেন!

সলিল ঃ বাবাকে। জানো মণীষা, আমার বাবার ছিল প্রচুর ইংরেজী গান বাজনার রেকর্ড। তুমি হয়তো জানো, বাবা আসামের শিবসাগর জেলার লতাবাড়ি চা বাগানের ডাক্তার ছিলেন। সেখানে সি.এম. ও. ছিলেন এক আইরিশ ভদ্রলোক। ডাঃ মালোনি। বাবার অসম্ভব সংগীত প্রীতি দেখে তিনি বাবাকে রেকর্ডগুলি দিয়েছিলেন।

মণীষা ঃ কিছুটা জানি, যে, এগুলি আপনার পরবর্তী জীবনকে সংগীতময় করে তুলতে অনেক সাহায্য করেছে।

সলিল ঃ ঠিক বলেছো। জ্ঞান হওয়া থেকে এইসব সিম্ফনি, রেকর্ড আর হঠাৎ হঠাৎ বাবার দরাজ গলার আলাপ আমার চৈতন্যে মিশে গেছিল। আজ যখন ছোটবেলার কথা ভাবতে চেষ্টা করি, বুঝতে পারি, আমার বাবা আমার জীবনের উপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।

মণীষা ঃ আসামের প্রকৃতি আর পরিবেশ থেকে আপনি

অনেক গানের সূত্র গ্রহণ করেছেন বলা যায়।

সলিল ঃ সে তো বটেই। আসামের অরণ্য, তার গাছপালা, পশুপাখি আর কীটপতঙ্গের অসাধারণ আরণ্যক সিম্ফনি....

মণীষা ঃ আচ্ছা, আপনার গানের মধ্যে পশ্চিমী ধ্রুপদী সুরকারদের প্রভাব রয়েছে আমরা জানি। কিভাবে এরা ধরা দিলেন আপনার কাছে?

সলিল ঃ ঐ যে বললাম বাবার রেকর্ড। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই আমি 'মোজার্ট' এর নাম করব। এরপর দর্শনগতভাবে 'বিটোফেন'।

মণীষা ঃ বিটোফেনকে তো আবার 'শেক্সপীয়র অফ মিউজিক' বলা হয়।

সলিল ঃ চমৎকার বলেছো মণীষা, এমন কম্পোজার পৃথিবীতে আর জন্মাবেন না।

মণীষা ঃ আর 'বাখ্'?

সলিল ঃ হ্যাঁ, সে কথাই বলছি, 'বাখ্' সংগীতকে মুক্রি দিয়েছিলেন। তিনি দেখিয়েছিলেন, সুরের অগ্র যাত্রা মানে হার্মোনিক প্রগ্রেশন কত রকম হতে পারে। আর এর ভিত্তিতেই 'বাখ্' প্রচুর গান রচনা করেছিলেন।

মণীষা ঃ বিটোফেন, মোর্জাট আপনার চেতনায় কিভাবে, কেমন ভাবে ধরা দিয়েছিলেন?

সলিল ঃ বিটোফেন ভালোবাসতেন মানবতা ও স্বাধীনতাকে। সেটা তার সঙ্গীত শুনলেই বোঝা যাবে। রাজনৈতিক সামাজিক সব দিক থেকেই সচেতন সঙ্গীতজ্ঞ।

মণীষা ঃ ওর 'ফিফথ সিম্ফনি' কি আপনাকে অনুপ্রাণিত করেছিল?

সলিল ঃ নিশ্চয়ই। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বৈপ্লবিক চেতনার সুর। ওকে হারানোর মত কোনও সুরকার আজ পর্যন্ত আসেনি। মণীষা ঃ আর মোজার্টকে কিভাবে আপনাকে হৃদয়ে ধারণ করলেন।

সলিল ঃ মোজার্ট মানে সরলতা, অসাধারণ মেলোডি। এই মেলোডি থেকে মেলোডিতে যাবার যে প্রক্রিয়া, সেটা আজও অপ্রতিরোধ্য। এই মোজার্ট আর বিটোফেনের প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়েছে আমার উপর।

মণীষা ঃ সলিলদা, আপনার জীবনের বড় একটা অংশ গণনাট্য সংঘের সঙ্গে জড়িত।

সলিল ঃ দেখো, এই প্রসঙ্গ দীর্ঘ। অল্প সময়ে ফুরোবার নয়। তবে আমি কিন্তু এসেছি কৃষক আন্দোলন থেকে। তখন বৃটিশ আমল। কৃষকদের সমস্যার উপরে নানারকম গান তৈরী করছি। এতে তো গণনাট্য আন্দোলনের ধারাই বলা যায়।

মণীষা ঃ তার মানে তখনও আপনি গণনাট্যে আসেননি।

সলিল ঃ না। তখন গণনাট্য আন্দোলন দানা বাঁধছে। কলকাতায় এল গণনাট্য সংঘের কেন্দ্রীয় স্কোয়াড। রুণা রায়, রবিশঙ্কর, প্রীতি সরকার এরা এসে অনুষ্ঠান করলেন, 'স্পিরিটি অফ ইণ্ডিয়া'। অসাধারণ অনুষ্ঠান।

মণীষা ঃ তখন থেকেই আপনি মানসিকভাবে গণনাট্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে গেলেন।

সলিল ঃ একদম তাই। তখনই জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র লিখলেন 'নবজীবনের গান'। গণনাট্য সংঘে যোগ দিলেন জর্জ বিশ্বাস, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, নির্মলেন্দু চৌধুরী।

মণীষা ঃ শিল্পীদের মহা সম্মিলন বলা যায়।

সলিল ঃ নিশ্চয়ই। এতে উদ্বুদ্ধ হয়েই তখন সাধারণ মানুষের জন্য গান বাঁধতে শুরু করলাম।

মণীষা ঃ ঐ সময়ের বিশেষ কিছু ঘটনার কথা মনে পড়ে?

সলিল ঃ হ্যাঁ, সেটাই বলতে চাইছিলাম। ১৯৪৫ সালে, রংপুরে ছাত্র সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলাম। তখন আন্দামান থেকে ফেরৎ আসা বন্দী এবং আই.এন.এ বন্দিদের বিচারের কথা চলছে। গান লিখলাম —

মণীষা ঃ (কথা কেড়ে নিয়ে) 'বিচারপতি তোমার বিচার করবে কারা, আজ জেগেছে সেই জানতা'।

সলিল ঃ একদম ঠিক। আমার বয়স তখন সতেরো কি আঠারো, আই পি টি এ -এ তে বাঁশি বাজাতাম। তখনই আই পি টি এ'র দক্ষিণ কলকাতা আঞ্চলিক শাখা গঠন করি এবং যুক্ত হয়ে পড়ি।

মণীষা ঃ আপনার গানগুলি সেই প্রত্যক্ষ গণ-আন্দোলনের সংস্পর্শ থেকেই লেখা।

সলিল ঃ সে তো বটেই। ঐ যে গান 'ঢেউ উঠছে কারা টুটছে' কিংবা 'ও মোদের দেশবাসী রে' তখনই লেখা।

মণীষা ঃ আর 'পথ হারাবো বলেই এবার পথে নেমেছি গানটা'?

সলিল ঃ এই গানটি গণনাট্যে যুক্ত হওয়ার সময় থেকে ১৫ বছর পরে, মানে ১৯৫৮ সালে লেখা গান, তবু এর থেকে আমার মানসিক অবস্থা বা অবস্থান সম্পর্কে একটা ধারণা পেতে পারো।

মণীষা ঃ তখনকার বহু শিল্পীর সঙ্গে আপনার সুমধুর সম্পর্ক ছিল। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়...

সলিল ঃ আরে সেই সুন্দর সম্পর্ক ভাঙ্গানোর জন্যও একদল লোক উঠে পড়ে লেগেছিল। হেমন্তদার কাছে গিয়ে ওরা বলেছিল — 'সলিল চৌধুরী বলে বেড়াচ্ছে তার সুরে গান না গাইলে আপনি এত জনপ্রিয় হতে উঠতে পারতেন না'। আবার তাঁরাই আমার কাছে এসে বলেছেন — 'হেমন্তদা নাকি বলে বেড়াচ্ছেন, আমি যদি না গাইতাম তবে কে সলিল চৌধুরীকে চিনতো?'

মণীষা ঃ আশ্চর্য ব্যাপার তো?

সলিল ঃ হ্যাঁ, তারপর একসময় দুজনেই বুঝলাম আসল বিষয়টা। মান অভিমান চুকলো। ১৯৬৯ সালে আমার লেখা আর সুরে হেমন্তদা গাইলেন — 'আমায় প্রশ্ন করে নীল ধ্রুবতারা', আর 'শোনো, কোনও একদিন'।

মণীষা ঃ আপনার গানে লোকসঙ্গীতের প্রভাব সম্পর্কে জানতে চাই।

সলিল ঃ হ্যাঁ, শুধু আমার গানে নয় আধুনিক গানে লোকসঙ্গীতের প্রভাব পড়তে বাধ্য। আমার কিছু গানে তার ছাপ আছে। এই যে 'পালকি চলে' গানটির সুর মূলত লোকসঙ্গীত নির্ভর।

মণীষা ঃ 'মধুমতী' ছবির গান।

সলিল ঃ ঠিক বলেছো। খুব স্পষ্টভাবে লোকগানের ছায়া এখানে এসেছে। একটা কথা বলি মণীষা, আমি কিন্তু লোকসঙ্গীতের দিকে কাজ করিনি খুব বেশি। ওই কয়েটি ছাড়া। যেমন — 'হেই সামালো ধান হো'... আরও (চিন্তা করে)

মণীষা ঃ 'ও মোদের দেশবাসীরে' কি?

সলিল ঃ একদম ঠিক। আমি মূলত মডার্ণ মিউজিকের দিকে কাজ করেছি। হেমাঙ্গ বিশ্বাস ওরা কাজ করেছেন লোকসঙ্গীত নিয়ে।

মণীষা ঃ আপনার গান বিচিত্র পথে চলেছে। একটার সঙ্গে আর একটার মিল নেই। এই বৈশিষ্ট্য কিভাবে অর্জন করলেন?

সলিল ঃ দেখো, আমি ছোটবেলা থেকে কোনো গুরুর কাছে যা ঘরানায় গান শিখিনি। আমার গুরু বলতে বাবার কাছ থেকে পাওয়া রেকর্ড। পরবর্তী সময়ে টেপ রেকর্ডার, টেলিভিশনের অনুষ্ঠান, আন্তর্জাতিক সঙ্গীত, সে সবই আমার গুরু।

মণীষা ঃ অর্থাৎ আপনি নির্দিষ্ট কোনও স্টাইলের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রাখেননি।

সলিল ঃ একদম। যে কারণে সুর করতে গিয়ে স্বাধীনতার ব্যাপারটা এসেছে। কারণ, আমি কোনো গুরু বা ঘরানার অনুসারী নই। এই সুর লাগাতে হবে, এই পর্দা লাগাতে হবে, এসব আমি কোনদিনই মানিনি।

মণীষা ঃ বিষয়বস্তুকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

সলিল ঃ নিশ্চয়ই, বিষয়বস্তুকে সঠিকভাবে প্রকাশ করার জন্য যে আঙ্গিক ব্যবহার করা প্রয়োজন বলে মনে করেছি, আমি তাই করেছি।

মণীষা ঃ যেমন ধরুন আপনার এই গানটা 'ঘুম ঘুম ঘুমন্ত' —

সলিল ঃ ঐ একই কথা। পাশ্চাত্য আঙ্গিকে যে 'কর্ড' পদ্ধতি, হার্মোনির যে সিস্টেম, কর্ড প্রগ্রেশনের যে সিস্টেম সেটাই আমি ব্যবহার করেছি।

মণীষা ঃ এবার একটু অন্য প্রসঙ্গে আসি। কেউ কেউ বলেন, বাংলায় ভালো গান হচ্ছে না?

সলিল ঃ ভালো গান নিশ্চয়ই হচ্ছে। তবে প্রচারের রাস্তাগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। কারণ এখন আর আগের মত রেডিওতে, টিভিতে, পূজা পেণ্ডেলে নতুন বাংলা গান শোনা যায় না। গান শোনার উৎসগুলি হারিয়ে গেছে। আর গান না শুনলে শ্রোতা তৈরী হবে কি করে?

মণীষা ঃ ঠিক। আচ্ছা, বাংলায় রাগাশ্রয়ী গানের নির্মাণও আগের মতো হচ্ছে না, অনেকে বলছেন।

সলিল ঃ তুমি কি বলছো?

মণীষা ঃ আমার কাছে তো কথাটা ঠিক বলেই মনে হচ্ছে।

সলিল ঃ কথাটা একদিক থেকে ঠিক নয়। আবার ফেলে দেবার মতও নয়। দেখো, বাংলা গানে সুধীরলাল চক্রবর্তী পর্যন্ত প্রায় সব গানই তো রাগাশ্রয়ী। এরপরে সময় পাল্টেছে, গানের কথা, সুর পাল্টেছে।

মণীষা ঃ আর উচুঁ মানের শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিল্পীরা তো আধুনিক গানের এই আঙ্গিককে মনে প্রাণে নিতে চান না।

সলিল ঃ কেন, অজয় চক্রবর্তী নেন নি? শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে একটা বাঁধা ছক আছে। সেই ছকের বাইরে এসে বড় মাপের শাস্ত্রীয় শিল্পীরা আধুনিক গান করেন না। আর সব গান রাগাশ্রয়ী গান হতেই হবে এমন তো কথা নেই?

মণীষা ঃ আপনি তো আগরতলা এসেছিলেন।

সলিল ঃ ঠিক। আগরতলা বইমেলায় উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিচালনার জন্য একবার এসেছিলাম রাজ্য সরকারের আমন্ত্রণে।

মণীষা ঃ শিল্পীরা তো এখানকারই ছিলেন?

সলিল ঃ হ্যাঁ, ডাইরীর পাতায় ওদের নাম কিছু লিখেছিলাম। গোপাল চক্রবর্তী, পূর্ণিমা নামে একটি মেয়ে ছিল, প্রভাস নামে আরো কয়েকজন। আর একটি মেয়ে, দারুণ গাইতো, রঞ্জনা বড়ুয়া। ডাইরীর পাতায় বিস্তারিত লেখা আছে।

মণীষা ঃ কোন গান করিয়েছিলেন, মনে আছে?

সলিল ঃ নিশ্চয়ই মনে আছে। 'ধিতাং ধিতাং বোলে', আর 'পুরনো দিন, পুরোনো মন।'

মণীষা ঃ আপনার বিখ্যাত গানগুলো।

সলিল ঃ খুব ভালো গেয়েছিলো ওরা। আর একজনের কথা খুব মনে পড়ে, গীটার বাজিয়েছিল ছেলেটি। দুর্দান্ত বাজায়। অনুষ্ঠানের আগের দিন রিহার্সালে, সটান দাঁড়িয়ে কর্ড নিয়ে আমাকে কিছু প্রশ্ন করেছিল সে।

মণীষা ঃ তাই নাকি? ভীষণ ইন্টারেষ্টিং তো।

সলিল ঃ আমি জানি তিনি এখনো আগরতলায় বাজাচ্ছেন। মিঃ অমরনাথ বণিক।

মণীষা ঃ তিনি তো আমাদের সবার চেনা। আপনার একশ বছরে এই প্রাপ্তি আমাদের কাছে অমূল্য।

সলিল ঃ এই যে তুমি দায়বদ্ধতা থেকে, শুধু 'আমি' বলে নয়, একজন সঙ্গীত স্রষ্টাকে স্মরণ করছো, এই ঘটনা নতুন প্রজন্মকে উৎসাহিত করবে। অতীত ছড়িয়ে পড়বে নতুনের মধ্যে।

মণীষা ঃ আমাদের ছোটবেলায় শুনেছি আপনার চিরকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গান, যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম চলতেই থাকবে, সেই — 'সাত ভাই চম্পা জাগোরে...'

সলিল ঃ ভালো কথা মনে করালে। জানো মণীষা, আমিও আজ তোমার সঙ্গে স্মৃতিমেদুর হয়ে যাচ্ছি। প্রখ্যাত সুরকার এবং অ্যারেঞ্জার ভি. বালসারা বলেছিলেন 'সাত ভাই চম্পা' গানটি বাংলা তথা উপমহাদেশের সঙ্গীতে পাশ্চাত্য অর্কেস্ট্রেশনের প্রথম রূপায়ন।

মণীষা ঃ স্মৃতি আপনাকে একেবারে কাতর করে ফেলছে। কি ভাবছেন অত। আপনার গান তো কালজয়ী হয়েছে। সবশেষে আপনার কাছে জানতে চাই —

সলিল ঃ না মণীষা। 'আজ তবে এইটুকু থাক, বাকী কথা পরে হবে'।

আত্ম নিয়ন্ত্রণেই সুখ

নন্দিতা দত্ত

আধুনিক বিশ্ব যেখানে অর্থ, প্রযুক্তি আর ক্ষমতার প্রতিযোগিতায় হুমড়ি খেয়ে পড়েছে, সেখানে হিমালয়ের কোলঘেঁষে দাঁড়িয়ে এক নির্জন, শান্ত, ধ্যানমগ্ন দেশ — ভূটান। অর্থনৈতিক নয়, সুখ এখানে উন্নয়নের সূচক। এই দেশ যেন একটি জীবন্ত দর্শন — যেখানে জীবন মানেই স্বস্তি, সংস্কৃতি মানেই সম্মান, আর প্রকৃতি মানেই পরিবার। এই প্রতিবেদন সেই ভূটানকে তুলে ধরবে, যাকে শুধু ভূগোল নয়, আত্মা দিয়েই বুঝতে হয়। ভূটানের প্রতিটি গ্রাম, পথ, নদী, পাহাড় যেন একটি মৃদু ধ্যানমগ্নতায় আচ্ছন্ন। বিস্তীর্ণ সবুজ বন, ঘনপাহাড়ে আচ্ছাদিত গিরিখাত, ঝরণা আর নির্জন উপত্যকা যেন পৃথিবীর বুকে তৈরি এক শান্তির আশ্রম। ভুটানিরা প্রকৃতিকে মাতৃরূপে দেখে। তাদের কাছে গাছ কাটা, জল দূষণ, কিংবা পাহাড়ের বুকে রাস্তা কাটা একপ্রকার অন্যায়।

এখানে জীববৈচিত্র্য রক্ষায় কঠোর আইন আছে। বনভূমি সংরক্ষণ সাংবিধানিক দায়িত্ব। এদের জীবনে প্রকৃতি ধর্মের মতো, প্রতিটি পাহাড়ে থাকেন দেবতা, প্রতিটি নদীতে বিরাজ করেন আধ্যাত্মিক সত্তা। তাই পরিবেশ রক্ষা এখানে কেবল সরকারি কর্মসূচি নয়, এটি এক চিরন্তন প্রার্থনা।

ভুটানের শহরগুলো যেমন থিম্পু কিংবা পারো, আর গ্রামাঞ্চলের মঠ-মন্দিরঘেরা জনপদ সব এক ধরণের স্থাপত্যগত ঐক্যের নিদর্শন। বুদ্ধ মঠ আর হিন্দু মন্দির দু'ধরণের ধর্মীয় উপাসনালয়ই নান্দনিক রীতিতে নির্মিত। যা প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে নিঃশব্দে একাত্ম হয়ে যায়। কাঠ, পাথর আর প্রাকৃতিক রঙের ব্যবহার এদের স্থাপত্যে একধরণের শান্তি আনে।

পাহাড়ঘেরা ভুটানে বয়ে যায় স্বচ্ছ নদী। জলের গর্জন থেকে ঝর্ণার মৃদু ধ্বনি, যেন প্রকৃতির ধ্যানমগ্ন প্রার্থনা। কখনও কখনও বরফে ঢাকা পাহাড়গুলো রূপালী আলোয় ঝলমল করে ওঠে। আর মানুষ বোঝে শান্তি প্রকৃতির মৌলিক ধর্ম।

প্রকৃতি-সংস্কৃতি মিলে যেন একটি জীবন্ত জাদুঘর। যেখানে মানুষের জীবনধারা আর প্রকৃতির ছন্দ মিলেমিশে তৈরি করে এক অনন্য জীবনতরঙ্গ।

ভুটানের বনে-পাহাড়ে বিরল প্রজাতির জীবজন্তু যেমন স্নো লেপার্ড, তক্ষক, লাল পাণ্ডা ও তাকিন অবাধে বিচরণ করে। এগুলি শুধু পরিবেশগত সম্পদ নয়, বরং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জীবনের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের শিক্ষা।

তরুণ প্রজন্ম 'সুখ'কে রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে দেখে বেড়ে ওঠে। যেখানে প্রকৃতির সঙ্গে মেলামেশা, শিল্পচর্চা, সামাজিক বন্ধন আর আধ্যাত্মিকতার চর্চা জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। শিক্ষা শুধু মাত্র পুঁথিগত নয়। শিশুদের শেখানো হয় মনোযোগ, সহমর্মিতা ও অন্তর্দৃষ্টি। ফলে, শান্তি এখানে কেবল উপাসনার অংশ নয়, এটি এক জীবনপদ্ধতির সূচক। যার ভিত রচিত হয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্য, ধর্মীয় সহনশীলতা ও পরিবেশ সহযোগিতার উপর ভিত্তি করে।

এই দেশে দর্শন আর বাস্তবতা একে অপরের প্রতিবিম্ব। প্রকৃতির সঙ্গে সমঝোতা, পারিবারিক বন্ধনের ভারসাম্য, ধর্মীয় আধ্যাত্মিকতার উপস্থিতি, এবং দার্শনিক রাষ্ট্রনীতি সব মিলিয়ে গড়ে উঠেছে এক বহুমাত্রিক মানবিক সমাজ। আত্মিক শান্তিই সেখানে চূড়ান্ত উন্নয়নের মানদণ্ড। ভুটানের সংস্কৃতি এক গম্ভীর অথচ কোমল ছায়া। ঐতিহ্য আধুনিকতার অভিভাবক, যা হঠাৎ পরিবর্তনের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়! এখানকার জাতীয় পোশাক 'ঘো' (পুরুষদের জন্য) ও 'কিরা' (নারীদের জন্য) সরকারি ভবনে প্রতিদিন পরা বাধ্যতামূলক । এই পোশাক কেবল পোশাক নয়, এটি পরিচয়, এটি ইতিহাস, এবং অবশ্যই গর্ব। এটি এক শাস্ত্রসম প্রজ্ঞা, যা সমাজের রীতিনীতির নীরব ভাষ্য।

তিব্বতি বৌদ্ধধর্মের মহাযান শাখা তাদের দৈনন্দিন জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। সকাল শুরু হয় মন্ত্রোচ্চারণে, সন্ধ্যে কাটে মাঠে ধ্যান করে। ওদের উৎসবগুলো শুধুমাত্র বিনোদন নয়।

এই সংস্কৃতির আবরণে আধ্যাত্মিক অনুশাসন আর হৃদয়ের সংযম গাঁথা থাকে। যা ভুটানকে কেবল দেশ নয়, এক অন্তর্মুখী শিক্ষালয়ে রূপ দেয়। ভুটানের সমাজ কাঠামোতে পরিবারের গুরুত্ব অপরিসীম। এখানে যৌথ পরিবার চালু আছে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম একই ছাদের নিচে থাকে। সন্তান পালনের দায়িত্ব কেবল বাবা-মার নয়, পরিবারের সবার। এই পারিবারিক রীতিনীতির ভেতর দিয়ে গড়ে ওঠে সহমর্মিতা, শ্রদ্ধা এবং নৈঃশব্দ্যে প্রকাশিত ভালোবাসা।

নারীরা এখানে সম্মানিত, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানে অংশ নিচ্ছেন সক্রিয়ভাবে। পারিবারিক সিদ্ধান্তে তাঁদের মতের মূল্য আছে। বিয়েতে পণ নেই, ডিভোর্স সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য। এই সবকিছু মিলিয়ে তৈরি হয়েছে এক সংবেদনশীল, সহনশীল সমাজ। যেখানে সম্পর্ক ভাঙে না, বয়সে থামে না, বরং আরও দৃঢ় হয় অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য ও আত্মিক বন্ধনে।

ভুটান এমন এক দেশ, যেখানে রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র হাত ধরাধরি করে চলে। চতুর্থ রাজা জিগমে সিংগে ওয়াংচুকই প্রথম বলেন, "আমার প্রজারা সুখী, এটাই আমার রাজত্বের সার্থকতা"। সেই থেকেই শুরু GNH – Gross National Happiness — অর্থনীতি নয়, সুখই হলো পরিমাপক। এই দর্শনীয় রাজনীতি একটি কাব্যিক ভারসাম্য তৈরি করে --- যেখানে শাসন মানে নির্দেশ নয়, বরং রক্ষাকবচ।

২০০৮ সালে যখন রাজতন্ত্র স্বেচ্ছায় গণতন্ত্রের পথে হাঁটে, তখন বিশ্ব বিস্মিত। আজও রাজা জনগণের কাছে ঈশ্বরতুল্য, কিন্তু সংসদ ও নীতিনির্ধারণে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াই বলবত। এই ভারসাম্যই ভূটানকে রাজনৈতিকভাবে করে তুলেছে স্থিতিশীল ও জনমুখী। এটি এক ধরণের আধুনিক মনীষী রাষ্ট্রের আদল, যেখানে আদর্শ ও বাস্তবতার মধ্যে নেই সংঘাত।

ভুটানের শিল্পকলা যেন সময়ের গায়ে লিখে রাখা কবিতা। এখানকার স্থাপত্য যেমন — জং (দুর্গ), চোর্টেন (স্তূপ), লাহাথাং (মঠ) তা শুধু ইট-কাঠের তৈরি নয়, সেগুলো যেন ছন্দে গাঁথা।

থাংকা শিল্প (চিত্রকলার এক বিশেষ ধরণ), কাঠ খোদাই, সুতার নকশা, তক্তবায়ন, এমনকি কাগজ তৈরির প্রক্রিয়াতেও এক ধরণের আত্মনিবেদন আছে। প্রতিটি শিল্পকর্মে ঈশ্বরের বাস, প্রতিটি রঙ যেন প্রার্থনার মতো নিবিড়। এই শিল্প যেন সমাজের অভ্যন্তরের কণ্ঠস্বর

— যেখানে ইতিহাস, বাস্তব আর স্বপ্ন একসাথে কথা বলে।

ভুটানে অতিথি মানেই আশীর্বাদ। বিদেশি পর্যটকদের প্রতি আতিথেয়তার নিয়ম অনেকটা রীতিমাফিক। কেউ এলে তাঁকে স্বাগত জানানো, গরম মাখন-চা (সূজা) ও লাল চালের ভাত, 'এমা দাতশি' (মরিচ-চিজের সব্জি) পরিবেশন করা হয়। তবে আতিথেয়তা এখানে বিলাসিতা নয়, আন্তরিকতা। অতিথির ধর্মীয় বিশ্বাস, খাদ্যাভ্যাস বা ভাষাগত পার্থক্যকে সম্মান করা হয়। এই আতিথেয়তায় আছে বিনয়, আছে মননের ঔদার্য। ভুটানিরা হৃদয়ের দরজাটিই যেন খুলে দেয় আগন্তুকের জন্য।

G N H একটি ফ্যান্সি স্লোগান নয়, এটি ভূটানের সমস্ত রাষ্ট্রনীতি, বাজেট, প্রশাসনিক পরিকল্পনার কেন্দ্রীয় মানদণ্ড। কোনও প্রকল্প যদি নাগরিকদের সুখ বাড়াতে ব্যর্থ হয়, তবে তা বাতিল করা হয় --- even if it promises economic growth.

GNH-এর ৯টি সূচকের মধ্যে আছে মানসিক স্বাস্থ্যের মাপকাঠি, সময় ব্যবহারের বিশ্লেষণ, প্রশাসনের প্রতি মানুষের আস্থা, পরিবেশের গুণগত মান ইত্যাদি। একজন সরকারি কর্মকর্তা যেমন কর্মদক্ষতায় মূল্যায়িত হল, তেমনি তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে সম্পর্ক কেমন, সেটাও বিবেচিত হয়। এখানে রাষ্ট্র চালিত হয় মানবিক সূচকে, যেটি উন্নয়নকে দেয় আত্মার ভিত্তি।

ভুটানে ঘুরতে যাওয়া একরকম রোমাঞ্চকর যাত্রা। পাহাড়ের বুক চিরে হেঁটে যেতে যেতে আপনি দেখবেন, এক কিশোরী রাস্তার ধারে মনস্থির করে ধ্যান করছে, এক বৃদ্ধা মঠের চাতালে বসে প্রার্থনা করছেন, শিশুরা পাখিদের খাবার দিচ্ছে। এই জীবনযাত্রায় নেই তাড়াহুড়ো, নেই হিংসা, নেই দাম্ভিকতা।

আপনি যখন ৩১০০ মিটার উচ্চতায় পাহাড়ের খাঁজে ঝুলন্ত প্রাচীন মঠ টাইগার নেস্টে (তাকসাং মঠ) উঠবেন, তখন মনে হবে আপনি কেবল পাহাড়েই নয়, নিজের অন্তরেও উঠে এসেছেন। ভ্রমণ এখানে দর্শনচর্চারই আরেক রূপ।

হ্যাঁ, ভুটানে দারিদ্র্য আছে, প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবকাঠামো এখনও সীমিত, কিন্তু সেখানে নেই অপরাধ, নেই বিষাদে ভরা মুখ, নেই আত্ম কেন্দ্রিকতা। এই অভাবও তারা বয়ে বেড়ায় কৃতজ্ঞতার সঙ্গে।

ভুটানিরা মনে করে, "অভাব সাময়িক, কিন্তু আত্মিক শান্তি চিরস্থায়ী"। এই নীতি তাদের এক গভীর অহংকারহীন আত্মসম্মান দেয়, যা আজকের বিশ্বে ক্রমেই হারিয়ে যাচ্ছে। তাদের জীবনের সরলতা যেন এক আত্মরক্ষার কৌশল, যেখানে সত্যিকার বিকাশ ঘটে হৃদয় ও আত্মার। ভুটান এমন এক দেশ, যা কেবল ভ্রমণ করে জানা যায় না, বুঝতে হয় হৃদয় দিয়ে। এটি সেই দেশ, যেখানে রাষ্ট্র ও নাগরিক একসঙ্গে ধ্যান করে, প্রকৃতি ও মানবতা হাত ধরাধরি করে চলে। এখানে উন্নয়ন মানে ছাদের উপর টাওয়ার নয়, মন ও মাটির মধ্যে সংযোগ। ভুটানকে চিনলাম এক শান্তির, নীতির, সৌন্দর্যের, শিল্পের, দর্শনের জীবন্ত প্রতিমা হিসেবে। যেখানে জীবন অর্থবহ, সংস্কৃতি সজীব, আর মানুষ এখনো মানুষ। ভূটান আমাদের শেখায় সুখ বাহ্যিক নয় অন্তরের।

“তোমার ঘরে বসত করে কয় জনা, মন জান না”

ডঃ বর্ণালি দাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

১.

আজ সকালে নিউরোইমুনোলজির ওপর আমার নেক্সট কনফারেন্সের কি নোট টক বানাতে গিয়ে হিমসিম খাচ্ছিলাম। তারমধ্যে নিউরোলজি কনসালটেন্টের ফোন এলো। অটোইমিউন এনসেফালাইটিসের পেসেন্ট, একগাদা নিউরো ইমিউন মার্কার টেস্ট লিখে দিয়েছে করতে, রিপোর্টের জন্যে তাড়া দিচ্ছে। এ দিকে এম আর আই রিপোর্ট নেগেটিভ। সেই নিয়েই ডিসকাশন বোর্ড বসবে এগারোটায়। আমি ডি এন বি স্টুডেন্টকে কেস ফাইল আর ইমিউনোফ্লুওরেন্সের স্লাইড রিভিউ করার জন্যে আনতে বলে মাইক্রোস্কোপের সামনে বসে বসে আমার টকের জন্যে যোগাড় করা পেপারগুলোতে মন দিলাম। চোখে পড়ল সুসানা কাহালানের ‘ব্রেন অন ফায়ার’ বইটি। কী সাংঘাতিক!! এই ২৮ বছরের সাংবাদিকের অভিজ্ঞতা দুর্বিষহ। স্কিজো এফেক্টিভ ডিসঅর্ডারের তখমা নিয়ে মেন্টাল অ্যাসাইলামে যাওয়ার ঠিক আগে ধরা পড়ল এন এম ডি এ রিসেপটর পসিটিভ। পুরো ট্রিটমেন্ট পাল্টে গেলো। সুস্থ হয়ে লিখলো অভিজ্ঞতার কাহিনী।

স্লাইড রিভিউ করে মাইক্রোস্কোপে চোখ রেখেই চেঁচালাম - কাসপার টু পসিটিভ। আহ! যাক, পেসেন্টের সিমপ্টমসের সঙ্গে রিপোর্ট একদম মিলে যাচ্ছে। এই এক রত্তি টেস্টটা পুরো মিটিংটাকে বদলে দিলো। নিউরো কন্সাল্টেন্টের মুখে শুনলাম মুম্বাইয়ের বাইরের পেসেন্ট, অনেক জায়গায় দেখিয়েছে। সবাই একাধিকবার এম আর আই করিয়েছে। ইমিউন মার্কারটা পসিটিভ আসায় ট্রিটমেন্টে অনেকটা সুরাহা হলো। আরো চমক ছিলো আজ। রোগিনীর কেস ফাইল দেখতে গিয়ে দেখি নাম পঙ্খী জমাতিয়া। জমাতিয়া! কেমন একটা সন্দেহ জাগল — ত্রিপুরার লোক নয়তো! যাক গে আপাতত প্রেজেন্টেশান বানানোয় মন দিই। হঠাৎ দেখি দরজার বাইরে ত্রিপুরার পাছড়ার ওপর টি শার্ট গলিয়ে অল্পবয়সী একটি মিষ্টি মুখের মেয়ে। ইমন, পঙ্খীর ছোট বোন। বম্বে আই আই টি তে পি এইচ ডি করছে। রিপোর্টে আমার নাম দেখে কথা বলতে এসেছে। অজান্তেই ঢুকে পড়ি কাহিনীতে। ইমনের ধারণা মানসিক অবসাদে পঙ্খী টলমল। তার থেকেই ওর আজ এই পরিণতি।

কি বোঝাই? পাওয়া না পাওয়ার অবসাদ নিয়ে আজও অনেকে ভালোবাসার লোকদের থেকে দূরে চলে যায়। মনের গহীনে অন্য এক জগতে তলিয়ে যায়! সত্যি লালন ফকিরের গানটা আজকের পৃথিবীতে বড়োই প্রাসঙ্গিক ঃ

“তোমার ঘরে বসত করে কয় জনা,
মন জান না
তোমার ঘরে বসত করে কয় জনা
এ জনায় ছবি আঁকে এক মনে,
ওরে মন
আরেক জনায় বসে বসে রং মাখে
ও আবার সেই ছবিখান নষ্ট করে
কোন অনা, কেন জনা
তোমার ঘরে বসত করে কয় জনা”।

২.

ঝড় উঠুক
হুইচ হুইচ হুইচি রি রি রি
শিষ দেয় ছাতারের ঝাঁক...
শিশির ভেজা ঘাসের বুকে চাঁদ
বাজিয়ে যায় রূপোলী নিক্কন-
হেলেঞ্চার ঝোপে ময়ূরকণ্ঠী রঙে
আছড়ে পড়ে শালিক রঙা মেঘ।
‘খোড়া সা রুমানি হো যায়ে’
বলে যায় কেউ শুখা মরশুমে।।

টের পাই -
ঝড়ের যেন পূর্বাভাস হয়।
ঝড় উঠুক, ঝড় উঠুক, ঝড় উঠুক -
ধুয়ে মুছে নিয়ে যাক আবিলতা সব।
এই পৃথিবী এক মহা ঝড়ের প্রতীক্ষায়।
ঝড় উঠুক, ঝড় উঠুক, ঝড় উঠুক -
মেঘ নিজেকে নিঃশেষ করে ঝড় ওঠাক
সকলের বুকে।।

ঘন মেঘে ছেয়ে আছে পঙ্খীর মন। লখনউর এস জি পি জি আই এর রেসিডেন্টস আবাস, ছিমছাম দু-কামরার। টিভির ভলিউমটা কানে লাগছে — কি একটা আজেবাজে সিনেমা হচ্ছে, গ্যাসে ভাত বসানো। মাইক্রোওয়েভে সঞ্জীব কুপারের রেসিপি অনুযায়ী পালঙ চিকেন রান্না হচ্ছে। বাথরুমের কল খোলা - ছর ছরর - জলের একটানা গোঙানি। তারি মধ্যে পঙ্খী বিছানায় উপুর হয়ে দেশের ধারাবাহিকে জাবর কাটছে। একটু পড়ছে আবার এক রাশ ভাবনায় হারিয়ে যাচ্ছে, আবার ক-লাইন, আবার হারিয়ে যাওয়া।

ছোট্ট দুই বিনুনি সাদা ফিতা বাদামী চুল। নাকে সিগনি মাথা ছোট্ট মেয়েটি সেই উদয়পুরের রমেশ স্কুলের আকাশে রামধনুর রং দেখে ছবি আঁকতে বসে। কখনো ইচ্ছে হলেই স্কুল ফেরত বৃষ্টির কনকনে ঠাণ্ডা পুকুর জলে এপার ওপার সাঁতরে কবিতা আওরায়। যে কখনো হোম ওয়ার্কের খাতায় কবিতা লিখে বাহবা পায়, আবার কখনো ক্লাসে দুষ্টুমি করে জিংলাপোড়া বেতের বাড়িতে লাল হয়ে কান ধরে বেঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে ছিঁচ কাঁদুনি। স্কুল ফেরত পাড়া বেড়ানোয় পঙ্খীর জুড়ি ছিল না। কখনো বুড়ির বাড়ির খড় কুটো জোগাড় করতে মাঠে ঘাটে ঘুরে বেড়ানো। আবার কখনো বন্ধুদের সঙ্গে কাবাডি, গোল্লাছুট। পুঁই গাছের বিচি টিপে আলতা পরা পা। ঝিনুকের ধার দিয়ে আম কুচি কেটে নারকেলের খোলেতে আচার। বিচ্ছুদের দলের সর্দারণী হয়ে রাতের আঁধারে তেঁতুল গাছের ডালে উঠে বাড়ির সব্বাইকে ভয় দেখানো। স্কুল ফিরতি পথে ধানশিরিষের বনে হলদে সবুজ ঘাসফড়িঙের সারির মাঝে হারিয়ে যাওয়া। হঠাৎ লখনউর রেসিডেন্টস আবাসে উঁকিঝুঁকি দেয় সেই ছোটোবেলার গোলাপী রঙের বাড়ি, সেই বারান্দায় মাধবীলতার গুচ্ছ, দশ পয়সার লাল বরফের আইসক্রিম (মা বলত ওটা ড্রেনের জলে বানানো) সেই এপার ওপার সাঁতরে দাপাদাপির পুকুর, সেই ঠাকুরমার পূজোর ঘর, সেই সকাল সন্ধ্যা সারা পাড়া শুনিয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে সুর করে পড়ার আমার ঘর, পুতুলের সংসার, পুতুল খেলার সাথী, এক্কাদোক্কার ঘর কাটা উঠোন, কাকভোরে উঠে গলা সাধার হারমোনিয়াম, তুলসিতলা, দুপুরবেলার পুকুর পাড়ে রোদ পোহানো ঢোড়া সাপটা মায়ের হাতে লাগানো আম, কাঁঠাল, সুপুরি গাছ - অনেক কিছুই আজ আর নেই — তবুও নীল ফ্রক দুইবিনুনির অনেক কিছু বয়ে বেড়াচ্ছে এখনো সেই উদয়পুরের স্মৃতি। প্রাণের প্রাচুর্যের ছোঁয়া সর্বত্র। এই প্রবাসে চোখবুজলেই সেই নীল ফ্রক আর দুই বিনুনির হৃদয়ের পাণ্ডুলিপি। জগন্নাথ দিঘির পারে সাইকেল বাহিনী সেই মেয়েটির তেরো চোদ্দ বছর বয়স — নীল শাড়ি দুই বিনুনির সলজ্জ কিশোরী আভা। স্কুল ফেরত ছোট্ট চিরকুট হাতে গুঁজে ক্লাসের সেই গম্ভীর পড়াকু চশমিস কিশোরের দৌড়ে পালানো! সেই লাজুক কিশোরের স্বপ্নময় চোখ-হৃদয়ে আজও যেন লেপ্টে আছে। নিঝুম জোছনা মাখা রাতের আকাশ - অনুভবে চাঁদের গন্ধ মাখে। জানালাগুলো হাট করে খোলা - হিমেল হাওয়ায় ভেজা মাটির সোঁদা গন্ধ।

এর মধ্যেই হঠাৎ ঝন ঝন শব্দে ফোনের ঘন্টি। দৌড়ে গিয়ে রিসিভার ওঠাতেই বুকের নিচে হাঁফ ছাড়ে আধচেনা ব্যথা। নীল ওটিতে যাচ্ছে এখন, ইমারজেন্সি সার্জারি, রাতে কখন ফিরবে কোন ঠিক নেই? সার্জারির সিনিয়র রেসিডেন্ট নীলোৎপল বাসুর খাওয়া ঘুমের ফুরসৎ নেই। পঙ্খী গ্যাসের নব বন্ধ করে দেয়, মাইক্রোওয়েভে সবজে আধ সেদ্ধ মাংস পড়ে থাকে। ইচ্ছেগুলো যেন ওর ত্রিশ ছুঁই ছুঁই জীবন থেকে পিছলে যেতে থাকে — 'দূরে কোথাও দূরে দূরে' সুরে তার মনভাসি।

এম বি বি কলেজের লেকচারারশিপ ছেড়ে বিয়ের পর লখনউতে পাততাড়ি গুটিয়েছিল পঙ্খী। লখনউর কলেজগুলোতে বায়োডাটা নিয়ে প্রথম এক বছর হন্যে হয়ে

ঘুরে বেরিয়েছে একা। ইউ পি এস সি-র চাকরি — কাকস্য পরিবেদনা। নিরালা দুপুরগুলোতে মাঝে মাঝেও বড়া ইমামবাড়ার ভুলভুলাইয়াতে হারিয়ে যেতো, কখনো বা ছোটা ইমামবাড়ায় তাজ মহলের অমর প্রেম খুঁজে ফিরত?

দশটা বাজতেই লোডসেডিং। রজত শুভ্র বিদ্যুৎ ঝলকে দৃশ্য দূরের ধু ধু মাঠ। বর্ষার অক্লান্ত ধারায় স্নাত নিস্তব্ধতার আঁচল জড়ানো প্রকৃতি। হাওয়ার শন শন আওয়াজ আর ঝিঁঝিঁর ডাক। ঘাসেদের এলিয়ে পড়া সৌন্দর্য। সামনে সবুজ কালো নিকষ অন্ধকার। বহু বহু দূরে গাছেদের ফাঁকে এক চিলতে আলো যেন কোন নববধূ আঁচলে ঢেকে সাঁজ বাতি জ্বালিয়েছে। পায়ের কাছে ব্যাঙ থপ থপ করে লাফিয়ে যাচ্ছে। ছোট্ট এক ফালি ব্যালকনি - বারান্দায় নিবিড় আঁধারে ঘুম না আসা রাতে লণ্ঠনের আলোয় হলদেটে পুরনো চিঠিতে মগ্ন পঙ্খী। নীল তখন দিল্লিতে সদ্য এম.বি.বিএস আর পঙ্খী এম বি বি কলেজে ফিলসফি অনার্স প্রথম বর্ষ। অপূর্ব এক ভালবাসা জারিত চিঠিগুলো। মাঝে মাঝে চিঠির পাতা থেকে মন উঠিয়ে অপলক তাকিয়ে থাকে দূরের নিকষ অন্ধকারে — কি যে হয়ে গেলো ওদের সম্পর্কটার। নিজেদের বড়ো অসহায় লাগে। ওরা দুজনেই দুজনের অসহায়তাগুলো বুঝতে পারে হৃদয় দিয়ে, তবু নির্মম ভাবে ওগুলোর প্রতি ওরা যেন ইচ্ছাকৃত উদাসীন। আজকাল পঙ্খী প্রায়শই মনে মনে আওড়ায় প্রিয় কবির একটি কবিতা 'কেউ কথা রাখে নি'।

নীল আর পঙ্খী, সেই রমেশ স্কুল থেকে বন্ধু। কবে যে ওদের বন্ধুত্ব ভালোবাসার রঙ নিলো ওরা এখনও ঠিক ঠাওরে উঠতে পারে না। ক্লাসের বেঞ্চিতে, লাইব্রেরিতে, খেলার শেষে একটু জিরোনো। স্যারের বাড়ির সিঁড়িতে বসে নোটস দেয়ানোয়ার ফাঁকে গুজগুজ অবান্তর। টেস্ট পেপার নিয়ে ডিসকাসানের মধ্যেই নীল আর পঙ্খীর মন দেয়ানেয়া। অসুস্থ পঙ্খীর বেডের পাশে নীল রাত জেগে স্মৃতির গভীরে কি যেন হাতড়ায়।

গত এক সপ্তাহ থেকে নীল পঙ্খীর পাশে লেপ্টে আছে প্রায়। ওকে মুম্বাই নিয়ে আসা, ডাক্তার, টেস্ট রিপোর্ট পঙ্খীর খুঁটিনাটি সব বিষয়ে অতন্দ্র প্রহরী। ওর সর্বক্ষণের সঙ্গী। সবকিছু থেকে যেনপঙ্খীকে আগলে রাখতে চাইছে নীল। নীল দিশেহারা, পঙ্খীর চোখের কোণায় জল মুছিয়ে দিচ্ছে। তীব্র আশ্লেষে নীল পঙ্খীকে জড়িয়ে ধরে, চুলে বিলি কেটে দেয়।

মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতা আমাদের সমাজে চিরকাল অবহেলিত। আমাদের চারপাশে অনেকে গুমরে মরে অভ্যন্তরে। ওরা কেউ আমাদের আত্মীয়, বন্ধু, পড়শি বা কলিগ। চলুন হাত বাড়াই।

জুনিয়র পাপেটির ইতিকথা

প্রভিতাংশু দাশ

নতুন প্রজন্ম উন্নাসিক, উদাসীন সমাজ বিমুখ কেরিয়ারিস্ট! এরকম কথা আমরা প্রায়শই শুনতে পাই। কিন্তু 'জন্মদিন' , 'প্রকৃত বন্ধু', 'ছাত্রের পরীক্ষা', 'রাজা ও কাঠবেড়ালী', 'একটি মোরগের কাহিনী' বা 'নীলকমল-লালকমল' ইত্যাদি পুতুল নাটকে স্কুল পড়ুয়াদের সংগে কাজ করতে গিয়ে আমার ধারণার গতিপথ পুরোপুরিই পাল্টে গেল। চোখের সামনে দেখলাম পুতুল নাচের কারিগরিতে কয়েকটি শিশু-কিশোর যন ভিন্নভাবে তৈরি হচ্ছে। ওদের সংগে কাজ না করলে আমি বিরাট মিস্ করতাম। প্রতিদিন দেখছি পঞ্চম থেকে দশম শ্রেনীতে পড়া একটি ছেলে বা মেয়ে নিজেদের হাতে তৈরি করছে রড পাপেট, সেডোপাপেট, গ্লাবস পাপেট। পাশাপাশি সারাইয়ের কাজটাও ওরা শিখে নিচ্ছে। পোষাক বানাতে বানাতে জেনে নিচ্ছে পুতুল নাচের ইতিকথা। কোনো পুতুলের হাত ছিড়ে গেলে যে ছেলে বা মেয়েটা সূচ-সুতো দিয়ে সেলাই করছে, সেই আবার নাটকের চাহিদা মত স্ক্রিপ্ট লিখছে। ছবি আঁকছে। প্রয়োজনে গান লিখছে ওরা। সুরও করছে। নিজেরা দলবেঁধে গানটি গেয়েও ফেলছে। মঞ্চে আলোর কাজও ওরাই করছে। নেপথ্যে কণ্ঠ দিচ্ছে। একটি কমপ্লিট ইউনিট হিসেবে জুনিয়র গ্রুপ নিজেদের মেলে ধরতে চাইছে। এককথায় যূথবদ্ধতাই ওদের এগিয়ে চলার শক্তি। মনে পড়ে ২০২২সালে চারজনকে নিয়ে যখন কাজ শুরু করেছিলাম তখন মনে হয়েছিল নতুন প্রজন্ম বোধহয় এই শিল্পধারা বহন করতে তেমন ভাবে আগ্রহী নয়। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার ধরনা পাল্টেছে। ঠিক তেমনি ভাবে ওদের পরিবার, নিকটজনদেরও দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গেছে। বিনা পারিশ্রমিকে পুতুল নাটকের সংগে যুক্ত হওয়া ছেলে মেয়েরা ওদের কাজের মাধ্যমে সংগীত নাটক একাডেমী থেকে এখন নিয়মিত বৃত্তি পাচ্ছে। ইদানীং আমরা জুনিয়র দল নিয়ে প্রায়শই শো করছি। ওদের কাজ দেখে আপ্লুত দর্শকরা নিজে থেকেই পয়সা দিতে চাইছেন। বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান দিচ্ছেন বইপত্তর। মানুষের অকৃত্রিম ভালবাসার মর্যাদা ওরাও কিন্তু নিজেদের মত করে ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা করছে! সম্প্রতি একটি ছেলের বার্ষিক পরীক্ষা চলছিল। যেদিন শো ঠিক তার পরদিনই ওর অংক পরীক্ষা। তাই আমিও ওকে শুধুমাত্র ওই দিনের জন্য বাদ দিয়েই শোয়ের পরিকল্পনা করেছিলাম। কিন্তু আমাকে আবাক করে শোয়ের ঠিক আগে সেই ছেলেটি এসে হাজির। এবং নির্দিষ্ট দায়িত্ব যথারীতি পালনও করলো। পরদিন পরীক্ষাও দিলো। তবে আমি ভেতরে ভেতরে ওর জন্যে টেন্সড্ ছিলাম। কিন্তু ফলাফল প্রকাশের পর ছেলেটির মা আমাকে ফোন করে যখন জানালেন গত বছরের তুলনায় এবছর সে অংকে অনেক বেশী নম্বর পেয়েছে, মুহূর্তের মধ্যেই যেন আমার প্রথাগত ভাবনায় একটা জোর ধাক্কা খেলাম! বুঝলাম পুতুল নাটকে সময় ব্যয় করে ওর পড়াশোনায় আদৌ ক্ষতি হয়নি। বরং এই শিল্প মাধ্যমেরঅংশীদার হয়ে তার মেধা আরো বিকশিত হয়েছে। উৎসাহ ব্যঞ্জক এই বার্তাটি নীরবে যেন সবার মধ্যে রটে গেল। এখন সবাই আগের তুলনায় বেশী করে মন দিয়ে পড়ছে। পুতুল বানাচ্ছে একাগ্রচিত্তে। পাশাপাশি স্কুলের পরীক্ষার ফলাফল আরও আরও ভাল করছে। ত্রিপুরা পাপেট থিয়েটারের জুনিয়র গ্রুপ মানে সুহানি, অর্কদ্যুতি, অদৃজা, তৎসম, কিঞ্জল, ময়ূখ, আভেরি এবং অভিজ্ঞানরা প্রতিদিনই আমাকে নতুন করে ইতিকথা লিখতে, বলতে, ভাবতে শেখাচ্ছে!

উদয়পুরে নেশা বিরোধী আলোচনা

মা-বাবা হারা মেধাবী শীলার পাশে দাঁড়ালো হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশান

মুখ ছড়িতে হেপাটাইটিসের স্বাস্থ্য শিবির

আজকের ফরিয়াদ স্টাফ রিপোর্টার । ২০ আগস্ট।। তালমিত্তি ত্রিপুরা বয়স আসি ছুই ছুই । ঠোটের কোনে আন্তরিক হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন লাইলে । সংগে তার ১২বছরের নাতি । ডম্বুর জলাশয়ের আশপাশের বিভিন্ন পাড়া থেকে ওরা এসেছিলেন । ঠাকুমার সংগে যেমন নাতি,নাতনি ছিল তেমনি মা, বাবা,ছেলে মেয়ে সহ গোটা পরিবার এসে হাজির হয়েছিলেন মুখছড়ি বাজারে । মঙ্গলবার হেপাটাইটিস ফাউনেশন অব ত্রিপুরা , করবুকের তীর্থমুখ হেলথ এন্ড ওয়েলফেয়ার সেন্টারের যৌথ

...mati Dist observes World ...epatitis Day with focus on ...reaking Down Barriers

উদয়পুরে হেলথ স্ক্রিনিং ক্যাম্প

শান্তিরবাজারে হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন শাখার উদ্যোগে ক...

প্রত্যন্ত এলাকায় স্বাস্থ্য পরিসেবা নিয়ে ছুটে গেছে স্বাস্থ্য দপ্তর

গোমতী জেলায় বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস পালিত

বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবসকে সামনে রেখে নেশা বিরোধী আলোচনা সভা

ডক্টরস ডে উপলক্ষে বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার ও সুগার নির্ণয়

নেশা ও বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে আলোচনা সভা

...to the active role of media in highlighting the good works of Gom...

করবুকে নেশা বিরোধী আলোচনা সভা ও র‍্যালি সহ পথ সভা অনুষ্ঠিত হয়

কাকড়াবনে...

Specialist Health Camp organized in Mandirgh...

World Hepatitis Day in Gomati: Health camp held to screenings for drivers, workers

Times News

Agartala, July 25: On the occasion of upcoming World Hepatitis Day, the Gomati District's National Viral Hepatitis Control Programme Unit and the Hepatitis Foundation of Tripura ... launched a series of ... health camps ... maiden camp, held at ... Gandhagar ...

একুশের প্রথম কবিতা

শুভাশিস চৌধুরী

(একটি ঘরে বাইরে থেকে শেকল তুলে দেওয়া, ঘরে দুজন পঞ্চশোর্ধ স্বামী স্ত্রী।)

মাহবুব-(কাশতে কাশতে) জওশন ভাবতে পারছো মানুষ কতটা নৃশংস হতে পারে?

জওশন - আহা! থামো! আস্তে কথা বলো। শরীর খারাপ। সবেমাত্র জলবসন্তের রেশ কাটিয়ে উঠলে! এখনও তো খাবারই ঠিকমত খেতে পারছ না, এই অবস্থায় এতক্ষণ জেগে কী লিখলে মাহবুব! কাল রাতে? দেখছোই তো চারদিক কেমন শুনশান। আমাদের কণ্ঠরোধ করাই এখন ওদের কাজ।

মাহবুব — কাল ঢাকার রাজপথে প্রকাশ্যে পুলিশের গুলিতে ঝাঁজরা হয়ে মানুষগুলোর পরিবারের কথা। তাদেরও তো ভালোবাসা-ক্রোধ, সংসার, মা-বাবা, আত্মজন ছিল বলো? (গুন গুন করে সুর বাজে)

'রবিষ ধরা মাঝে শান্তির বারি।
ভিতর ভিতর প্রেম পাষাণ হৃদয়ে
জয় জয় হোক তোমারি।
বরিষ ধরা মাঝে শান্তির বারি'।

জওশন — হ্যাঁ গো! এই পরিস্থিতির মধ্যে আবার এই সকাল সকাল কোন্ কবিতার কথা মাথায় আসছে তোমার? গান আসছে মনে?

মাহ — কাল এতো ধকলের পরেও বেঁচে তো আছি। মনে আসছে একটাই লাইন "যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ, প্রাণপনে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল"।

জওশন — এই রোগের এখনও সেরকম ওধুষ আমাদের দেশে আসে নি, তবুও ইশতিয়াক ছিল বলে এই যাত্রায় বেঁচে উঠলে। তোমার কাছ থেকে খাতা কলমটা সরিয়ে না রেখেই —

মাহ — জওশন তুমি শুধু গানটাই ভাবলে? পাষাণ হৃদয়ের কথা শুনলে না? খাতা কলম ছিল বলেই না এই মারণ বসন্তও আমাকে ছেড়ে গেল। লেখার তাগিদেই আমি সেরে উঠেছি, জানি এই সত্য তুমি মানবে না। (কাশতে থাকে) কিন্তু ইশতিয়াক পারবে তো!

জওশন — শোনো! তোমার ঠিক কী হয়েছে বল তো!

মাহ — কী আবার হবে?

জওশন — তুমি তো দেখছি ইশতিয়াকের উপরেও ভরসা রাখতে পারছো না। এই দুঃসময়ে যখন তোমার অন্য স্বজনরা কেউ কাছে আসতে পারছে না, তখন তোমার এই মেয়ের জামাই নিজে থেকে ডাক্তারকে বলে, দেখিয়ে ওযুধ পত্তর খাইয়ে সারিয়ে তুললো।

মাহ — জানি বসন্ত ছোঁয়াছে রোগ, ওরও হতে পারতো, কিন্তু এ তো করেছে আমাকে বাঁচাতে। ওর উপর তোমার আমার আশীর্বাদ আছে জানি।

জওশন — এর থেকেও বেশি কিছু হতে পারতো। তোমার প্রাণ থেকেও কবিতা বড়ো?

মাহ — জওশন! কবি বেঁচে থাকেন তার সৃষ্টির মধ্য দিয়ে।

জওশন — খালি কবিতা ছাড়া কিছুই বোঝে না। না? এর আগে কতোবার তোমার উপর পুলিশী আক্রমণ হয়েছে, ভুলে গেলে?

মাহ — তোমাকে বলেই বা কী হবে। কিছুই তো বুঝতে চাও না। জানলাটা খুলেই দাও। একটু আলো আসুক ঘরে। জালিমের রোষে যদি যায় প্রাণ যাক —

জওশন — আলোর সঙ্গে যদি ধোঁয়া আসে!

মাহ — আসুক। তবুও এই দখিনা বাতাসের জন্যই তো জানলাটা বড়ো করে রাখা। ওই তো সকালের আলোর ছটা আসার সময় হলো।

জওশন — ঠিক আছে। দিচ্ছি জানলা খুলে। আচ্ছা এতো কিছুর পরেও তুমি ভাবছো ওরা আমাদের ছেড়ে দেবে?

মাহ — আমি কী এমন করলাম? একটা কবিতাই তো —

জওশন — তোমার এই একটা কবিতার জন্য ওরা একটা

ছাপাখানা লণ্ডভণ্ড করে দিতো পারে। শোনো নি? তোমার মেয়ে সফিনা জানলার পাশে এসে ফিসফিস করে বলে গেছে, চারিদিকে কী উৎপাত চালিয়েছে পুলিশ বাহিনী। সে তো রাতেই বলেছি।

মাহ — (কাশতে কাশতে) তাই বলেছিল?

জওশন — কোনও রকমে রাতটা কেটেছে। ইশতিয়াক এলেই যেতে হবে। জানি ইশতিয়াক কবিতাটা নিয়ে গেছে।

মাহ — হ্যাঁ।

জওশন — ও তো আর এক পাগল, নিশ্চয়ই অন্য কোনো ছাপাখানায় গেছে। আমি কেন যে ঘুমিয়ে পরলাম, নইলে তো ইশতিয়াক বাইরে থেকে ওভাবে শিকল তুলে দিয়ে যেতে পারতো না।

মাহ — আমাকে নিরাপদে রাখতে, যাতে রাতে পুলিশ এলে আমি এখানে আছি বুঝতে না পারে। এর নাম ভালোবাসা, এর নাম শ্রদ্ধা। ইশতিয়াক যে আমাকে নিজের বাবার আসনে বসিয়েছে সেও বুঝি।

জওশন — কিন্তু এটা না করলে আমরা অন্তত পালিয়ে বাঁচতে পারতাম।

মাহ — বলো কী? জওশন গতকাল এতোগুলো তাজা প্রাণ বুলেটে বুলেটে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পথে পরে রইলো, শুধু বাংলা ভাষাটা মায়ের ভাষা বলে ধরে রাখতে চেয়ে। আর তুমি আমি হায়! পালিয়ে!

জওশন — আমারও পথেই নামতে পারতাম, কিন্তু তোমার এই শরীর নিয়ে, পালিয়ে বাঁচতে চাওয়াটা কি অন্যায়?

মাহ — আমাদের উপর কতগুলো ছেলেমেয়ের জীবনের দায় সেও কি ভুলে গেলে?

জওশন — তুমি তো কোনদিন নিজের মেয়ে সফিনা বা জামাই ইশতিয়াকের কথা ভাবো নি, ভেবেছো আর সব ছাত্র-ছাত্রীদের কথা। আমি চাইলেও তুমি কি ভুলতে পারতে?

মাহ — ভুলি নি বলেই তো পালাই নি। কিন্তু এই কবিতা যদি আনিস ছাপতে না পারে তবে তো সবটা পরিশ্রমই বৃথা।

জওশন — কে? আনিসুজ্জামান? ওই যে লেখক? আবার কী যেন একটা প্রকাশনার সঙ্গে আছে! তুমি ইশতিয়াককে আনিসের কাছে পাঠিয়েছ?

মাহ —ও ছাড়া কে পারবে এই রাত্তিরের মধ্যে এই কবিতা লিফলেট করে ছেপে বার করতে? দেখো, বই হলে এর মুখবন্ধটাও ওই লিখে দেবে একদিন।

জওশন — ভেবে দেখ হয়তো এই রাতেই খবর পেলে, হানাদার বাহিনী ওর ছাপাখানাটাকেই শেষ করতে পারে?

মাহ — তাই তো ভাবছি যদি ওই পাণ্ডুলিপিটা পাওয়া না যায়?

জওশন — কেন তোমার কাছে কোনও কপি নেই?

মাহ — আরে না। এতো বড়ো লেখা কপি করতে তো অনেক সময় লাগতো।

জওশন — তাই বলে,.....। আচ্ছা এখনও যদি কিছু মনে থাকে বল আমি লিখে রাখছি।

মাহ — তাই কর - নাও কাগজ কলম নাও। এই তো টেবিলেই আছে।

জওশন — হ্যাঁ হ্যাঁ বল।

মাহ — এখানে যারা প্রাণ দিয়েছে
রামনার উর্দ্ধমুখী কৃষ্ণচূড়ার তলায় (ভুলে যায়)

জওশন — তারপর, বলো, বলো

মাহ — না আর মনে পড়ছে না।

জওশন — চেষ্টা কর। মনে করার চেষ্টা কর। সবাই তো জানে মাহবুবের স্মৃতি থেকে কিছুই হারায় না।

মাহ — দাঁড়াও দাঁড়াও মনে করার চেষ্টা করছি।

জওশন — এখানে যারা প্রাণ দিয়েছে
রমনার উর্দ্ধমুখী কৃষ্ণচূড়ার তলায়

মাহ — যে গৃহবধু আর কোনদিন তার
স্বামীর প্রতীক্ষায় আঁচলে প্রদীপ
ঢেকে দুয়ারে আর দাঁড়িয়ে থাকবে না

না না এ আমি কী বলছি আরও কয়েকটা লাইন ছিল তো এর আগে।

জওশন — হ্যাঁ। আমারও মনে হচ্ছিল। দেখ ভেবে দেখ

ঠিক মনে পরবে।
মাহ — না। মনে পড়ছে না।
জওশন — ওই শুনছো, শুনতে পাচ্ছো-কান পেতে শোনো।
মাহ — কী?
জওশন — জানলা দিয়ে দেখ ওই যে লাল দীঘির মাঠের দিকে যাচ্ছে ছেলেমেয়ের দল।
মাহ — হ্যাঁ, তাই তো দেখছি।
জওশন — ওখানেই কেন যাচ্ছে সবাই?
ওখানেই সবাই জড়ো হবে?
মাহ — তাই তো কথা ছিল। কিন্তু সেখানেই তো কবিতাটা সবার কাছে বিলি হওয়ার কথা।
ওই তো আসছে ইশতিয়াক। ওর কাছে নিশ্চয়ই কবিতার ছাপানো কপি আছে!
জওশন — দাঁড়াও দাঁড়াও। আর উত্তেজিত হয়ে শরীর খারাপ কর না। না গো ও আমাদের ইশতিয়াক না। ফারুক। ওই তো চলে যাচ্ছে ফিরে। মনে হলো কেউ যেন ওকে ডাকলো মিছিলে ফিরে যেতে।
মাহ— আচ্ছা জওশন! তাহলে এটা নিশ্চিত কবিতাটা ওই পাকিস্তানীর সাকরেদ কোন বাঙালির হাতে পরেছে। হয়তো পড়তে পেরে ছিঁড়ে ফেলেছে। কিম্বা পুড়িয়ে ফেলেছে।
জওশন — মাহবুব অস্থির হয়ো না। যদি ওরা ওই একটা কবিতা পুরিয়ে ফেলে তবে আমি জানি লক্ষ এই রকম কবিতার জন্ম দেবে হাজার মাহবুবের দল।
মাহ — কিন্তু এই একটা কবিতা আজকে পড়া না হলে যে, এর কোন মূল্য থাকবে না। আমি যে আমার সমস্ত ভাষাশহীদদের হয়ে এই দাবী তুলেছি। আজ ২২শে ফেব্রুয়ারি এটা না পড়লে যে, ওই জালিমের দল ২১-এর জয় নিশ্চিত সেটা বুঝবে না।
জওশন — আরে এ কী!
ওই শোনো কান পেতে কোন এক কিশোরীর কণ্ঠ
মাহ — কী? কী শুনতে পাচ্ছো
'এখানে যারা প্রাণ দিয়েছে
রমনার উর্দ্ধমুখী কৃষ্ণচূড়ার তলায়' (নারী কণ্ঠ)
জওশন — আরে এ নিশ্চিত মনজুরার কণ্ঠ।
মাহ — কোন্ মনজুরা?
জওশন — আমাদের সেই পুলিশ অফিসার গো! কী যেন নাম! মনে করতে পারছি না। ওর বোন।
মাহ — কী করে পেল এই কবিতা? ছাপাখানাটাকে তাহলে শেষ করতে পারে নি। নাকি শুধু কবিতাটাই বেঁচে গেল!
জওশন — আঃ চুপ কর। কান পেতে শোনো, না পোড়াতে পারে নি তোমার কবিতা।
মাহ — জানি আজকের পর আর হয়তো এই কবিতা থাকবে না।
জওশন — আজ তো আছে। ঐ তো শোনা যাচ্ছে —
এখানে যারা প্রাণ দিয়েছে
রমনার উর্দ্ধমুখী কৃষ্ণচূড়ার তলায়
যেখানে আগুনের ফুলকির মতো
এখানে ওখানে জ্বলছে অসংখ্য রক্তের ছাপ
সেখানে আমি কাঁদতে আসিনি।
আজ আমি শোকে বিহ্বল নই
আজ আমি ক্রোধে উন্মত্ত নই
আজ আমি প্রতিজ্ঞায় অবিচল।
যে শিশু আর কোনদিন তার
পিতার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ার
সুযোগ পাবে না
যে গৃহবধু আর কোনদিন তার
স্বামীর প্রতীক্ষায় আঁচলে প্রদীপ
ঢেকে দুয়ারে আর দাঁড়িয়ে থাকবে না
যে জননী খোকা এসেছে বলে
উদ্দাম আনন্দে সন্তানকে আর
বুকে জড়িয়ে ধরতে পারবে না
যে তরুণ মাটির কোলে লুটিয়ে
পড়ার আগে বার বার একটি
প্রিয়তমা ছবি চোখে আনতে
চেষ্টা করেছিল

সে অসংখ্য ভাইবোনেদের নামে
আমার হাজার বছরের ঐতিহ্যলালিত
যে ভাষায় আমি মাকে সম্বোধনে অভ্যস্ত
সেই ভাষা ও স্বদেশের নামে
এখানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে
আমি তাদের ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি
যারা আমার অসংখ্য ভাইবোনকে
নির্বিচারে হত্যা করেছে।

জওশন — ওমা এইটুকুই?

মাহ — আহ! হয়তো পরের পাতাগুলো পায় নি। তবে এইটুকু তো শুনতে পেলাম। সবটা হয়তো একদিন শুনতে পাবো।

জওশন — একদিনে হয়তো হবে না, তবে একদিন নিশ্চয় এই কবিতা বাংলার সব মানুষ উচ্চারণ করবে।

মাহ — তাই যেন হয়। ভাষার জয় যেন হয়। ঐ সব হত্যাকারীর বিচার করবে মানুষ। (গুন গুন করে সুর বাজে)

বরিষ ধরা মাঝে শান্তির বারি।।

তথ্যসূত্র ঃ মাহবুব উল আলম চৌধুরীর কাব্যগ্রন্থ 'কাঁদতে আসি নি ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি'।

তাঁর কবিতাটি ১৯৫২ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি লিফলেট আকারে প্রকাশিত হলেও এই দিনই কবিতাটি সরকার বাজেয়াপ্ত করে। পরবর্তীতে ফিরে পাওয়া গিয়েছিল নানান জনের সাথে মিলিয়ে লেখকের স্মৃতি থেকে। আন্দারকিল্লায় একটি প্রেসে যেখানে এর কাজ চলছিল তা ভোর রাতেই পুলিশী আক্রমণের শিকার হলেও এই কবিতাটি কর্মীদের বুদ্ধিমত্তায় প্রকাশিত হয়েছিল। সঙ্গের আরও কবিতা নিয়ে সেদিন বই প্রকাশিত হতে পারে নি। ১৯৮৮ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি স্বাধীন বাংলাদেশে বসুন্ধরা প্রেস থেকে ছেপে মাওলা ব্রাদার্স এর পরিবেশনায় কাব্যগ্রন্থটি পাঠকদের কাছে আসে। এই লেখকের একক কাব্যগ্রন্থে সম্পূর্ণ কবিতাটি রয়েছে। ঘটনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কল্পনায় এই নাটকের নির্মাণ। সমস্ত ভাষাশহীদ এবং কবির কাছে আনত রইলাম। (কবিপত্নী - জওশন আর রহমান, মেয়ে - সফিলা আহমেদ এবং জামাতা - ইশতিয়াক আহমেদ।)

Dipankar Sur
Mobile : 9856661016/8119057150
E-mail : dipankarsur12@gmail.com

Associate with

N R UDYOG
Digital Printing Service

Tumble Dry
Dry Clean Service
Opp. Udaipur Girls' H.S School

Service to :
* Flex Printing/Offset Printing
* Photo Printing/DTP & Silk Screen Printing
* Marriage & Invitation Card
* Trophy-Memento-Certificates
* Printing & Office Materials
* Dry Clean Service/Digital Service DSC-
* Aadhar-PAN-Passport Visa-School &
* College Admission Form Job Form Fill up etc.

বকের পাখার আলো

অর্জুন শর্মা

'বকের পাখায় আলোক লুকায় ছাড়িয়ে পুবের মাঠ' — উদাত্ত কণ্ঠে পড়ত তুহিন, তাও তো মাত্র দিন দশেক আগের কথা। সত্যি সত্যিই বকের পাখায় আলোক লুকায় কিনা তা দেখার জন্য ছায়া দিদিমনির আবেগভরা কথায় মুগ্ধ হয়ে সেদিন স্কুল থেকে এসে বইখাতা রেখেই ছুটে গিয়ে ভানুদের টিলার উপর উঠেছিল। তুহিনদের বাড়িটা লুঙ্গার মধ্যে। সেখান থেকে বকের পাতি দেখাই যাবে না। কোনোরকম রিস্ক নিতে রাজি নয় তুহিন। আজ দেখতেই হবে আলোক কী করে বকের পাখায় লুকায়। ছায়া দিদিমনি এমনভাবে বলেন যেন তখনই দেখা গেছিল বকের পাখায় ভর করে আলো লুকোচ্ছে। ভানু, তুহিনের এক ক্লাস নিচে পড়ে। সেও জুড়েছে তুহিন দাদার সঙ্গে দৃশ্যটা দেখবে বলে। খুব উত্তেজিত দুজনে। পশ্চিম দিগন্তে তখন রঙের খেলা চলছিল। সেদিকে তাকিয়ে ভানু বলে, "তুহিনদা, এইদিকে তো কখনও চোখ পড়েনি আগে। কে যেন আবির ছিটিয়ে দিচ্ছে গো। রঙের ছটার ফাঁক গলে কী সুন্দর আলোর রেখা ঝিলিক দিচ্ছে দেখো"। তুহিন কোনো কথা না বলে একবার রঙিন রশ্মির দিকে, একবার হিজল গাছের শ্রেণির দিকে চোখ ঘুরাচ্ছে।

টিলা থেকে অনধিক পাঁচশো মিটার দূরে নদীটা বাঁক নিয়ে ঘুরে গেছে দক্ষিণে। নদীর ধারেই হিজলের সারি। নদীর এ পারে তুহিন, ভানুদের জমি। মাসখানেক আগে বাবা আর দাদার সঙ্গে সেও গিয়েছিল রোয়া লাগাতে। তার বাবা মতিন প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই একবার ঘুরে আসে খেতের চারপাশে। খুব ছোটো থেকেই তুহিন দেখে আসছে এই ব্যাপারটা। শরীর খারাপ হলেও এই নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম হতে দেখেনি। আরও মাস দুই-আড়াই গেলে যখন আকাশে জলহারা মেঘেরা উদাসীন মতো ভেসে বেড়াবে, নদীর পাড়ে বসে যাবে ধবধবে সাদা কাশের মেলা আর বাতাসে ভেসে আসবে মন-ভালো-করা আনন্দের কেমন একটা অজানা সুর, তখন মতিনের খেতের ধানগাছের গোছাগুলিও আনন্দে মেতে উঠবে। মতিন বলে 'ধানের কলা এসেছে'। তুহিনও তখন বাবার সঙ্গে মাঝে মাঝে আল ধরে হেঁটে হেঁটে যায় আর আলের দুপাশে পোয়াতি মহিলার মতো ভরন্ত ধানগাছের ডগাগুলি ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়। সেই পরশে তার মনের ভিতর কেমন আনন্দের ডুগডুগি বেজে উঠে। সে আনন্দ-বাদন সে একাই শোনে। বাবাকেও বলে না। অবশ্য বাবা তখন নিজেই কেমন আত্মমগ্ন হয়ে থাকে। সবুজ স্বাস্থ্যবতী পাতাগুলিতে দুয়েক ফোঁটা শিশিরও লেগে থাকতে দেখা যায় অনেক সময়। মতিনই তুহিনকে ডেকে ঘুম থেকে তুলে নিয়ে যায়। বলে, "তুনু বাবা, খেত হচ্ছে আমাদের আর এক মা। এর স্পর্শ আমাদের বাঁচতে শেখায়, এর ফসল আমাদের প্রাণভোমরা। একে নিত্য ছুঁয়ে যেতে হয়, না হয় সে রাগ করে"। এসব আলপথে যেতে যেতে বাপ-বেটার কথোপকথন।

পুজোর আনন্দ শেষ হলে কিছুদিন পর বাবার খেতের আর এক মন মাতানো শোভা দেখে অভিভূত হয়ে যায় তুহিন। মনে হয় পুরো মাঠ সোনালি রঙের শাড়ি পরে আছে। ঠিক যেন ডুবন্ত সূর্যের আকাশে ছিটিয়ে দেওয়া রঙ, নেমে আসে ধানের খেতে। তখন সকাল বেলায় ধানের হলুদাভ-সবুজ পাতাগুলি আর সোনালি ধানের ছড়াগুলি শিশিরের ফোঁটা গায়ে মেখে এক রূপকথার আবেশ তৈরি করে। তুহিন বিকেলে স্কুল থেকে এসেই একবার আল ধরে ধরে ঘুরে। বাবা তখন খেতে-ই থাকে। চারদিকে শুধু সোনা-সোনা রঙ। যে মাঠ ছিল সবুজ-সবুজ তা-ই যেন রূপকথার জাদুকরের জাদুকাঠির ছোঁয়ায় হয়ে গেল সোনা-সোনা। কোনো কোনো দিন মতিনের দেরি হলে তুহিনও থেকে যায় মাঠে যখন দুম করে সোনালি মাঠ ডুবে যায় আলো-আঁধারিতে। তখন আর এক রহস্যপুরীর রূপ ধরে সোনালি মাঠ। মুহূর্তেই শত শত, হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি জোনাকির মিটিমিটি আলোয় এক রহস্যের জাল কে যেন বিছিয়ে দেয়।

ক'দিন গেলেই ধান কাটা শুরু হয়ে যায়। তুহিনও

কাটতে যায় বাবা দাদার সঙ্গে। কাস্তে চালিয়ে খচখচ করে এক এক মুঠো ধান গাছ ছোটো হাতের তালুতে বন্দি করে স্তূপীকৃত করতে কী যে সুখ তুহিন তা বুঝাতে পারবে না কাউকে। উঠোনে উঠোনে সোনালি-স্তূপের রাশি। উঠোনটাও হেসে উঠে। গোরু দিয়ে ধানের 'মাড়া' নেবার জন্য উঠোনের ঠিক মাঝখানে পোঁতা হয়ে যায় খুঁটি। গোরুগুলি খুঁটির সঙ্গে লাগানো দড়িতে লাইন করে খুঁটিকে কেন্দ্র করে ঘুরে ঘুরে ধান ঝরিয়ে দেয়। 'মাড়া' শেষে মতিন গোরুগুলিকে আদর করে করে ঘাস খাওয়ায়। বিচালি আলাদা করে উঠোনে যখন সোনালি ধানের একাধিক শঙ্কু আকৃতির স্তূপ জমে উঠে তখন উঠোনটাও খুশিতে নেচে উঠে আর তুহিনের বাবা বলে, "সোনালি পিরামিডের দেশ হয়ে গেল আমাদের উঠোন"। তুহিন দেখেছে তার মা সবসময় বলে "তোর বাবা আসলে রূপকথার দেশের রাজপুত্তুর ছিল। ভুলে আমাদের এই লুঙ্গার বাড়িতে চলে এসেছে"। শুনে বাবা হা হা করে হেসে উঠে আর বলে, "বউ, তুমি ঠিকই বলেছ, ওই রূপকথার দেশ তো আমাদের এই লুঙ্গায় নিয়েই এসেছি আর সঙ্গে রূপকথার দেশের রাণিকেও নিয়ে এসেছি"। মাও তখন না হেসে পারে না। তুহিন খেয়াল করেছে মা'র মুখটা তখন ওই সোনালি ধানের আভা মেখে রঙিন হয়ে যায়। এই উঠোনেই ধান শুকিয়ে শেষে গোলা ভরতি করে রাখলে যেন একটা বৃত্তের সমাপ্তি। সারা বছরের নিশ্চিত খোরাক গোলায় বন্দি করে বাবা-মা'র চোখে মুখে স্বর্গীয় তৃপ্তি ফুটে উঠতে দেখে তুহিন।

হেমন্তের বিকেলে ন্যাড়া মাঠে কাবাডি, হা-ডু-ডু, দারিয়াবান্দা, বুড়িচি, গোল্লাছুট খেলার ধুম পড়ে যায়। ঘুড়িও ওড়ায় তুহিন ভানুরা। তারপরেই ওই জমিতে আলু, মূলো, ধনেপাতা, কফি — আরও কত কী সব্জির চাষ হয়। শীতের মাঠ শিশির-ধোয়া সবুজ সতেজ সব্জির মন-ভোলানো রূপে তুহিনকে মাতিয়ে দেয়।

দশদিন আগে ভানুদের টিলায় দাঁড়িয়ে অস্তগামী সূর্যের লাল আভা মাখানো আলোকের লুকিয়ে পড়া দেখার জন্য হিজল গাছের দিকে আর দিগন্ত রেখার দিকে নজর দিতে দিতে তুহিন সেদিন সত্যিই দেখেছিল একদল বক 'গ্রেটার দ্যান' চিহ্নের মতো সজ্জায় উড়ে যাচ্ছিল। আর... আর সত্যি সত্যিই এ কী দেখল তুহিন। লালাভ-হলুদ আলোকের রশ্মিদল উড়ন্ত বকের পাখায় জড়িয়ে জড়িয়ে কোথায় কোন দেশে চলে গেল। সাদা বকের পাখা অপূর্ব সোনালি রঙে মাখামাখি হয়ে গেল। ঠিক তখনই মা'র নিয়মের শাঁক বেজে উঠে। তুহিন এক দৌড়ে ছুটে যায় উঠোনের তুলসী তলায়। মা'র চারপাশে বকের পাখার সেই আলোর ছটা দেখতে পায় তুহিন।

বাড়ি নামক যে আনন্দ নিকেতনে আজন্ম লালিত হয়েছে সেখানে হাঁটু-কাদায় দাঁড়িয়ে তুহিন এসব ভাবছিল।

আজ এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তুহিন, তার মা, বাবা আর দাদা সেটা যে তাদের উঠোন তা কিছুতেই চেনা যাচ্ছে না। তিনদিনের টানা বৃষ্টির পর সেই ভয়াবহ বিকেলের কথা মনে হলেই গায়ে কাঁটা দেয়। এই প্রথম খেত ভেসে উঠোনে জল উঠল বিকেলে। বাবা-মা কিছু একটা অশুভ আন্দাজ করে প্রথমেই গোরুগুলিকে ভানুদের টিলায় নিয়ে বাঁধল। তুহিন তার দাদাসহ উঠোনের পায়ের-পাতা-ডোবা জলে হেঁটে 'এমন কী আর হবে' ভেবে বইপত্র আর সঙ্গে হাঁসের খাঁচাটা উঠিয়ে আনল। মতিন বলল, "তোমার মা এখানে থাকুক, চলো আমরা তিনজনে গোরুর কিছু ভুষি আর শুকনো খড় নিয়ে আসি"। তিনজন উঠোনে নেমে দেখে হাঁটু সমান জল। তাড়াতাড়ি ভূষির বস্তা মাথায় তুলতে যাবে এমন সময় হড় হড় করে মুহূর্তেই নদীর দিক থেকে তীব্র বেগে জলের স্রোত হামলে পড়ল উঠোনে। অবস্থার আকস্মিকতায় তিনজনই ভয় পেয়ে ঘরে ঢুকে খাটে উঠে গেল। জল ঢুকে গেছে খাটের নীচে।

পলকেই খাট ছুয়ে গেল জল। মতিন বলল, "অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছে। চলো তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাই"। ঘর থেকে বের হতে দেখে বুক সমান জন। জল তখনও শুধু ঢুকছে। কিছুতেই উঠোন পেরিয়ে ভানুদের দিকে যাওয়া যাবে না। আগে তুহিনকে কাঁধে চড়িয়ে মতিন বড়ো ঘরের পাশে একচালার উপরে উঠিয়ে দিয়ে ওরা দুজনও উঠে গেল। জল দ্রুত একচালার চাল ভিজিয়ে দিয়েছে। তিনজনে হামাগুড়ির মতো করে বড়ো ঘরের টিনের চালার একেবারে শীর্ষে উঠে গেল। মুষল ধারে বৃষ্টি ঝরছে তখনও। সঙ্গে মোবাইলও নেই। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে।

এদিকে তুহিনের মা কেঁদে কেঁদে অস্থির। ভানুদের টিলা থেকে এগিয়ে যেতেই হাড় হিম হয়ে গেছে। অন্ধকারে টর্চ জ্বেলে দেখে সামনে শুধুই জল আর জল। ভানুর বাবা বলল, "আমি একটু বেরিয়ে দেখি কাউকে পাওয়া যায় কিনা"। বলেই বেরিয়ে যায়।

রাত তখন বারোটা হবে। ভানুর বাবা ফিরে এসে বলল, "এন ডি আর এফ এর টিম নাকি আসছে। আমি সব বলে এসেছি। আশু মাস্টার বলেছে ওরা এলেই প্রথমেই এখানে পাঠাবে। ততক্ষণ আমাদের অপেক্ষা করতে হবে"। নির্ঘুম রাত কাটল সকলের। ভোরের আলো ফোটার আগেই এন ডি আর এফ-এর টিন সত্যিই এল, সব শুনল। মুহূর্তেই বেলুন নৌকা ভাসিয়ে দিয়ে তুহিনদের বাড়ির লক্ষ্যে ছুটে গেল। দেখল বাপ-বেটা তিনজন জড়াজড়ি করে টিনের চালার উপর বসে আছে। ওদের উদ্ধার করে নিয়ে এলে তুহিনের মা দুই ছেলেকে জড়িয়ে ধরে সজোরে কেঁদে উঠল।

এই মুহূর্তে উঠোন সন্দেহ করে যেখানে সবাই দাঁড়িয়ে আছে সেটাকে কাদা আর বালি ভরতি সীমাহীন চরার মতোই মনে হচ্ছে। বাঁশের বেড়া না হলে ঘরের দেয়ালও ধসে যেত। ঘরের ভেতরটা চেনাই যাচ্ছে না। হাঁটু সমান কাদা। সম্বৎসরের খোরাক ভরতি গোলায় কাদামাখা ধান চেনা যাচ্ছে না। তুহিন দেখে গোলার কাদামাখা ধানের দিকে তাকিয়ে মায়ের চোখ জলে টই-টম্বুর দিঘি হয়ে গেছে। বাবার চোখে জল নেই, আছে মা'র "রূপকথার দেশের রাজপুত্তুরের" স্বপ্ন-হারানো ছবি।

এখন বিকেল। তুহিন দেখল বকের পাতির পাখায় আজ আলোর সঙ্গে সম্বৎসরের সুখটাও পালিয়ে গেছে।

With Best Compliments from :-

Renuka Medical Agency

(Wholesale Distributer)

Hospital Extension Road
Udaipur, Gomati District, Tripura.
Mobile : 8974891276

কবিতার অভিযাত্রায় অনন্যা

পারিজাত দত্ত

মেয়েটির মধ্যে যে ছাই চাপা আগুন ছিল, তা পাড়ার লোকেরা আগে বুঝতে পারেনি। স্কুল জীবনে মুখচোরা, লাজুক মেয়েটি প্রতিবার পরীক্ষার ফল বের হলে মুখ লুকানোর জন্য নির্জনতা খোঁজে, তার বন্ধুতার বৃত্তের ব্যাসার্ধ ক্রমাগত ছোট হয়। মেয়েটির নাম অনন্যা।

অনন্যা জানে যে সে অনন্যা নয়। তবে সে ফাঁকিবাজ নয়। দিনরাত পড়াশুনা করে, অথচ কিছুই মনে রাখতে পারে না। পরীক্ষার হলে তার চোখের সামনে জানা প্রশ্নের উত্তরগুলো কেমন জট পাকিয়ে যায়, বেভুলো হয়ে বসে স্মৃতির দরজায় টোকা মারে বারবার, কিন্তু কিছুতেই সেই বন্ধ দরজা উন্মুক্ত হয় না।

পরীক্ষার ফল বের হলে দেখা যায়, দিন-রাত যে মেয়েটি মুখ গুঁজে শুধু পড়েই চলেছিল, যে ভাবতো এবার ভালো ফল করবে, প্রথম দশে তার স্থান পাকা, সে এবারও টেনেটুনে পাস করেছে। একেবারে পেছনে সারির ছেলে-মেয়েদের ব্রিলিয়ান্টরা তেমন পাত্তা দেয় না। স্কুলেও তার কদর নেই।

বিজ্ঞান কংগ্রেসে তাকে কে নির্বাচিত করবে? বিদ্যালয় স্তরে কুইজ প্রতিযোগিতায় তার ঠাঁই হয় না। অনন্যা শুধু নিজেকে লুকিয়ে রাখার পন্থা খুঁজে চলে নীরবে। বিদ্যালয়ে দেওয়াল পত্রিকার জন্য লেখা চাইলে তার মনে হয় সেও তো লিখতে পারবে কিছু একটা। পাঠ্যপুস্তকের কবিতাগুলো বারবার পড়ল সে, মাথা খুঁটে ছন্দ মিলিয়ে কবিতা লিখল, প্রবল উৎসাহ নিয়ে দিদিমনির কাছে জমা দিল সেগুলো।

ওয়াল ম্যাগাজিন যথাসময়ে প্রকাশিত হল। সেদিন স্কুলের প্রেয়ার হলের সামনে দৌড়ে গেল সে। ওয়াল ম্যাগাজিনে বারবার চোখ বুলিয়ে কতজনের লেখা দেখল, এমন কি তাদের ক্লাসের বুলটিধরের নামটাও জ্বলজ্বল করতে দেখল। কিন্তু কোথাও তার লেখার হদিশ পেল না। নিঃশব্দে দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো তার দুচোখ দিয়ে।

সেই অনন্যা সরকার আজ এ শহরের মঞ্চে-মঞ্চে কবিতা পাঠ করে, বিভিন্ন ম্যাগাজিনে তার কবিতা বের হয়। ধর্মনগর, খোয়াই, বিলোনিয়া, সাব্রুমে তাকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়।

ভোজবাজির মতই যেন পাল্টে গেল তার জীবন। অনলাইনে ত্রিপুরার চৌহদ্দি পেরিয়ে পশ্চিমবঙ্গের জেলায়-জেলায়, বাংলাদেশে কবিতা ছাপা হচ্ছে তার। অনলাইনে সার্টিফিকেট আসছে, পুরস্কারও পাচ্ছে সে দেদার।

পাড়ার গলি দিয়ে যখন সে বের হয়, তখন বুঝতে পারে জোড়া জোড়া চোখ সপ্রংশস দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। সেবার অনন্যা ট্রলি নিয়ে বের হতেই পাড়ার সেন জ্যেঠুর বোন ইলাপিপি জিজ্ঞেস করেছিল, "বাইরে যাচ্ছিস কোথাও? কবিতার অনুষ্ঠান?"

উথলে উঠা গর্বটাকে চাপা দিয়ে, টগবগ করতে থাকা আনন্দের ঝুঁটি চেপে ধরে, মুখে নির্লিপ্ততার এক মুখোশ পরে সে উত্তর দিয়েছিল, "ঢাকা যাচ্ছি, আন্তর্জাতিক কবিতা উৎসব।"

কথাটা বলার সময় আনন্দে বুক কেঁপে উঠল। কাপভর্তি চা অসাবধানতায় যেমন চলকে উঠে, তেমনি খুশির তুফান থেকে ছিটকে পড়ল যেন এক দমক উচ্ছল হাওয়া।

সেই হাওয়া ভাসিয়ে নিয়ে চলল অনন্যাকে। এমন অপার খুশির জোয়ার আসে বলেই গতকাল রাতে মায়ের কথাগুলো - "এভাবে আর কত দিন কোনও কিছু না করে কাটাবি? তোর বাবার বয়স হচ্ছে, যে আলাপগুলি আসছে, সেগুলো নিয়ে তোর মতামত জানা শিগগির ঝুলিয়ে রাখিস না।" কথাগুলো কিছুক্ষণ আগেও তাকে কুটকুট করে কামড়াচ্ছিল, সেই জ্বালা এখন কর্পূরের মত উবে গেল।

মা কেন বুঝতে চায় না? সে কী বাবা-মায়ের বোঝা হয়ে যাচ্ছে দিন-দিন? কিন্তু সে কী করবে? যে আলাপগুলো আসছে, একটাও তার পছন্দ নয়। তারও তো একটা স্বপ্ন আছে, রুচি আছে। তার ক্লাসমেট অপালার স্বামী

ইঞ্জিনিয়ার, ধ্রুবার ডাক্তার। আর তার বেলায় প্রাইমারি টিচার, এল ডি সি। ফুঃ। এটা জীবন? বরং এভাবে আইবুড়ো থাকাই ভালো।

বাবা-মায়ের প্যানপেনি তো নিত্যসঙ্গী, সম্প্রতি জুটেছেন সঞ্জয় দা। এরা যেন তার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে!

সঞ্জয়দার সঙ্গে তার পরিচয় এক কবি সম্মেলনে। মৃদুভাষী একরাগী যুবক, কবিতার সঙ্গে যেন তার সহবাস। অনেকের থেকেই আলাদা সঞ্জয়দা। তার কবিতা নামিদামী ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়।

সঞ্জয়দা তার কবিতা শুনে যেমনভাবে তাকিয়েছিল তাতে তার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠেছিল। যেন করুণা ঝরে পড়ছিল তার দু'চোখ থেকে। সঞ্জয়দার অনেক কথাই বুঝতে পার না অনন্যা। তার কবিতা বিভিন্ন ম্যাগাজিনের পাশাপাশি কয়েকটি পত্রিকায় বের হয়। কবি সম্মেলনে যাবার সুবাদে পরিচয় হয়েছিল পার্থদার সঙ্গে। দৈনিক খবরাখবর পত্রিকার রবিবারের পাতা দেখেন তিনি। অনুরোধ করতে কবিতা নিলেন। যথাসময়ে ছাপাও হল। পার্থদা ভাল মানুষ। কোনও সমস্যা হয় না। কিন্তু ত্রিপুরা বুলেটিনেরকুন্তলদা যেন এটু অন্যরকম। মেসেজ করেন নিয়মিত। মাঝে-মাঝে ভিডিও কলও। সে পাত্তা দেয় না। ঠেকিয়ে রাখে। তবে কুন্তলদাকে কবিতা পাঠায়। ত্রিপুরা বুলেটিনে তার কবিতা ছাপা হয় নিয়মিত।

নিয়মতি কবিতা ছাপা না হলে অনন্যার পাগল পাগল লাগে। কবিতাগুলো ছাপা হবার সংবাদ ফেসবুকে পোস্ট করলে কত শত কমেন্টস, কত কত লাইক! বড় ভালো লাগে। একঅনির্বচনীয় আনন্দ।

অথচ সঞ্জয়দা বলেন কবিতা লিখতে গেলে পড়তে হবে প্রচুর। আধুনিক কবিতার গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে। কী করে তা সম্ভব? সেই স্কুলজীবনে পাঠ্য বইয়ের কয়েকটি কবিতা পড়েছে সে। কামিনী রায়, কাজী নজরুল ইসলাম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, এই মনে আছে। কার কার নাম যে বলেন সঞ্জয়দা, মনেই থাকে না। বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী, শঙ্খ ঘোষ, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, জয় গোস্বামী, বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়, এদের কোনও কবিতাই তো পড়া হয়নি। কবিতা না পড়ে কী কবিতা লেখা যায় না? সে তো লিখছে অনবরত, সেগুলো ছাপাও হচ্ছে।

ইমিগ্রেশন সেন্টারের কাজ শেষ। সীমান্ত পেরিয়ে তাদের দশ জনের দলটিকে স্বাগত জানাতেওপারে উপস্থিত থাকবেন কাদের ভাই। ব্যবসায়ী মানুষ। সংস্কৃতিমনস্ক। রফিক ভাইয়ের বন্ধু কাদের ভাই। রফিক ভাইয়ের আমন্ত্রণে ঢাকাযাত্রা তাদের। আগরতলা থেকে যে দলটি ঢাকা যাচ্ছে, তাদের সবাই লেখক নন, কেউ গল্প লেখেন, কেউবা গান, কেউ শুধুই সংগঠক, আর কেউ বাক্যবাগীশ।

বাংলাদেশ গিয়ে অনুষ্ঠান করলে দাম বেড়ে যায়। নিজেকে ইন্টারন্যাশনাল শিল্পী মনে হয়। এও কি কম পাওনা? অনন্যার মনের ভেতর খুশির বুদবুদ ভেসে বেড়াচ্ছে এখন।

অনুষ্ঠানটি যেমন হবে ভেবেছিল অনন্যা, ঠিক সেই মানের নয়। একটি ছোট্ট হল ঘর। দায়সারা ভাবে একটি ফ্ল্যাক্স ঝুলছে। তবে আন্তরিকতা ও আতিথেয়তার ঘাটতি নেই এতটুকু।

ভাষণ বেশি একটা পছন্দ কোনওদিনই করে না অনন্যা। এখন মঞ্চে কথার ফুলছড়ি ছুটছে। যারা কবিতা পাঠ করেছেন, ইতিমধ্যে, তারা সবাই বাইরে চা-কফি খাচ্ছেন। দুয়েকজন অবশ্য কবিতা পাঠ করে নিচে এসে বসেছেন। তবে তারা গুলতানিতে মগ্ন।

অনন্যা এখন একটু শিহরিত, কারণ, একটু পরই সে কবিতা পাঠ করবে। এই প্রথম বাংলাদেশে তার কবিতা পাঠ। কেউ কী ছবি নেবে?

একটা দূরে বসে রয়েছেন পিয়ালীদি। তাকেই বলবে জম্পেশ করে ছবি তুলতে। অপেক্ষার প্রহর সুদীর্ঘ হয়। কিছুক্ষণ পরেই ডাক এল তার। দুরু দুরু করছিল বুক তখন। মুখে তবু হাসি ফুটিয়ে ছোট্ট কবিতাটি পাঠ করল সে। পিয়ালীদি ছবি তুলেছেন খান কতক।

স্টেজ থেকে নামতে-নামতে সে লক্ষ করল, আগরতলা থেকে যারা এসেছিলেন, তারা অনেকেই হল ঘরে নেই এখন। কবিতা পাঠ করার যে উত্তেজনা, তা স্তিমিত এখন। সীমাহীন আনন্দে ভাঁটার টান। তার উচ্ছ্বাসের বেলুন চুপসে যাচ্ছে। ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে এখন।

ছবিগুলো হোয়াটঅ্যাপে পাঠিয়ে দিয়েছেন পিয়ালীদি। সেগুলি ঝটপট ফেসবুকে পোস্ট করার বদলে সে সঞ্জয়দাকে মেসেঞ্জারে কল করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। এই সাজানো-গোছানো মঞ্চ, এই আন্তর্জাতিক ব্যাপার-সেপার, মিথ্যা এক দুনিয়ার মায়াজাল। এই মুহূর্তে কেমন বিবর্ণ মনে হচ্ছে তার কাছে। কেমন এক নিরর্থক আয়োজন যেন!

কবরস্থান

সীপা দাস

আজ জীবনের প্রান্ত বেলায় এসে যখন পিছনে ফিরে তাকাই, তখন মনে হয়, এই তো সেদিনের কথা....

তখন আমার বয়স একুশ-বাইশ। হা-ভাতে ঘরের বিগড়ে যাওয়া, নেশাখোর এক জোয়ান ছেলে যার মা ছাড়া আর কেউ নেই। মায়ের রোজগারেই খাই আর সকাল বিকাল শাপ শাপান্ত শুনে দিন যায়। চুপ থাকি, কখনো কখনো দিনের পর দিন বাড়ি যাই না। ঐ কবরস্থানের সামনে আমার আড্ডা, মা এসে খুঁজে পেতে বাড়ি নিয়ে যায়। এক শীতের গভীর রাত...

মৃতদেহ নিয়ে এসেছে বাড়ির মাত্র তিনজন লোক। কবরস্থানে বৃদ্ধ আফতাব ভাই ছাড়া কেউ নেই। এদিক সেদিক খুঁজেও কেউ এই কনকনে ঠাণ্ডায় কবর খুঁড়তে রাজি হলো না। কবরস্থানের গেটের বাইরে আমাকে ঘুমিয়ে থাকতে দেখে আফতাব ভাই ডেকে নেন। আমিও ওনার অনুরোধ ফেলতে পারিনি তদুপরি মৃতদেহ নিয়ে অসহায় লোকগুলির চেহারা দেখে কোদাল হাতে নেমে পরি কবর খুঁড়তে। দুজনে মিলে কাজ সমাধা করতে করতে দূর থেকে আজানের ধ্বনি ভেসে আসে। আফতাব ভাই সেদিন আমার হাতে যে টাকা গুঁজে দিয়েছিলেন, আমার কাছে তা ছিল অবিশ্বাস্য। সেই আমার শুরু...

কয়েক মাসেই আমি কবর খোঁড়ার মাস্টার হয়ে গেলাম। সারাক্ষণ আফতাব ভাইয়ের সঙ্গে থাকি। পাথরের মতো পেটানো শরীর আমার আর কবর খোঁড়ার সময় যেন এক অদ্ভুত শক্তি আমাকে গ্রাস করে। রোজ যত কবর তত পয়সা। এক অনাবিল আনন্দ। হাতে টাকা আর টাকা। কোনওদিন দেখিনি এতো টাকা। আমি বদলে যেতে লাগলাম...

নেশা ছেড়ে দিলাম, মা কে আর কাজ করতে দেই না। মা খুব খুশি। চোখে আনন্দাশ্রু। দিনের অধিকাংশ সময় কবরস্থানে কাটাই। কিন্তু মা সন্দেহ করে, আমি কোন দুনম্বরি কাজ করি কিনা। মা কে আশ্বস্ত করি কিন্তু কবরের কথা চেপে যাই। বুঝতে পারি দিনের থেকে রাতে আমার চাহিদা বেশি পয়সাও বেশি। আস্তে আস্তে বুঝতে পারি কবর খোঁড়া ছাড়াও অন্য কাজ আছে। কি সেই কাজ বোঝার চেষ্টা করি...

অনেক ধনবান লোক তাদের প্রিয়জনের কবরের উপর সমাধি বানিয়ে দেন, পছন্দের গাছ লাগিয়ে দেন। সেই সমাধি রক্ষনাবেক্ষণের জন্য গাছের যত্নের জন্য তারা টাকা পয়সা খরচ করতে দুবার ভাবেন না। আমি সেই সুযোগ কাজে লাগাই...

আমার ভাগের সমাধি আমি নিয়মিত পরিষ্কার রাখি। জল, সাবান দিয়ে ধুইয়ে মার্বেল কিংবা টাইলস চিকচিক করে রাখি, একটা আগাছা জন্মাতে দেই না। নিম, জামরুলের গাছ আমার হাতের ছোঁয়ায় তরতর করে বেড়ে উঠে। আপনজনেরা আমার কাজে সন্তুষ্ট হয়ে দুহাত ভরে টাকা পয়সা দিয়ে যান। কেউ কেউ হয়তো বছরে একবার বিদেশ থেকে আসেন। মা-বাবার সমাধির পাশে বসে দু-ফোঁটা চোখের জল ফেলেন আর প্রতি মাসে আমার ব্যাঙ্কের বই-এ টাকা জমা হয়ে যায়। কয়েক বছরের মধ্যে আফতাব ভাই আল্লার কাছে চলে গেলেন। আমি নিজের হাতে কবর খুঁড়ে আফতাব ভাইকে ঘুম পারিয়েছিলাম। একটা সমাধিও বানিয়েছি আফতাব ভাইয়ের নামে। এদিকে মা...

ধরে বেঁধে আমার বিয়েটাও করিয়ে দিয়েছেন কিন্তু মেয়ে আমি নিজে পছন্দ করেছি। আমার বউ সব জানে কারণ শাহিদার সঙ্গে আমার কবরস্থানেই পরিচয় হয়েছিল। এই কবরে কত কান্না শুনেছি, কত অনুতাপের আগুনে আপনজনকে পুড়তে দেখেছি। স্বামীকে হারিয়ে স্ত্রীর হাহাকার, মা-বাবাকে হারিয়ে সন্তানের অনুশোচনা। প্রেমিকের কবরের কোলে মাথা রেখে প্রেমিকার বিলাপ। জীবন জুড়ে এতো দুঃখ, এতো শোক, এতো যন্ত্রণা ?

আমার তখন টাকার প্রয়োজন। যত দুঃখ তত

টাকা। মালদার পার্টি দেখেই আমি বুঝতে পারি আর বিদেশের পার্টি হলে সেই কবর আমার। ততদিনে আমি কবরস্থানের প্রায় দাদা হয়ে উঠেছি। আমার কথাই শেষ কথা কিন্তু ততদিনে এ কথাও বুঝেছি, কখনো কাউকে ঠকাবো না। এই কবরের দৌলতে আমার বাড়ি হয়েছে, দুই ছেলে মেয়ে স্কুলে পড়ে, শেষ বয়সে মাকে একটু শান্তি দিতে পেরেছি। এখন আর কবর খুঁড়তে পারি না, একটা হাতে শক্তি কম তাই দুটো নতুন ছেলে রেখেছি। কিন্তু আমি... কাজ ছাড়িনি। সব সমাধির মালিক আমি। যারা সমাধি বানাতে পারে না, গাছ লাগাতে জানে না কিন্তু নিয়ম করে কবরে এসে প্রিয়জনের জন্য চোখের জল ফেলে আমি তাদের কবরও পরিষ্কার করে রাখি। তারা আমার হাত দুটি ধরে যখন কৃতজ্ঞতা জানায়, তখন মনে হয় আমার জীবন ধন্য। কিন্তু আমার জীবনের চরম সত্যটি বলে আমি আমার কথা শেষ করব....

আমি আসলে সাগর, সাগর পাল। কিন্তু সময়ের স্রোতে আমি হয়ে গেলাম আসগর আলি। এই আসগর আলি পরিচয়ের জন্য আমাকে অনেক যুদ্ধ করতে হয়েছে। মায়ের মৃত্যু শয্যায় স্বীকার করেছিলাম নিজের কাজের কথা, পরিচয়ের কথা। ক্ষমা চেয়েছিলাম মায়ের কাছে। মা আমাকে দুহাত ভরে আশীর্বাদ করেছিলেন। আমি ভগবান আর আল্লার কাছে প্রার্থনা করি....

আমৃত্যু যেন এই কবরস্থানে কাটাতে পারি। আমি হিন্দু নই মুসলমানও নই, আমি মানুষ আর আমি মানবধর্মে বিশ্বাসী। এই কবরস্থান আমার পৃথিবী।

শারদ সম্মান ২০২৫

ব্যবস্থাপনায়

হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন অব ত্রিপুরা

সাউথ জোনাল কমিটি ও উদয়পুর শাখা।

মান আর হুঁশ

অজয় ভট্টাচার্য

এক

আমাদের ভোলা দা সত্যি-ই খুব ভালো মানুষ। আত্মভোলা লোক। বৌদির সাংসারিক ধমক খেয়ে বেশ কয়েকবার 'ভোল' পাল্টাবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু, পারেননি। নিজে মূলত একজন পদার্থবিদ্ হলেও আজকাল শিশু ভোলানাথদের সঙ্গেই তাঁর বেশি ঘনিষ্ঠতা। অপদার্থ আর পদার্থ - দুটোর মধ্যেই পজিটিভ এনার্জির সন্ধান করে চলেছেন। তাই বোধহয় এই জীবনে ধনপতি সওদাগর হতে পারেননি। নিয়মিত মর্নিং ওয়ার্ক করেন। সঙ্গী বাল্যবন্ধু প্রোমোটার দয়াল হরি কর্মকার আর দীর্ঘদিনের সহকর্মী বাংলার বিষয় শিক্ষক তড়িৎ কান্তি বিশ্বাস। ভোলা দা মানে ভোলানাথ দে কানে হেডফোন লাগিয়ে মান্না দের গাওয়া পুরোনো গান শুনতে শুনতে ন্যাশনাল হাইওয়ের একপাশ ধরে হাঁটতেই বেশি আগ্রহী। তাঁর মতে এই দিকে এসে মর্নিং ওয়ার্ক করলে চারদিকে সবুজ বনানী ঘেরা ত্রিপুরার মনোরম দৃশ্য আর জাতীয় সড়কে আধুনিক গতি সর্বস্ব জীবনের বাস্তব দৃশ্য হৃদয়ের মধ্যে স্থিতিশক্তি ও গতিশক্তির সার্থক সমন্বয় ঘটায়।

দিন চলছিল ভালোই। কিন্তু একদিন হঠাৎ করেই ঘটল একটা অঘটন।

সেদিন মর্নিং ওয়ার্কের পর চৌমাথার মোড়ে ভজনের চায়ের দোকানে তিন বন্ধু মিলে চা খেতে গিয়েছিলেন। ভজন চা তৈরি করছে। চায়ের জল ফুটছে। 'ফুট' তখনও ফুটতে ফুটতে 'গজ' হয়নি। ভজন দরাজ গলায় গান গাইছে — 'দয়াল রে, ভবের নাট্যশালায়...'।

লম্বা বেঞ্চের একপ্রান্তে দীর্ঘকার ভোলা দা একেবারে পারপেণ্ডিকুলার ভাবে বসে কাগজের তৈরি ছোট চায়ের কাপটা ঠোঁটে লাগিয়ে সবে চুমুক দেবেন, এমন সময় বিকট শব্দে ও দ্রুত গতিতে ধাবমান একটা মোটর বাইক এসে বেঞ্চের অপর প্রান্তে সজোরে আঘাত করার পর চালকসহ রাস্তার পাশে উল্টে পড়ে গেল। পরমুহূর্তেই ভোলা দাও একেবারে হোরাইজোন্টাল হয়ে ধরণীর বুকে আশ্রয় নিলেন। তাকিয়ে রইলেন সুনীল আকাশের দিকে। ঠিক তখনই পাশে রাখা একটা চেয়ারে বসে চোখ বন্ধ করে প্রকাণ্ড হাই তুলছিলেন ছোটখাটো চেহারার দয়ালহরি বাবু। ভোলা দার হাতের চা-ভর্তি কাগজের ছোট কাপটা ঢুকে গেল তাঁর মুখে। দয়াল হরি বাবু কয়েক মুহূর্তের জন্য হতভম্ব হয়ে গেলেন। কে তাঁকে এমন দয়া করল — তা তিনি বুঝতেই পারলেন না।

পাশে দাঁড়িয়ে থাকা তড়িৎ কান্তি বাবুর জন্য ভজন 'লেবু চা' বানিয়েছে। তড়িৎ কান্তি চায়ে একটা চুমুক দিয়ে বললেন — 'ভজু আর একটু লেবুর রস মিশিয়ে দে'।

ভজন পেছন ফিরে সোহাগ করে তড়িৎ কান্তি বাবুর চায়ে আরও একটু লেবুর রস মেশাতে যাবে, এমন সময় ভোলানাথ বাবুকে চিৎপটাং হয়ে পড়তে দেখে সে এমন ঘাবড়ে গেল যে, লেবুর রস স্প্রে হয়ে চালান হল তড়িৎ কান্তির চোখে। তড়িৎ কান্তির আর্ত চিৎকারে এবার সবার হুঁশ ফিরে এলো। তড়িঘড়ি করে ভোলা দাকে তুলে বসানো হলো। তবে, ভোলা দার কপাল ভালো। আঘাতটা গুরুতর নয়। কোমরে সামান্য একটু লেগেছে। চোখে মুখে জল ঢেলে একটু স্বাভাবিক হবার পর তড়িৎ কান্তি বাবুও এবার এগিয়ে এলেন। সবার আন্তরিক প্রচেষ্টায় হেলমেট পরা মোটর বাইক চালককেও তার মোটর বাইক থেকে বিচ্ছিন্ন করা হলো।

তড়িৎ বাবু ভেবেছিলেন এবার হেলমেট খুলে মোটর বাইকের চালককে কষিয়ে একটা চড় মারবেন। কিন্তু হেলমেট খুলতেই মোটর বাইক চালককে দেখে দয়াল হরি আর তড়িৎ কান্তি বাবুর চোখ কপালে উঠল। দয়াল হরি বলে উঠলেন — 'আরে! এ যে ভোলার প্রতিবেশী তপনের ছেলে!'

একটা বখাটে ছেলে হিসেবেই সে এই শহরে সবার কাছে

পরিচিত। প্রোমোটার দয়াল হরি বুঝলেন ওকে প্রোমোট করে কোন লাভ নেই।

ভোলা দা কোমরের ব্যথাটাকে চেপে রেখে ছেলেটাকে একটা ধমক দিয়ে বললেন — 'অ্যাই গদাই! ব্যাপারটা কী? সাত সকালে এভাবে রং সাইডে এসে ধাক্কা মারলি কেন?' যতই হোক এক পাড়ার লোক, গদাই তাই একটু কাঁচুমাচু হয়ে বলল — 'সরি আঙ্কেল'। বেশি ব্যথা পেয়েছো? প্লিজ, ব্যথা পেওনা। এতো বেশি ব্যথা পেতে নেই। শাস্ত্রে লেখা আছে। মনটাকে শক্ত করো। তুমিই তো সেদিন বাবাকে বুঝিয়েছিলে, মনে নেই?

আসলে আমেরিকার মতে লেফট ইজ রাইট করতে গেছিলাম, আর কী! এখানে আমেরিকাটা যে এমন আঁকাবাঁকা তা কি জানতাম, বলো? সবাই বলে ইউরেকা! ইউরেকা!....

আসলে সবকটাই রাম বোকা। খায় শুধু ধোঁকা। আমাকে আবার বলে, আমি নাকি খোকা। বোঝো!

শুনে সবাই হতবাক। বুঝতে আর বাকি রইল না যে, ড্রাগস-এর অ্যাকশন এখনও চলছে। তড়িৎ কান্তি এবার কড়া গলায় বললেন, — 'এতো সকালে কোথায় যাচ্ছিস? করিস কী আজকাল?'

গদাই তার হাতের কেটে যাওয়া জায়গাটা আর একটা হাত দিয়ে চেপে ধরে একগাল হেসে বললো — 'এই টুকটাক ফ্লাইং বিজনেস - টিজনেস করি আর কী'।

গদাই একটু যেন অবাক হলো। বললো — 'আরে, আরে! রেগে যাচ্ছ কেন? তুমিই তো বলতে, রাগ করলে নাকি বুদ্ধি-শুদ্ধি সব লোপ পায়! দাঁড়াও, তোমাদের জন্য একটা অটোরিকশা ঠিক করে দিচ্ছি। বাড়ি চলে যাও। পার্কে মর্নিং ওয়ার্ক করলেই তো পারো। কত সুন্দর পার্ক তৈরি হয়েছে আমাদের পাড়ায়!'

সন্ধ্যায় ডাক্তার রায় চৌধুরীর ক্লিনিকে তিন বন্ধুর সাথে ভোলানাথের পার্বতীও ছিলেন। চোট সামান্য-ই। ভয়ের কিছু নেই।

ডাক্তারবাবু বললেন — 'ভোলা ওর কপালে যে তেলটা মেখেছিল, তা একদম পিওর ছিল। একেবারে 'কাচ্চিঘনির' তেল।

দয়াল হরি বলে উঠলেন — 'একদম ঠিক বলেছেন দাদা। অন্যকে তেল দিয়ে কী হবে? ডিজিটাল ইণ্ডিয়ায় নিজেকেই নিজের কপালে পিওর তেল মাখতে হবে'।

বৌদি বলে উঠলেন — 'মাখলে তা ভালো করেই মাখা উচিত। তেল মেখে কপালটাকে এমন চকচকে করে তুলতে হবে, যাতে অন্যের কপালটাও নিজের কপালে ভালো করে দেখা যায়। ঠিক কিনা?'

সবাই হেসে উঠলেন।

দুই

তিন বন্ধু আজকাল নোতুন-পুরোনো গান শুনতে শুনতে পার্কেই মর্নিং ওয়ার্ক করেন। ইভিনিং ওয়াকও করা যায়। ব্যাপারটা মন্দ নয়। অনেকের সঙ্গেই দেখা হয়। অনেকে আবার আধুনিক রীতি অনুযায়ী দেখেও না দেখার ভান করেন। যুগটা আধুনিক থেকে আধুনিকতর হচ্ছে। আধুনিকতার ছোঁয়াটা রাত হলেই বেশি অনুভব করা যায়। আধুনিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত নাগরিক-নাগরিকারা আজকাল স্মার্টফোনেই বেশি স্বতঃস্ফূর্ত। হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম ভরে যায় তাদের পোস্ট করা দেশি-বিদেশি মহামানবদের অমূল্য বাণীতে। অপর দিকে দুর্ঘটনায় কেউ আহত হয়ে রাস্তায় পড়ে থাকলেও সেদিকে ফিরে তাকাবার সময় তাদের নেই। উপদেশ দিতে সবাই আগ্রহী। কিন্তু উপদেশ নেবার সময় যে তাদের নেই। সবাই ভীষণ ব্যস্ত কিনা, তাই।

তিন বন্ধু আজ আবার শহরের রাস্তা দিয়েই হেঁটে চলেছেন। পার্কের গেট কিপার বোধহয় এখনও ঘুমন্ত অবস্থায় রয়েছেন। গেটগুলো তাই তালা বন্ধ অবস্থায় রয়েছে। রাস্তার পাশে অনেকগুলো সুসজ্জিত দোতলা বাড়ি। বাড়িগুলোর মেইন গেটে ইংরেজিতে লেখা অনেকগুলো সুসজ্জিত নেমপ্লেট।

একটা ছোট্ট মেয়ের গলা থেকে রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুর ভেসে আসছে। ও গাইছে — 'তোমার মাথা নত করে দাও হে আমার চরণ, ধুলার তলে...'।

একজন বয়স্ক লোক মর্নিং ওয়ার্ক সেরে ঘর্মাক্ত শরীরে ঐ বাড়িতেই ঢুকছেন। উনিও একজন গায়ক। উনি গুনগুন করে গাইছেন — 'আমি অবাক হয়ে শুনি, তুমি কেমন করে...'।

তড়িৎ কান্তি বলে উঠলেন — 'বলে কী!'

ভোলা দা তাঁকে মৃদু ধমক দিয়ে বললেন — 'চুপ সব ইংলিশ মিডিয়াম। গুরুদের দিনকাল এখন খুব খারাপ চলছে। মাথা নত না করে যাবে কোথায়? অবাক হয়েই সবকিছু শুনতে হবে।

এবার গেট খোলা হলো। রঙ বেরঙের পোশাক পরা একঝাঁক মানবী এবার পার্কে ঢুকলেন। রুটিন মাফিক সুমধুর কণ্ঠে পরনিন্দা আর পরচর্চাও শুরু হল। পার্কের ভেতরে মৃদুস্বরে হেমন্ত মুখার্জীর গাওয়া সলিল চৌধুরীর সেই বিখ্যাত গানটা আবার বেজে উঠল — 'ছন্দে ছন্দে কত রঙ বদলায়...।'

তবে কেউ শুনলো না একমাত্র আকাশটা ছাড়া। গানটা আজ আকাশের খুব মন ধরেছে। শুনে সেও তার রঙ পাল্টাতে শুরু করলো। কালো মেঘের আগমন শুরু হলো। আকাশের রঙটা নীল থেকে ক্রমেই কালো হয়ে যেতে লাগলো।

আজ কেন জানি পার্কের ভেতরে ঢোকার ইচ্ছে হল না তাড়িৎ-ভোলা-দয়ালের। তিন বন্ধু শহরের পাকা রাস্তা দিয়েই হেঁটে চললেন।

এবার কিছু দূরে একটি ছোট খাটো জটলা দেখা গেল। একটা বাড়ি থেকে কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছে। বাড়ির পাশে রাস্তায় একটি শববাহী গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। খবর নিয়ে জানা গেল কিছুক্ষণ আগে ক্রীড়া শিক্ষক বিমলেন্দু বাবু না ফেরার দেশে চলে গেছেন। পৃথিবী থেকে তাঁদের একজন অতি পরিচিত মুখ হারিয়ে গেলেন। শেষ হলো খেলা।

তিন বন্ধুর-ই মন খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু আধুনিক পৃথিবীতে মন খারাপ হলেও কোন মাপ নেই।

পাশের বাড়ির ছাদ থেকে একটা বিদেশি কুকুর বিকট শব্দে ঘেউ ঘেউ করে চলেছে। ঝাঁ চকচকে তিনতলা বাড়ি। বাড়ির মালিক নিঃসন্দেহে ধনপতি বাবু। এ পাড়ায় নবাগত। বাড়িতে ডিস্কো জকির রিমিক্স বাজছে। একতলার কাঁচের জানালা দিয়ে অস্পষ্টভাবে দেখা গেল কারা যেন ট্রেড মিলে ব্যায়াম করছে। হঠাৎ কেন জানি মাথাটা গরম হয়ে গেল ভোলনাথের।

বাড়ির সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একই সঙ্গে কলিং বেল বাজিয়ে আর সদর দরজায় সজোরে কিল মারতে মারতে ভোলা দা চিৎকার করে গৃহকর্তাকে ডাকতে শুরু করলেন — ও মশাই, শুনছেন?

বেশ কয়েকবার ঘটনাটার পুনরাবৃত্তি করার পর গৃহকর্তা সদর দরজা খুলে বিরক্তি মাখা মুখে বাড়ির বাইরে এসে বললেন — 'কী ব্যাপার? কী চান?' জবাবে ভোলাদা ভদ্রলোকের কানের কাছে নিজের মুখটাকে রেখে প্রচণ্ড জোরে বলে উঠলেন — 'চাই মান আর একটু হুঁশ।'

“সময়ের হাত এসে মুছে ফেলে আর সব”

সুস্মিতা দাস

পাশাপাশি বসে আছে এক নবদম্পত্তি। রাহুল ও উজ্জয়িনী। ঝকঝকে এক যুবক যাকে বলে টল, ডার্ক, হ্যাণ্ডসাম। যুবতীটিও কম যায় না, ঝলমলে, ডিপ মেরুন পালাজোর সঙ্গে টকটকে লাল টপ, দু-হাতে মেহেন্দি কনুই অব্দি, শাখা-পলা-লোহা, সিঁথিতে সিঁদুর, পিঠে এক ঢাল চুল গল ফ্যাশানের ঢঙে কাটা। এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে বসা আশপাশের মানুষজন সোজা চোখে, আড়চোখে নানাভাবে তাকাচ্ছে। এত সুন্দর নবদম্পত্তি, সবার চোখ কেড়ে নিচ্ছে।

কিন্তু দম্পত্তির সেদিকে হুঁশ নেই। বিচ্ছেদ ব্যথায় কাতর। এত লোকজনের মধ্যেই ওরা পরস্পরের হাতে হাত রেখে বসে আছে। চোখ ছলছল। ‘তুমি কিন্তু বলেছ, ছয় মাস পর আমাকে নিয়ে যাবে’। উজ্জয়িনী খুব নীচু স্বরে বলে, প্রায় কানে কানে বলার মত।

— ‘যদি না নিয়ে যাই কি করবে?’ রাহুল নতুন বউকে রাগাতে চেষ্টা করে।

— ‘পরের বার এসে আর আমাকে পাবে না’। উজ্জয়িনী মৃদু স্বরেই জবাব দেয়।

— ‘বাহ! ছয়মাস পরে আবার নতুন বউ!’ রাহুল মজা পেয়ে আরও রসিকতা জুড়ে।

— উজ্জয়িনী এবার আর কিছু বলেনা। অভিমানে দুফোঁটা জল গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে।

‘এই হচ্ছেটা কি? কথা দিয়েছি নিয়ে যাব। একটু মজাও কি করতে পারবো না? নতুন বউ ছেড়ে যাচ্ছি। আমার ভেতরটা কি করছে তুমি বুঝতে পারছো না?’ রাহুল কাতর স্বরে বলে।

— উজ্জয়িনীর মা এসে বলে, ‘রাহুল বাবাজী কিছু খেয়ে নাও, যেতে যেতে তো আরও বেশ কয়েক ঘন্টা’।

— ‘না, না মা, এই তো কিছুক্ষণ আগে বাড়ি থেকে এতকিছু খেয়ে এলাম’।

রাহুলের বাবা-মা, উজ্জয়িনীর বাবা-মা, রাহুলের একমাত্র ছোট বোন সবাই মিলে রাহুলকে বিদায় জানাতে এসেছে। মা-বাবার একমাত্র সন্তান কৃতীছাত্র রাহুল লণ্ডনে সফট্ওয়ার ইঞ্জিনীয়ার হিসেবে একটা প্রাইভেট সংস্থায় কর্মরত। বিয়ে করে, নতুন বউ বাবা-মার জিম্মায় রেখে ফিরে যাচ্ছে। কিছুদিন পর এসে আবার বউ নিয়ে যাবে।

এই তো সেদিন মাত্র আলাপ, বিয়ে, মাত্র দুই মাস ওরা একসঙ্গে আছে। এরই মধ্যে একটা লোক এত প্রিয় কি করে হতে পারে, উজ্জয়িনীর অবাক লাগছে। এমনও হয়! লোকটার স্পর্শ, গন্ধ ছাড়া কি করে সে বেঁচে থাকবে! ভাবতেই বুকের ভেতরে অসহ্য যন্ত্রণা শুরু হয়ে যায়। তার শরীরে তো কোথাও অসুখ নেই, কষ্ট নেই, সুস্থ শরীর। তবে ব্যথাটা কোথায় হচ্ছে। মনে! এমনও হয়! জীবনে প্রথম মনকে এমন করে উপলব্ধি করেছে উজ্জয়িনী। উজ্জয়িনীর বয়স ২৩, স্কুলে, কলেজে, ইউনিভার্সিটিতে অসংখ্য ছেলেরা তাকে চিঠি লিখেছে, ম্যাসেজ পাঠিয়েছে, নানাভাবে উত্ত্যক্ত করেছে, সে কখনও কারুর প্রেমে পড়েনি। বাবা-মার কোলের কাছে ছোট বাচ্চা মেয়ের মতই কাটিয়ে দিয়েছে এতগুলো বছর। তাই বিয়ে যখন ঠিক করলো বাবা, একবারও না করলো না সে। এক দেখাতেই পছন্দ, ভাল লেগে গেল রাহুলকে। শুভরাতের দিন তার মনে হয়েছিল কত চেনা এই লোকটি, যেন জন্ম-জন্মান্তরের সম্পর্ক। নিজেকে সমর্পণ করতে একটুও বাধেনি তার। এরপর থেকে একটু একটু করে এই মানুষটার সবকিছু কেমন ভাল লাগতে লাগল।

বিয়ের পর দুই মাস হল, এক রাতের জন্যেও রাহুলকে ছেড়ে বাবার বাড়িতে গিয়ে থাকেনি। ইচ্ছেই হয়নি তার। আজ যাবে তাই বাবা-মার সঙ্গে আলাদা গাড়িতে উঠেছে সে। শ্বশুর-শাশুড়ী ননদ অন্য গাড়িতে উল্টো দিকে। গাড়ি ছুটছে হু হু করে আর নিজের পরিবর্তিত জীবনের কথা ভাবতে ভাবতে উজ্জয়িনীর ভীষণ রোমাঞ্চ হচ্ছিল।

বাড়ি গিয়ে সোফায় হাত-পা ছড়িয়ে বসে, মা বলেন, ‘দাঁড়া তোর ফেভারিট নেসকফি করে নিয়ে আসি’। বাবার দিকে তাকিয়ে, ‘তুমি কি খাবে, চা না কফি?’ বাবা বলেন, ‘উজ্জয়িনী যা খাবে, আমাকেও তাই দাও’।

উজ্জয়িনী বাবার দিকে চোখ পাকায়, 'এসব কি বাবা, তোমার নিজের কোন পছন্দ নেই?' বাবা উজ্জয়িনীর মা-কে ডেকে বললো, 'দেখলে তো মেয়ে কেমন পর হয়ে গেল। তার সঙ্গে পছন্দও মেলানো যাবেনা। হা হা হা। অট্টহাসিতে বাধা ঘর ফাটিয়ে দিলেন।

এমন সময় উজ্জয়িনীর প্রিয় বান্ধবী জয়িতার কল আসে, 'বল জয়ি, কি করছিস?'

— উত্তেজিত গলায় জয়ি বলে, 'উজ্জ্বল, তাড়াতাড়ি নিউজ চ্যানেল খোল, এক্ষুনি একটা ফ্লাইট ক্র্যাশ হয়েছে। রাহুলদা কি এই ফ্লাইটেই গেছিল?'

— উজ্জয়িনীর হাত থেকে মোবাইলটা পড়ে যায়, 'বাবা...'

— 'কি হয়েছে মা? কি বলল জয়িতা?'

— 'বাবা প্লেইন ক্র্যাশ.... একটু খোঁজ নাওনা বাবা...'

— অ্যা বলিস কি?

তাড়াতাড়ি টিভি খোলেন প্রতুলবাবু। এয়ারইণ্ডিয়া... ক্র্যাশ। প্লেইনটি পুরোপুরি জ্বলে যায়। আশঙ্কা করা হচ্ছে, ভেতরে কোন যাত্রী বেঁচে নেই। নিউজটা শোনামাত্র বাবা বলে চিৎকার দিয়ে সোফার মধ্যেই কাটা পাঁঠার মত ছটফট করতে থাকে উজ্জয়িনী। রমিলা রান্নাঘর থেকে দৌড়ে আসেন। মেয়েকে জড়িয়ে ধরেন। প্রতুলবাবুকে ধমক দেন, 'এয়ারপোর্টে ফোন কর। নিউজ মিথ্যাও তো হতে পারে। দেখছো মেয়েটা ভয় পাচ্ছে, টিভি বন্ধ কর এক্ষুনি'।

টিভি বন্ধ করে দেন প্রতুলবাবু। তখনই প্রতুলবাবুর মোবাইলে রাহুলের বোন ঋতিকার ফোন আসে' মোবাইল কান থেকে নামিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন প্রতুলবাবু, রমিলা ঝাঁজের সঙ্গে বলে, 'কি হল, কে ফোন করেছিল, কিছু বলছো না কেন?'

— 'ঘটনাটা সত্য, ঋতিকা এয়ারপোর্টে ফোন করেছিল। আমাদের এখুনি যেতে হবে'।

সেই লাউঞ্জ, যেখানে আধঘন্টা আগে উজ্জয়িনী ও রাহুল হাত ধরে বসেছিল। এখনও উজ্জয়িনী সেই পোশাকটাই পরে আছে। সেই সাজ, মেহেন্দি, চুড়ি, পিঠে ঢাল চুল। তবু মনে হচ্ছে বৃন্তচ্যুত একটা ফুল। একদিকে মা একদিকে ঋতিকা ওকে ধরে আছে। রাহুলের মাকে আনা হয়নি, বাড়িতেই শয্যা নিয়েছেন। এখনও ভাল করে কিছুই খবর পাওয়া যাচ্ছেনা, কতজন যাত্রী ছিল, নিহতের সংখ্যা কত, বেঁচে আছে কতজন? ওরা কিছুই বলছে না। ঘটনার পর দুদিন অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। কিছু খবর এখন জলের মত পরিষ্কার। কিন্তু ধোঁয়াশা। প্লেইনটা পুরো জ্বলে গেছে, কেউ বাঁচেনি। একজন মাত্র একজন বেঁচে গেছে, যে বেঁচে গেছে তাকে বারবার দেখানো হচ্ছে। মৃতদের আত্মীয় পরিজনরা সবাই দেহ পাবার অপেক্ষায় দিন গুনছে, কিন্তু ডি.এন.এ পরীক্ষা ছাড়া দেহ সনাক্ত করা যাচ্ছেনা এতটাই পুড়ে গেছে। উজ্জয়িনীকে কিছুতেই বিশ্বাস করানো যাচ্ছে না, সে এখনও ধরে বসে আছে, রাহুল বেঁচে আছে। রাহুল ফিরে আসবে এই বিশ্বাসে সে দিন গুনছে। ঘটনার ভয়াবহতা এমনভাবে আহত করেছে, তাকে বেশীক্ষণ সচেতনে রাখা যাচ্ছেনা, ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হচ্ছে।

উজ্জয়িনীর বাবা ও শ্বশুরমশাই দুজনেই ক্লান্ত, বিধ্বস্ত দৌড়াদৌড়ি করতে করতে। বাড়ির মহিলারা সব অসুস্থ। কেউই ঘটনাটাকে বিশ্বাস করতে পারছে না এখনও। রাহুলের প্রিয় বন্ধু শুভ এসে পাশে দাঁড়িয়েছে।

"বাবা শুভ তুমি না থাকলে যে কি হতো, আমি কোনদিকই মেলাতে পারছিনা, এদিকে রাহুলের মার এই অবস্থা, ওদিকে বৌমাকে সামলানো যাচ্ছেনা। যতক্ষণ দেহ না মিলছে..... হা ঈশ্বর"।

"মেসোমশাই আপনি চিন্তা করবেন না, দুয়েক দিনের মধ্যেই দেহ পেয়ে যাব আশা করছি। আপনি মাসিমাকে দেখুন। আমি ওদিকটা দেখছি।" শুভ এই বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা খুঁজে পায়না।

"বেঁচে থাক বাবা। আমার তো সবই গেল। কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন রাহুলের বাবা। একমাত্র ছেলেকে হারিয়ে তিনি এখন দিশেহারা, সারাজীবনের সঞ্চয় দিয়ে যে ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়ে যোগ্য করে তুলেছেন। এতদিনের লড়াই শেষে মাত্র চাকরি পেয়ে, বিয়ে করেছিল, জীবনটা শুরু করেছিল মাত্র। এ শোক ভুলবার নয়। বৌমার দিকে তাকানো যাচ্ছে না। এই তো সেদিন টোপর পড়ে বউ নিয়ে বাড়ি ঢুকলো ছেলে।

(৩)

হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে উজ্জয়িনী উঠে বসল। সে কোথায় আছে এটাই সে বুঝতে পারছে না। আস্তে আস্তে

ঘরের চারপাশে চোখ বুলাতে লাগলো সে। ওই তো তার বার্বি ডলগুলো কাচের আলমারিতে সাজানো। তার গীটার দেয়ালে ঝোলানো। লাভ শেপের দেয়াল ঘড়ি। সে তো তার ঘরেই আছে। তবে কী তার বিয়ে হয়নি। সব স্বপ্ন ছিল। ভয়ঙ্কর একটা দুঃস্বপ্ন। বুকে থুতু দিলেই ভয় কেটে যাবে। ভয়ের ওষুধ খেলে একেবারেই সেরে যাবে। ছোটবেলায় ভূতের ভয় পেলে মা ডাক্তারদাদুর পুরিয়া ওষুধ খাওয়াতেন। কে বলতে হবে। হঠাৎ নিজের হাতের দিকে নজর যায় তার, শাখা-পলা। শাশুড়ির দেওয়া সোনা বাঁধানো লোহা। হাতে মেহেন্দি আঁকা। শুভরাতের হীরের আংটি জ্বলজ্বল করছে অনামিকায়। তবে কী তার জীবনটা শেষ হয়ে গেল। আর কখনও সে হাসতে পারবে না। ওই লোকটা কি সত্যি বেঁচে নেই। গত দু-মাস ধরে তার অস্থিত্বে মিশে ছিল যে লোকটা সে এই পৃথিবীতে নেই। একবার, একবার তার দেহটা দেখতে চায় উজ্জ্বয়িনী।

বিছানা থেকে উঠে টলতে টলতে ড্রয়িং রুমের দিকে যায় সে। বাবা, মা ও শুভ বসে আছে। রাহুলের পারলৌকিক কাজের আলোচনা চলছে। উজ্জ্বয়িনীকে দেখে ওরা কথা বলা বন্ধ করে দিল। রমিলা বললেন, 'ওমা, মা আমাকে ডাকিস নি কেন, তুই উঠে এলি'।

— 'কেন মা, আমাকে কি আসতে নেই, আমি কতদিন ধরে এভাবে শুয়ে আছি মা'।

— 'তা আজ দশদিন হল মা' রমিলা দেবী মেয়ের দিকে করুণার দৃষ্টিতে তাকালেন।

— 'তুমি ঘরে যাও, আমি তোমার দুধ গরম করে আনছি'।

— 'না মা আমি এখানে বসবো'। উজ্জ্বয়িনী শুভর পাশে এসে বসে। 'শুভদা, তোমরা তো আমাকে ওর দেহ দেখতে দাওনি। আমি শুয়ে শুয়েও সব শুনতে পেয়েছি। আমার মানসিক অবস্থার কথা ভেবে বোধহয় ওরা আমার শাখা-নোয়াও খোলেনি। শুভদা আমি একবার ওর দেহ দেখতে চাই। তুমি আমাকে সাহায্য করবে?'

— প্রতুলবাবু মেয়ের কথা শুনে অস্থির হয়ে পড়েন। 'মা তোর শরীরটা এখনও ঠিক হয়নি। ডাক্তার স্ট্রেস নিতে বারণ করেছেন। তুই ঘরে যা মা। বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়'।

— 'আমি যে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মাঝখানে ঝুলে আছি বাবা। আমার জীবনের সর্বনাশটা আমাকে বুঝে নিতে দাও বাবা'। উজ্জ্বয়িনীর গলা ভেঙ্গে আসছে কথা বলতে বলতে।

— শুভ হাত তুলে মেসোমশাইকে থামিয়ে দিলেন, "আমি দেখছি, মেসোমশাই। উজ্জ্বয়িনী ঠিক কথাই বলছে। ওর একবার নিশ্চিত হওয়া উচিত'।

(৪)

শুভ উজ্জ্বয়িনীকে বাড়ির শোকের আবহ থেকে বাইরে বের করে আনে। উজ্জ্বয়িনী জীর্ণলতার মত শুভর গাড়িতে ওঠে। কিছু জিজ্ঞেস করার ইচ্ছে বা শক্তি কোনটাই যেন আর ওর মধ্যে বাকী নেই। শুভ গাড়ি নিয়ে শহর থেকে দূরে একটা নির্জন জায়গায় আসে। চারিদিকে গাছপালা, দূরে দূরে এক-দুইটা টালিছাওয়া বাড়ি, সামনে একটা মাঠের মত খালি জায়গা। শুভ গাড়ি থেকে নেমে উজ্জ্বয়িনীর দরজাটা খুলে দাঁড়ায়। 'নেমে আস উজ্জ্বয়িনী। চল ওদিকটায় একটু বসি'। খুব স্নেহের সঙ্গে বলে।

উজ্জ্বয়িনী ফ্যালফ্যাল দৃষ্টি নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে আসে। মাঠটার একপ্রান্তে ওরা বসে, নীচে লুঙ্গার মত। লুঙ্গাটা গাছপালায় ঢাকা। দূরে সূর্য ডোবার অপেক্ষায়। সিঁদুরের রঙে রাঙ্গানো সূর্য আজকের মত তার অন্তিম শোভা ছড়াচ্ছে। দুজনে পাশাপাশি বসলো। দুজনেই নীরব। কিছুক্ষণ পর শুভ মোবাইলটা বের করে একটি আগুনে পোড়া কাল কঙ্কালের মত দেহের ছবি উজ্জ্বয়িনীর সামনে মেলে ধরে। 'তুমি দেখতে চেয়েছিলে। না দেখলেই ভাল ছিল। তুব শেষ দেখা'।

উজ্জ্বয়িনী মোবাইলের দিকে তাকিয়ে ভয়ে কাঠ হয়ে যায়। দু-হাতে মুখ ঢেকে ফেলে। শিউরে ওঠে। শুভ তাড়াতাড়ি মোবাইল বন্ধ করে দেয়। উজ্জ্বয়িনীর দিকে দু-হাত বাড়িয়ে দেয়। শুভর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে উজ্জ্বয়িনী কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। শুভ উজ্জ্বয়িনীর পিঠে হাত বুলায়, 'সামনে তাকিয়ে দেখ, অস্তগামী সূর্যের আভা, সূর্য অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে। এই ডুবে যাওয়ারও কি একটা মানে নেই? কাল আবার উঠবে বলেই তো ডুবছে..... যে চলে গেছে সে যে এই কদিনের জন্যেই এসেছিল। তোমাকে যে বাঁচতে হবে। আমি কি তোমার বন্ধু হতে পারি উজ্জ্বয়িনী?'

উজ্জ্বয়িনীর এতক্ষণে হুশ ফিরে আসে যে, এটা শুভ, রাহুল নয়। তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নেয়। সরে আসে শুভর থেকে। শুভ এগিয়ে এসে উজ্জ্বয়িনীর হাত নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে নেয়। উজ্জ্বয়িনী এবার আর হাত ছাড়িয়ে নেয় না, ধরে থাকে অবলম্বনের মত। অস্তগামী সূর্যকে পেছনে ফেলে ওরা এগিয়ে যায় সামনের দিকে।

দেয়াল

বিল্লাল হোসেন

দেয়ালটার সামনে দাঁড়িয়ে হাবিজাবি সব ভাবনা এসে ভিড় করে। কয়েকটা নগদ টাকার গন্ধ বেলি, কামিনীর মতো ম ম করে চারদিক থেকে। নারায়ণ মাথা ঝাঁকায়। এলোমেলো বাতাসের তালে তালে। বুকের ভেতর তখন চাগাড় দিয়ে ওঠে একটুখানি প্রেমও। আর কেউ নয়, কাজলের মা। পেটের যুদ্ধ, ভয়ঙ্কর নৃশংসতার মাঝেও একটুখানি উষ্ণতার ছোঁয়া...।

আবার এক টুকরো কষ্ট বোধও ছড়িয়ে পড়ে হৃদয়ের রক্ত সংবহনে। শৈশবের নরম চোখে দেখেছিল, কয়েকজন মানুষ তিন চোখ খুলে মাথা খাটিয়ে একটু একটু করে গড়েছে দেয়ালটা। গোটা গায়ের মানুষ এসে পড়ে থাকত হুমড়ি খেয়ে। ইস্কুল ঘরতো, সবার অধিকার! চোখ স্থির করে মজা নিত। বালক বেলার কত গল্প কথা, কত কাণ্ড, কত স্মৃতি, মনে পড়ে নারায়ণের। বয়সকালে এই দেয়ালটার রূপেই পাগল ছিল সবাই। চেছে পুছে, প্রলেপ দিয়ে, অসাধারণ কাজ। মাইট্টল করেছিল। সেই দেওয়ালের এখন বয়স হয়েছে। সময় কেড়ে নিয়েছে তার বাহার। গোটা শরীরে এখন মরা রঙের ফ্যাকাসে ছাপ। ঘষা-ছাই আভা, হলদেটে, মাদা-গোলাপি, সবই মাটির আদিম রকম। এর ওপর ছেলেদের পেন্সিল এবং কাঠির অজস্র আঁকিবুঁকি। সরলরেখা, বক্রলেখা, বৃত্তায়ন, হাতির শুড়, মানুষের মাথা-মুণ্ড, গরুর লেজ, বাঘের কেশর, বনসৃজন সে কতো অবয়ব কতছায়া! দাঁড়িয়ে খেয়ালে করলেই অজস্র বোধ ব্যঞ্জনা মূর্ত হয়ে ওঠে। বালক মনের বিচিত্র খেয়াল যে। এসব অচেতন আঁকিবুকির ভেতর গলা ডুবিয়ে মারাত্মক অর্থবোধক হয়ে পড়ে নারায়ণ। ভ্রু কুঁচকে ওঠে তার। আহ্লাদে ডগমগ। ইচ্ছে হয় বইখাতা নিয়ে আবার ছুটে যায় ইস্কুলে। খেলতে খেলতে ফুরিয়ে যাবে দিন। দুরন্ত বালক বেলার নানা অণুঘটনা এসে ভিড় করে।

অতিকায় চেহারার মানুষ এই নারায়ণ। লম্বা গ্রীবা, বকের পায়ের মতো পা, লাঠির মতো হাত, চোখা চিবুক, চিকন-লম্বা নাক। সহপাঠীরা 'ব্যাটা জিরাফ' বলে খেপাত। প্রায়ই লেগে থাকত মারদাঙ্গা। নিজের সঙ্গেই দাঁত বের করে হাসে নারায়ণ। বড় ক্লাসের নগেনের নাক ফাটিয়ে দিয়েছিল একবার দাঁত নড়ে গিয়েছিল। সেদিন এই ঘরের সামনেই শক্ত ধোলাই দিয়েছিল বাবা। পায়ের গোছা ফেঁটে গিয়েছিল। পিঠের এক একটি দাগ ফুলে হয়েছিল তিনটে। গায়ের জখম দেখে বিলাপ করে কেঁদেছিল মা। এই ঘরের প্রতিটি মাটি কণার সঙ্গে জড়িয়ে আছে নারায়ণের স্মৃতির দাগ। খানিকটা নুব্জ হয়ে দেয়ালটার পিঠে দুই হাত ঠেকায় মানুষটা। ডান হাতের তর্জনি দিয়ে টোকা মারে। মনে হয় যেন প্রাণ আছে দেয়ালটারও। চোয়াল বের করে কথা বলবে। মাথা নেড়ে হাসবে। বুকের উষ্ণতা দিয়ে ভালবাসবে। আঘাত করলে যে কষ্ট হবে গো তার। তবু সরাতেই হবে। টুকরো টুকরো করতে হবে নিজ হাতে।

গ্রীষ্মের এই পড়ন্ত বেলায় এলোমেলো বাতাস তীব্র হয়। গাছের নরম মুকুল ঠুকরিয়ে খায় পাখিরা। বুকের ভেতর ঘন হয়ে ওঠে মেঘবাষ্প। আকাশের দিকে চেয়ে মনে হয় কাজটা অতি সস্তায় নিয়েছে সে। অন্যরা এসে আট হাজার চেয়েছিল। ভয় ছিল, বেশি চাইলে পাছে কাজটাই হারায়। কী আর করা যাবে, নিজেকেই নিজে অভয় দেয় নারায়ণ। কাজটা অনায়াসে শেষ করার একটা সূত্রও ভেবে বের করে। মাথায় চড়ে দেয়ালটা ভাঙবে সে। স্ত্রী, মেয়েরা হাতে-হাতে নিয়ে ফেলবে টুকরোগুলো। যেহেতু বাড়ির কাছেই, কাজে অসুবিধে হবে না।

আনত সূর্য নিরুদ্দেশ হতে থাকে ক্রমে-ক্রমে। নেমে আসে অন্ধকার। আকাশে ভিড় বাড়ে তারাদের। সড়কে গান গায় মাতাল হরিহর। রাতের আনন্দে চামচিকেরা দাঁপিয়ে বেড়ায়, দুরন্ত। ঘরে ফিরে নারায়ণ ঘোষণা করে, কাজটা শেষ হলে সকলকে মাংস খাওয়াবে। মেয়েদের ভাল জামা নেই। একটি করে জামা আর বাকি টাকা থাকবে কাজলের মা'র কাছে। সংসার চালাবে। উৎসাহে কিচির মিচির শুরু করে শিশুরা। কোরাসে জানতে চায়, "কহন ধবরা বাবা কাম?" লম্বা গ্রীবা নাড়ে নারায়ণ, সবুর কর, সবুর কর।

মৃত্যুর সামনে দেয়ালটার মন ভাল নেই। বুকের

ভেতর যে হাত-পা নেড়ে স্বৈরিণী হয় বুকের কষ্টগুলো। নারায়ণ টের পায় তার ভালবাসার বাঁধন কত তীব্র ছিল এই দেওয়ালের সঙ্গে। "পৃথিবীতে বুঝি কষ্ট ছাড়া কিছুই নাইগো?" বিড়বিড় করে নারায়ণ। শূন্যে দৃষ্টি বিস্তার করে। মাথার ওপর পাঁচখানা মেয়ে। লোকের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ সইতে হয়। কিন্তু নারায়ণের যে চোখের তারা। ঈশ্বর দিছেন। একটা পোলার আশায়...। হোক, ভগবানের কৃপা, নারায়ণ ভাবে। গোটা দিন খেটে যখন বাড়ি ফিরে, মেয়েরা চারপাশে এসে দাঁড়ায়। কেউ জল দেয়, কেউ হাত বুলোয় পিঠে, কেউ কোলে ওঠে বসে। মন ভরে যায়। শরীর জুড়োয়। একে একে একদিন চলে যাবে সবাই। এভাবে পাখির কলতানে আর ডাকবেনা কেউ। দেয়ালটার সামনে নারায়ণ জপে, নারায়ণ, নারায়ণ।

একটা ঘূর্ণি বাতাস এসে নারায়ণকে ঘিরে পাক খায়। একটা কুকুর এসে আকাশের দিকে মুখ তুলে বিলাপ শুরু করে। একটা শাবল নিয়ে দেওয়ালের চারপাশে ঘোরে নারায়ণ। কোন দিক থেকে কাজটা শুরু করলে সুবিধে হবে ভাবতে শুরু করে। শাবলের চোখা অংশ দিয়ে ঘাই মারে। কারিগরের অসাবধানবশত দেয়ালটার কোনো অংশ ফাঁপা কিংবা দুর্বল আছে কিনা খুঁজে বের করারচেষ্টা করে। বিড়ির তেষ্টা পায়। দেওয়ালের পূর্ব-উত্তর কুনোয় দাঁড়িয়ে দেশলাইটা বের করে লুঙির ভাঁজ থেকে। খট্ করে মাথায় আটকায়, এদিকটাই হয়তো একটু ফাঁপা হবে। প্রকৃতিগত ভাবেই এই কোণে রোদ ও বাতাসের ঝাপ্টা একটু কম লাগে। নারায়ণের স্বপ্ন আর কল্পনার মিশেল রঙে ঝিকিয়ে ওঠে দেয়াল। চোখের সাদা-কালো এবং ভাবনার রঙ মিলে-মিশে একাকার হয়ে যায়। দেওয়ালের রঙ পড়ে তার চোখে। চোখের সাত রঙ পড়ে দেওয়ালে। বিস্ময়কর এক রঙের খেল। সেই রঙে উদ্ভাসিত হতে শুরু করে নারায়ণের বিবেক প্রান্ত। এমনি করে সন্ধে হয়ে যায়। ঝনঝন করে বেজে ওঠে কাসর ঘন্টা। আঁধারে ঝাপসা হতে শুরু করে দেয়াল। গুণগুণ করে গেয়ে ওঠে নারায়ণ। এরপর বড় গলায়, "ভ্রমর কইঅঅ গিয়া আআআ...।"

হৃদয়ের গহীনে দোলা দেয় অচেনা এক প্রেম। ঘরে ফিরে বিনা কারণে সকলকে তাড়া দেয়। প্রস্তুতি সেরে ফেলতে চায় রাতেই। সকালে কাজের সময় এটা-সেটা না পেলে মেজাজ ধরে রাখা যাবে না। মেয়েদের ডাকে, 'রিনা', কাজল কই তোরা? শাবলটা দেখতো মা। গাইতিটা আছে কিনা ঝাপের কাছে। কোদালটা দে একটু ঠিকঠাক করে রাখি। খলবল করে সবাই ছুটে আসে বাবার কাছে। ভোর রাতে ভেসে আসে আজানের শব্দ। একটা ট্রেন ভাঙা গলায় বাঁশি বাজায় কয়েকবার। সঙ্গে সঙ্গে স্টেশন ছাড়তে শুরু করে। নারায়ণের ঘুম ভাঙে সবার আগে। তখনও শেষ হয়নি রাত। তবে অন্ধকারের সেই ঘনত্ব নেই। ঘুম থেকে ডাকে কয়েকটা পেঁচা। যেন ভয় দেখিয়ে দূর করবে যত অন্ধকার। ঝেড়ে, কেশে বাইরে এসে দাঁড়ায় নারায়ণ। দক্ষিণ দিক থেকে এক ঝাঁক কোমল বাতাস এসে শরীর স্নিগ্ধ করে যায়। আকাশের দিকে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে তার মনে হয়, আজব এক ছায়া পৃথিবী। জন্ম এবং মৃত্যুর বিপরীত ভাবনা তখন তাকে কাবু করে। হিজিবিজি সব অনুভূতির ছোবলে ব্যতিব্যস্ত হয়। প্রকৃতির মায়া স্পর্শে তার অন্তঃস্থল মিহি হয়ে গুলে যায়। মৃত্যুর কথা মনে পড়ে কেবল। চোখের বিন্দুতে স্থির অন্ধকার। পৃথিবীকে মনে হয় বিস্ময়কর এক রাত্রি-রমণী। এই মহারহস্যের জঠরে নিজে যেন একা, অসহায়, অবাঞ্ছিত...। বৃথাই আসা যাওয়া এই জগৎ সংসারে। শেষ রাতের শরীর কাঁপে বুকে স্পন্দনের মতো। নারায়ণের মনে হয়, অন্ধকারে ডুবে যাবার ভয়েই হয়ত একদিন আলো জ্বালতে শিখেছিল মানুষ।

পূবের আকাশ ফর্সা হতে শুরু করে। নিজের সব গ্লানি, ব্যর্থতা ভুলে নিজেকে আলোয় রাঙাবার স্বপ্ন দেখে নারায়ণ। সেই সোনালি আভা তার বিচিত্র ভাবনাকে মুহূর্তেই ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেয়। তার রক্তে অনুরণন তোলে সাংসারিক দায়ভার। হাত-পায়ের পেশি নিশপিশ করে। তার লম্বা লম্বা, লিকলিকে আঙুলে চমৎকার এক অনুভূতি। খুব শিগগিরই শাবল, গাইতি চায়। ভেঙে সব একাকার করে দেবে। কাজের অধীর আগ্রহ একধরণের পাগল করে তোলে নারায়ণকে। চারদিকে তেজ বিস্তার করে সূর্য। অলোময় আভায় ভরে যায় পৃথিবী। নারায়ণের ঘর আজ সাজো সাজো। সে তার পেশি ফুলিয়ে তাড়া দেয় সকলকে, চল চল, সুয্যডা রাইগ্যা ওঠনের আগেই...। যা রইদ, ওফ! সব রাগ ঢাইল্যা দিছেন ভগবান। নারায়ণ হাত, পা কাঁপায়। চোখ আরও বড় করে দেওয়ালের কোনো ছেদরেখা খোঁজে। সহসাই কাজের একটা ছন্দ পেয়ে যায়। ওপর থেকে বড় বড় টুকরো বের করে। মাটিতে পড়ে ভাগ হয়ে, ছোট হয়ে যায়। একটু একটু করে কমতে থাকে দেয়ালটা। একদিন আগেও এর সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে কসাই মনে হয়েছিল

নারায়ণের। যেন নিজের শৈশবকে ভেঙে খান খান করার কাজ নিয়েছে। আজ তার চোখে ভয়ঙ্কর পাশবিকতা। দেয়ালটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সরিয়ে ফেলতে চায়। নির্মমভাবে কোদাল, শাবল, গাইতি চালায় সে যখন যা লাগে। বিনষ্ট করার অদ্ভুত এক স্বাধীনতা তাকে আচ্ছন্ন করে। সিংহের চোখে চোখ পড়লে যেমন অনুভূতি, তেমন এক সংশয় নিয়ে কাঁপছে দেয়াল। দোপ-দোপ শব্দ করে, হুড়মুড় করে পড়ে মাটি। ওপর থেকে সাবধান করে নারায়ণ 'দূরে থাক, একটু দূরে থাক। গায়ে লাগলেই বিপদ।' মেয়েদের নিয়ে ভাবনার শেষ নেই। 'যদি কেউ ব্যথা পায়! পরের ঘরের অতিথি গো।

এদের দিয়ে এভাবে কাজ করাতে সঙ্কোচ হয়। তবু উপায় নাই যে! মনে পড়ে, একবার কাজ ছিল না। চালের ব্যবস্থা নাই ঘরে। দুমুঠো চাল ধার পাওয়া যায়নি কোথাও। নারায়ণের চোখে জল আসে, মানুষের বিবেকের সামনে পাথরের দেয়াল। টেনে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। এসব ভাবলে বুকে যেন পাথর চেপে বসে। কাজ করতে করতে নিমেশেই দুপুর হয়ে যায়। সময় না হতেই কেউ যেন ডেকে নিয়ে এল।

সূর্য আগুন ছড়ায়। নারায়ণ টের পায়, পিঠ পুড়ে যাচ্ছে। যেন ধোঁয়া উড়ছে। স্ত্রীকে লক্ষ্য করে নিজের সব হেরে যাবার অভিমান, ব্যর্থতার ক্রোধ ঢেলে দেয়, দেখতে পাওনা, রোদ রেগেছে। মাইয়্যাডিরে মাইরা ফালাইবা, নিহি? সংসারে মহিলারা একটু বুদ্ধি খাডান লাগে। খিস্তি মারে, রাগে গজগজ করে। পুড়ে পুড়ে একটু বাতাস বয়। যেন কেউ ছাই উড়িয়ে দিল চারপাশে।

দুপুরে খেয়ে একটু জিরোয় নারায়ণ। একটা আলস্য আচ্ছন্ন করে। মেয়েরা তৈরি কাজের জন্য। ঘুম জড়ানো গলায় নারায়ণ বলে, দিন মজুর মানুষ আমরা। শরীর একটুখানি আরাম পাইলেই অয়। চলচল কামে লাগি। বড় টুকরা নিতে যাইবিনা যেন। এডিতো তোর মা নিব। না পারলে নাইমা আমি সরামু। জানস, আমার বাবা দিন মজুর আছিল, আমার দাদাও, অল্প বয়স থাইক্যাই কামে লাগি। লেহাপড়া না করলে গরীবের ভাইগ্য বদলাইতনা। অইটার দরখার আগে।

নারায়ণ হাসে। ছোট বয়সে একবার একটা বলদ এসে গুতো মেরে পেটে দুটো ঘাঁই করে দিয়েছিল। গলগল করে বেরিয়েছিল রক্ত। ক্ষত চিহ্ন দুটো দেখায় মেয়েদের, 'জানস, হাসপাতাল আছিলাম একমাস। পাড়ার মানুষ ধইরা নিছিল বাঁচতো না। বাবার কাঁন্ধে চইড়া যেই গ্রামে আইলাম, সবাই তাইজ্জব। একটাই কতা, কিরে বাইচ্চা গেলি?' সুযোগ পাইলেই ঠাকুমা'র খাওয়ন চুরি করতাম। বেজায় রাইগা যাইত বুড়ি। চেঁচাইয়্যা কইত, 'শালারে বলদে কাবু করত পারছে না। আর আমি।" কষ্ট পাইয়া মরছিল। খাওয়ন নাই, ওষুধ নাই। সবকটা গরিবের দেয়াল লেখন অই একটাই, বুঝলি। শেষ বেলা কাজ করতে করতে জীবনের অনেক মজাদার গল্প শোনাল নারায়ণ। মেয়েরা দারুণ আনন্দ পেল। কাজটাও হল কথায়-কথায়। বিকেলটা মাদা হয়ে আসে এক সময়। নারায়ণ ওপর থেকে হাঁকে যাঅ, তোমরা যা'অ। এই দেয়ালটা ফালাইয়া আমিও আইতাছি। নিচে নাইম্যা গাইতি দিয়া কয়েকটা ঘাঁ মারলেই এই অংশটা পইড়া যাইব। এরপর নিচে দাঁড়াইয়া ছোট-ছোট টুকরো কইরা দেমু। কাজলের মা একটু আপত্তি করে, তুমিঅ আইঅ। আজ সবাই জিরাই। কথা শুনেনা এক রোখা নারায়ণ। সূর্যটা ডুব দেয়। সঙ্গে সঙ্গে চাঁদ। খুব একটা অন্ধকার নয়। নিচে নেমে একটা বিড়ি ধরায় নারায়ণ। দক্ষিণ দিক থেকে ফুরফুর করে বাতাস বয়। এ বেলা বাতাস আর পোড়া নয়। কেউ যেন সুখ শান্তি মেখে পাঠিয়ে দিল। নিজের মতোন করে গলা ছেড়ে একটা গানে টান দেয় নারায়ণ। বিড়িতে সুখটান দিয়ে শেষ টুকরোটা ছুড়ে ফেলে। গাইতি দিয়ে দেয়ালটার পশ্চিম অংশে নিচের দিকে কোপাতে শুরু করে। ক্ষিপ্তগতিতে। নারায়ণ স্থির করে এটা ফেলেই আজকের মতো কাজ শেষ। সন্ধে পুজোর সময়। চারদিকে জ্বলে ওঠে আলো। কাজটা বেশ লাগছে। পেশির ভাঁজে ভাঁজে যেনো আগুনের স্রোত ঢেউ খেলছে। সেই আগুনে ক্রমশ ফুরিয়ে আসে দেওয়ালের বাস্তবিক অস্তিত্ব। অন্তত পঞ্চাশ বছর সে জমিয়ে রেখেছিল এই মহৎ পীঠস্থান। তাকে আজ সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে সমস্ত দায়িত্ব থেকে। মৃত্যুর মুহূর্ত গুনছে। একটার পর একটা কোপ দেয়ালটার ভিত আলগা করে দেয়। একটু বাদেই প্রবল ক্রোধে হুড়মুড় করে পড়ে। পৃথিবীর নষ্ট সব মানুষের পাথর বিবেকের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে যায় দেওয়ালের মাটি হৃদয়। নারায়ণকে চেঁপে ধরে সমস্ত জড় শক্তি দিয়ে। কেবল একটা ব্যর্থ গোঙানি চিৎকার, "আঁ আঁ....।" নেমে আসে ভয়াবহ রাত। নারায়ণের বুকে পোষা স্বপ্নগুলো মরদেহ সাজায় জোনাকির কান্না ভেজায় রাতের অন্ধকারে।

আমার মা

জীবনানন্দ দাশ

আমার মা শ্রীযুক্তা কুসুমকুমারী দাশ বরিশাল শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলকাতায় বেথুন স্কুলে পড়তেন। খুব সম্ভব ফার্স্ট ক্লাস অবধি পড়েছিলেন, তার পরেই তাঁর বিয়ে হয়ে যায়। তিনি অনায়াসেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় খুব ভালোই করতে পারতেন, এবিষয়ে সন্তানদের চেয়ে তাঁর বেশি শক্তি ছিল মনে হচ্ছে।

পঁচিশ, ত্রিশ, চল্লিশ বছর আগে আমাদের বরিশালের বাড়িতে পরিবারের লোকসংখ্যা অনেক ছিল। জেঠিমাকে ও মাকে সারাদিন গৃহস্থালির কাজকর্মে ব্যস্ত থাকতে দেখেছি। তখনকার দিনে পরিবারের অবস্থা বিশেষ সচ্ছল ছিল না। কিন্তু জেঠিমার ও মা'র অক্লান্ত কাজকর্মে এবং ওপরে ঠাকুরমার তদারকে কত বিরোধী অস্বভাবী অবস্থার ভিতর দিয়ে কী রকম সহিষ্ণু, নিরলস ও সার্থকভাবে সংসারের কাজ সম্পন্ন হত, সেকথা ভাবলে আজ আশ্চর্য হয়ে থাকতে হয়।

খুব সকালবেলা-শীতকালেও খুব ভোরে — তাঁরা ঘুম থেকে উঠতেন এবং অনেক রাত্রে সংসারের কাজকর্ম সেরে ঘরে আসতেন। কোনও রেহাই ছিল না। রেহাই তাঁরা পাননি, পরিশ্রমকে ভয় করতেন না, কর্তব্যবোধ পরিপূর্ণভাবে সজাগ ছিল, দায়িত্বকে এড়াবার কথা তাঁরা ভাবতেও পারতেন না — আরাম বিরাম কাকে বলে সেকথা তাঁরা নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতায় অনুভব করে দেখেননি, শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য কী জিনিস — সেকথা ভাববার অবসর ছিল না। নিজের স্বকীয় সংসারের জন্য ঠিক নয় — একটা প্রকাণ্ড বড় বিমিশ্র সংসারের জন্য — যেখানে প্রায়ই অতিথি আসত শত শত, পরিজন আসত বহুল পরিমাণে — সেই বৃহৎ বিমিশ্র সংসারের কাজে দাক্ষিণ্য ভরসায় ভরপুর অক্লান্ত সেবিকার মতো নিজেদের নিয়োজিত করে রাখতেন।

মনে পড়ে বরিশালের শীতের সেই রাতগুলো, যখন খুব ছোট ছিলাম, প্রথম রাতেই চারিদিক নিস্তব্ধ হয়ে যেত — আমাদের পড়াশোনা, খাওয়া-দাওয়া শেষ হত। বাবা বাতি জ্বালিয়ে অনেক রাত অবধি লিখতেন। টের পেতাম মা রান্নাঘরে আছেন। সংসারের শেষ মানুষটির খাওয়া-দাওয়া সাঙ্গ হলে তবে তিনি ঘরে ফিরতেন। কিন্তু যতই রাত হোক না কেন, মা ঘরে না ফিরলে দু'চোখ ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে আসলেও ঘুম প্রতিশোধ করে জেগে থাকতে চাইতাম। মা ঘরে এলে তবে ঘুমোব। খুব দেরিতে আসতেন, চারিদিকে শীতের রাত তখন নিথর, নিস্তব্ধ, আমাদের বাড়ির থেকে খানিকটা দূরে নারিকেলবীথির ভিতর থেকে বাজকুড়ুল পাখি ডাকত, প্রহরে-প্রহরে সেই পাখি দু'টো — বরিশালের শীতের শিয়রে অনন্ত অন্ধকারে দেবযানী আমাদের সঙ্গে। মা ঘরে এসে ঘুরতেন-ফিরতেন এবং সেবা করতেন — দূরে পাখির ডাক — আমি এখনও জেগে আছি কেন — কত দূর কী পড়াশোনা করেছি জিজ্ঞেস করতেন। ঘুমিয়ে পড়তে বলতেন। বাইরে পৃথিবীর অন্ধকার অঘ্রান-পৌষের শীত। ভয় পেতাম কোনো পড়শির বাড়ির লোক ডাকতে আসতে পারে — কারু মারাত্মক রোগ হয়েছে হয়তো কোনো দুঃস্থ পরিবারকে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে তাদের আশ্রয় থেকে, হয়তো কোনো নিম্নশ্রেণির লোকের মৃত্যু হয়েছে, হয়তো কোনো অনাথ স্ত্রীলোক বিশেষ কারণে বিপন্ন, হয়তো কোনো প্রতিবেশীর ঘরে ছেলেপিলে হবে — মা'র কাছে খবর এসে পৌঁছুলেই তিনি চলে যাবেন, সারারাত বাড়িই ফিরতেন না হয়তো আর। জেগে বা ঘুমিয়ে একাই পড়ে থাকতে হবে আমাদের। বাইরের থেকে এরকম কোনো ডাক না এলে মা প্রদীপের পাশে সেলাই করতে বসে যেতেন হয়তো, কিংবা সমস্ত দিনের শেষে দু'চারটে পত্র-পত্রিকা বই নিয়ে বসে পড়তেন। মায়ের মুখচোখের সামনের সেই প্রদীপটির দিকে তাকিয়ে শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়তাম।

সেই বয়স — তখনকার সেই মা — প্রথম মহাযুদ্ধর গোড়ার দিকের সেই অপেক্ষাকৃত নির্দোষ পৃথিবী — আজ মনে হচ্ছে কোনো পীস কনফারেন্সই মানুষের বিক্ষিপ্ত জীবনে সেই অনবতুল সমাবেশ ফিরিয়ে দিতে পারবে কি আর ঃ ফিরিয়ে দিতে যাচ্ছে তো — কিন্তু সর্বান্তকরণে নয়। মূল্যচেতনায় বিশুদ্ধি হচ্ছে, মনীষীদের ও দিকনিরুপকদের মনে ও কাজকর্মে এরকম দাবি চারদিক থেকেই খুব বিশেষ ওজনের সঙ্গে ঘোষিত হচ্ছে, কিন্তু হৃদয় কি নির্মল ও নিঃস্বার্থ হচ্ছে, হৃদয়ে স্বার্থের ও রিরংসার অবলেশ কেটে না গেলে কি আর শান্তি আসবে জাতির বা মানুষের জীবনে, চল্লিশ বছর আগে জীবনে উপকরণ-আড়ম্বরের এরকম বিষম অষ্টপ্রাহরিক সর্বস্বতা ছিল না, কর্ম বলে যাকে আধুনিক পৃথিবীতে প্রকাশ করা হয়, কিন্তু যা সত্যিকারের কর্ম সত্যিই নয়, বাস্তবিকই অকর্ম, সে সব জিনিসের বাড়াবাড়ি নিয়ে অপরিমেয় ব্যস্ততা ছিল না, মূল্যচেতনা শুদ্ধ না হলেও আজকের অনেক প্রোথিত মূল্যচেতনার চেয়ে শুদ্ধতর ছিল — এবং আমার মায়ের মতন লোকেদের হৃদয় ঠিক ছিল, সে জন্যে তাঁদের সংস্পর্শে এলে একটি শান্ত উন্নত পরিমণ্ডলের ভেতর প্রবেশ করবার সুযোগ পাওয়া যেত।

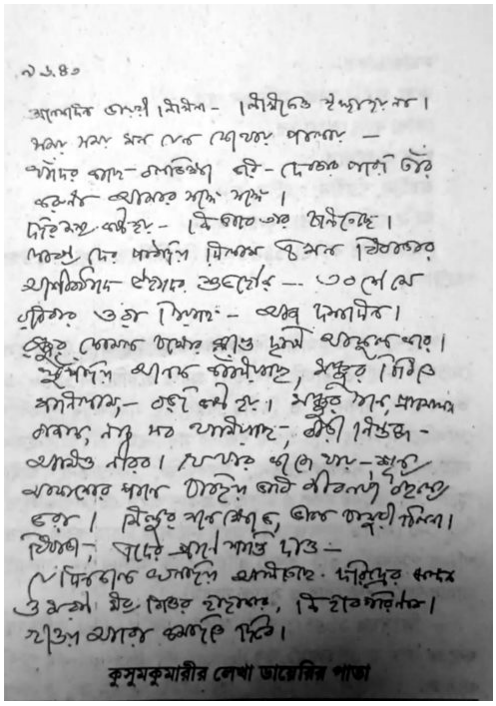
কুসুমকুমারীর লেখা ডায়েরির পাতা

আজ অনুভব করি যে, তাঁদের নানা বিজ্ঞানের ভূষণ ছিল না, কিন্তু মহত্তর মর্মজ্ঞান ছিল, তাঁদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল না, কিন্তু সকলের জন্য যতদূর সম্ভব হিতাকাঙ্ক্ষা ছিল।

ভাবনা-বেদনা-সংকল্প-স্বপ্নের কোনও ক্ষয়প্রাপ্তির হাতে, ইতিহাসের অন্ধকার ক্ষমতার হাতে মা নিজেকে কোনোদিন সমর্পিত করতে যাননি। যে বড় ভূমিকা তাঁর পাওয়া উচিত ছিল সংসারে, সে পটভূমি পাননি তিনি। কিন্তু, তা হলে কী হবে, তিলধারণের মতো তুচ্ছ ভূমিকায় দেখিয়েছেন ব্রহ্মাণ্ড প্রতিফলিত হয়ে উঠতে পারে।

আমরা তাঁর সন্তান — ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করে বেরিয়েছি অনেক দিন হতে চলল। কিন্তু কার কাছে শিক্ষা পেয়েছিলাম আমরা? আমি অন্ততঃ? তিনজন মানুষের কাছে। একজন বাবা, একজন মা, আর একজন ব্রজমোহন স্কুলের হেডমাস্টার আচার্য জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। বরিশালের স্কুল থেকে পাশ করে বেরিয়ে অনেক বড় বড় কলেজে পড়েছি, ইউনিভার্সিটিতে পড়েছি, কিন্তু আজ জীবনের মাঝামাঝি এসে প্রতিনিয়তই টের পাচ্ছি যে, আমার জীবনের শিক্ষার ভিত্তি এঁদের হাতে গড়া। এক এক সময়ে মনে হয়, মহাঁভারত' এর রচনাকর্তা বেদব্যাস' এর মতো দৃষ্টি নিয়ে এঁরা সবাই শিখিয়েছিলেন আমাকে, আমার জীবনে সে শিক্ষা যদি ব্যবহারিকভাবে ফলপ্রসু না হয়ে থাকে, তা হলে তাঁদের কোনো দোষ নেই, যদি মনোলোক কিছু সার্থক হয়ে থাকে, তাঁ হলে এঁদেরই প্রকাণ্ড দানের ফলে। নানা নামী কলেজের বড় বড় অধ্যাপকদের কাছে পড়েছি বটে, সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, অর্থনীতি সম্পর্কে অনেক অনেক খবর জুগিয়েছেন তাঁরা, কিন্তু বোধের অভাবে সে খবর পরীক্ষার খাতায় পর্যবসিত হয়ে ডিগ্রি দান করে অন্ধকারে বিলীন হয়ে গেছে। জীবনের যা কিছু কাণ্ডজ্ঞান, মর্মজ্ঞান, রসাস্বাদ, যা কিছু লোকসমাজে এষণাশক্তি বা নির্জনে ভাবনা-প্রতিষ্ঠা, যা কিছু mother wit, যা কিছু সংবাদকে বিদ্যায় পরিণত করতে পারে, বিদ্যাকে জ্ঞানে — সমস্ত জিনিসেরই অন্তর্দীপন

বিধিনিয়ম এঁদের কাছ থেকে লাভ করবার সুযোগ হয়েছিল আমার। তাঁর মুখের ভাষা কী রকম প্রাণক্ষরা ছিল, কত লোকগাথাও প্রবাদের যথোচিত সংমিশ্রণে তির্যক ও উজ্জ্বল হয়ে উঠত, বরিশালে যতদিন তাঁর উদ্যম ও কর্মপ্রবাহ অক্ষুণ্ণ ছিল ততদিন তা শুনেছি, বুঝেছি। সে ভাষা প্রকৃতিকে ও প্রকৃতির মতো মানুষগুলিকে নিখুঁতভাবে ধরতে পেরেছিল বলেই অমন সহজ পবিত্রতায় ব্যক্ত হতে পারত।

সমস্ত ইস্কুলের জীবন তিনি আমাদের ইস্কুলে পড়া শিখিয়েছেন সংসারের কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে ইস্কুলি পড়া শেখাবার সুযোগে যে বুনিয়াদ গড়ে ছেন, সেটা ইস্কুল-কলেজের ক্যারিকুলাম' এর সংসারের, সমাজের, দেশের, জীবনের। সে পরমার্থগুলো আজও প্রায় সম্পূর্ণভাবে সত্য। কোনো নিপট দর্শন এসে খণ্ডন করতে পারেনি। মানুষ এতদিন পৃথিবীতে থেকে পৃথিবীকে ভুল বুঝেছে, অথবা নিজের জীবনকে চিনতে পারেনি, এ মত পোষণ করা চলে না। সমাজ ও জীবন সম্বন্ধে অনেক দীর্ঘস্থায়ী — হয়তো শাশ্বত সত্য আবিষ্কার করেছে মানুষ। জীবনে সে সব সত্যের প্রচলন চেয়েছেন সৎ মানুষেরা, মা'ও আজীবন সেই জিনিসই চেয়েছিলেন।

সাহিত্য পড়ায় ও আলোচনায় মা'কে বিশেষ অংশ নিতে দেখেছি। দেশি-বিদেশি কোনো কোনো কবির ও ঔপন্যাসিকের কোথায় কী ভালো, কী বিশেষ দিয়ে গেছেন তাঁরা, এসবের প্রায় প্রথম পাঠ তাঁর কাছ থেকে নিয়েছি। ওয়ার্ডসওয়ার্থ'এর অনেক ছোট ছোট কবিতা তাঁর মুখে শুনেছি এবং শেলি-ব্রাউনিং'এর। বৈষ্ণব পদাবলি থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত আমাদের দেশের কবিদের কাউকে কাউকে মনে রেখে তিনি তাঁর স্বাভাবিক কবিমনকে শিক্ষিত ও স্বতন্ত্র করে রেখেছিলেন।

মা'র বাবা চন্দ্রনাথ দাশ'ও গান ও কবিতা লিখেছেন অনেক। এঁরও দেখেছি অব্যর্থ স্বভাব রয়েছে যা বিশেষভাবে শিক্ষিত ও নিয়ন্ত্রিত হলে কাব্যে প্রকাশিত হয়ে উঠতে পারে — না হলে, অশিক্ষিতপটুত্ব উল্লেখ্য পদ্যে — কোনো কোনো লাইনের বা উপমার উল্লেখযোগ্যতা আরও কিছু প্রগাঢ় হলেও, দাদামশায়ের অনেক লেখা ঈশ্বর গুপ্ত, মধুসূদন, হেম, রঙ্গলাল ইত্যাদিকে মনে করিয়ে দিলেও, তাঁর সফলতার লেখা — বিশেষ করে কয়েকটি গানে, লোকগাথায় ও লোককবিতায় খানিকটা সার্থক উত্তরসাক্ষ্য হিসেবে টিকে থাকবে, মনে হয়। মা বেশি লেখবার সুযোগ পেলেন না। খুব বড় সংসারের ভেতরে এসে পড়েছিলেন যেখানে শিক্ষা ও শিক্ষিতদের আবহ ছিল বটে, কিন্তু দিনরাতের অবিশ্রান্ত কাজের ফাঁকে সময় করে লেখা — তখনকার দিনের সেই সংসারের একজন স্ত্রীলোকের পক্ষে শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয়ে উঠল না আর। কবিতা লেখার চেয়ে কাজের ও সেবার সর্বাত্মকভাবে ভেতরে ডুবে গিয়ে তিনি ভালোই করেছেন হয়তো। তাঁর কাজকর্মের আশ্চর্য নিষ্ঠা দেখে সেই কথা মনে হলেও ভেতরের খবর বুঝতে পারিনি, কিন্তু তিনি আরও লিখলে বাংলা সাহিত্যে বিশেষ কিছু দিয়ে যেতে পারতেন, মনে হয়।

মা'র কবিতায় আশ্চর্য প্রসাদগুণ। অনেক সময় বেশ ভালো কবিতা বা গদ্য রচনা করেছেন দেখতে পেতাম। সংসারের নানা কাজকর্মে খুবই ব্যস্ত আছেন এমন সময়ে ব্রহ্মবাদীর সম্পাদক আচার্য মনোমোহন চক্রবর্তী এসে বললেন, এক্ষুনি ব্রহ্মবাদীর জন্য তোমার কবিতা চাই, প্রেসে পাঠাতে হবে, লোক দাঁড়িয়ে আছে। শুনে মা খাতা-কলম নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে এক হাতে খুন্তি, আর এক হাতে কলম, নাড়ছেন দেখা যেত, যেন চিঠি লিখছেন, বড় একটা ঠেকছে না কোথাও, আচার্য চক্রবর্তীকে প্রায় তখনই কবিতা দিয়ে দিলেন। স্বভাব কবিদের কথা মনে পড়ত আমার, আমাদের দেশের লোক — কবিদের স্বভাবী সহজতাকে।

অনেক আগে, প্রথম জীবনে, মা কয়েকটি কবিতা লিখেছিলেন, যেমন, 'ছোট নদী দিনরাত বহে কুলকলু' অথবা 'দাদার চিঠি' কিংবা 'বিপাশার পরপারে হাসিমুখে রবি উঠে'। একটি শান্ত, অর্থঘন সুস্মিত ভোরের আলো, শিশির, লেগে রয়েছে যেন এ সব কবিতার শরীরে। সে দেশ মায়েরই স্বকীয় ভাবনা কল্পনার স্বীয় দেশ। কোনও সময় এসে সেখান থেকে এদের স্থানচ্যুত করতে পারবে না।

আজকের পৃথিবীর জীবনবেদের তাৎপর্য মা বেশি বুঝেছিলেন, তাঁর গদ্য লেখায় অভিভাষণে সমাজের ও নানা

সমিতির কাজকর্মে লোকসমাজের সঙ্গে লেনদেনে নানারকম বিখ্যাত বইয়ের ও চিন্তা ধারার সঙ্গে পরিচয়ের পিপাসায় ভাবনা-বিচারের আধুনিকতার মর্ম বুঝে দেখছিলেন যখন — তার কিছু আগেই কবিতা লেখা প্রায় ঘুচিয়ে দিয়েছিলেন তিনি, ফলে, যে মহৎ কবিতা হয়তো তিনি লিখে যেতে পারতেন, তাঁর রচিত কাব্যের ভেতর অনেক জায়গাতেই প্রায় আবাস আছে — কিন্তু কোনো জায়গাতেই সম্পূর্ণ সিদ্ধি নেই — মাঝে মাঝে কবিতার ভেতর দু'চারটে বিচ্ছিন্ন সিদ্ধিকে বাদ দিয়ে। গদ্য সন্দর্ভ রচনায়ও একজন সৎ সাহিত্যিকের উপাদান ছিল তাঁর মধ্যে। বাবার ও পিসেমশায়ের অবর্তমানে তিনি বরিশালের ব্রাহ্মসমাজের আচার্যের কাজ করতেন। আরাধনা উপাসনা আশ্চর্য নির্ঝরের মতো ধ্বনিত হয়ে — তবুও ধ্বনিত অতীত অর্থগৌরবের দিকে — আমাদের মর্ম ফিরিয়ে রাখত, কোথাও ঠেকতেন না, তাল কেটে যেত না — পুনরুক্তি ছিল না, কিন্তু যে সাহিত্যিকের ও কবির গরিমা তাঁর প্রাপ্য ছিল, সেটাকে অন্তর্দমিত করে রাখলেন তিনি — প্রকাশ্য কোনো পুরস্কার নিতে গেলেন না। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের লেখায় ও নিজের লিখিত অনুভাবনায়, বিতর্কের ও ধ্যানের ভিতর, কেমন যেন আত্মনিধান খুঁজে পেলেন আত্মশুদ্ধির জন্য।

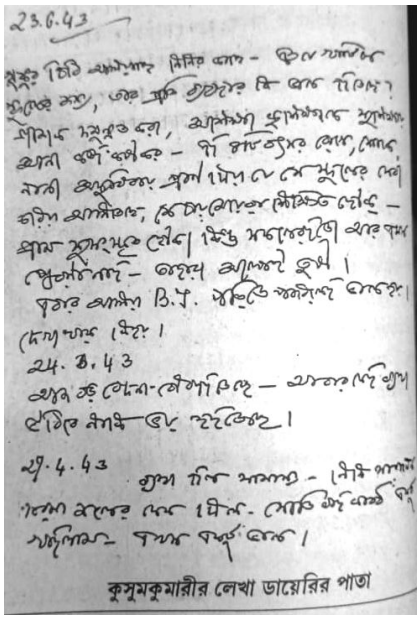

কুসুমকুমারীর লেখা ডায়েরির পাতা

অনেক দিন আগে, চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর, তাঁর ওপর আমি একটা কবিতা লিখেছিলাম। মা নিজে পত্রপত্রিকার পাতায় আমার সেই প্রায় প্রথম জাতক কবিতাটি সম্বন্ধে তাঁর মতামত জানবার জন্য মা'কে এক কপি সাহিত্যপত্র পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। মা আমাকে ফেরত ডাকে লিখলেন ঃ চিত্তরঞ্জন সম্বন্ধে লিখেছ, ভালোই করেছ, কিন্তু রামমোহনের ওপর লিখিতে বলেছি তোমাকে, মহর্ষির ওপরেও। তিনি পড়ে বিক্ষুব্ধ বোধ করেছিলেন — এ যেন ধান ভানতে শিবের গীত। কিন্তু দেশের নানা রকম সাময়িক ঘনঘটাচ্ছন্নতার অতীত রামমোহন যে কত বড় পুরুষ, আমাদের সক্রিয় সচেতন মনে সে অঙ্গীকারের একটি স্পষ্ট জীবনবেদ দেখতে চাইতেন তিনি। অনেক আগে আমার মন বন বড় আদর্শ পুরুষকে তাঁদের উঁচু পীঠস্থান থেকে নামিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে চাইতো তাঁদের সত্যিকারের মূল্য নিরূপণের নামে বিনাশী বুদ্ধিবলে তাঁদের আঘাত করে। মা টের পেয়েছিলেন, বলেছিলেন, ও রকম করে হয় না — আগে তাঁদের মহত্ত্বে বিশ্বাস করো মনের নেতিধর্ম নষ্ট করে ফেলো, শুধু মহামানুষ কেন, যে কোনো মানুষ কতখানি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের পাত্র অনুভব করতে শেখো।

দেশের ও বিদেশের যে সব মহাপুরুষের তালিকা দিয়েছিলেন তিনি আমাকে, অনেক অনুতর্ক - বিতর্কের পরে টের পেয়েছি সত্যিই তাঁরা মহৎ। যেকোনো তুচ্ছ মানুষকে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করতে বলেছিলেন। এখন বুঝেছি, ঠিকই বলেছিলেন। যদিও মায়ের সেই নির্ধারিত পথে মন পবনের মাঝির দল চলেছে যত বেশি, বাস্তব তত সেই অনুপাতে কিছুই হয়ে উঠছে না ব্যক্তির বা জাতির বা পৃথিবীর জীবনে। বিদ্বেষই বেশি, হিংসা কেটে যায় না, সংঘর্ষ নষ্ট করে ফেলতে চায় সব। রোলার মতো, টমাস মান, রবীন্দ্রনাথ, আইনস্টাইন, গান্ধীজীর মতন একজন লোক তবুও আশা করে বসে থাকেন। ইতিহাস চেনে তাঁদের। আমার মা'র মতন একজন মহিলাও আশা করে বসেছিলেন, বিশ্বাস করতেন।

২০২৫ সাল কবি কুসুম কুমারী দাশের ১৭৫তম জন্মবর্ষ এবং তাঁর কবিপুত্র জীবনানন্দ দাশের ১২৫তম জন্মবর্ষ।)

সকৃতজ্ঞ ঋণ স্বীকার:- নন্দন।

সাবধান, বাংলা বলবেন না

মিহির দেব।

সাবধান!
মরে গেলেও বাংলা বলবেন না।
বাংলা বললেই মাতব্বররা
ঠেলে দেবে বাংলাদেশে
'ঘুসপেটিয়া' মানে অনুপ্রবেশকারী
অথবা 'ডীমক' অর্থাৎ উইপোকা বলে।

অবশ্য এমনটাইতো হওয়ার কথা ছিল!
ক্ষমতা হস্তান্তরের দাম হিসাবে
সমগ্র বাংলাই তুলে দিতে জিন্নার হাতে
আপত্তি ছিল না
ভারতের তথাকথিত 'মূল ভুখন্ডের'
তাবড় তাবড় নেতৃবৃন্দের।

লাখো লাখো 'বাঙ্গাল'রা যখন
প্রানের দায়ে,
মা-বোনদের ইজ্জত বাঁচাতে
বাধ্য হয়েছিল 'ভারতে' উঠে আসতে
থাকতে দিতে হয়েছিল তাদের
উদ্বাস্তু নামে নিতান্তই চক্ষুলজ্জার দায়ে।

হ্যাঁ, একথাও বলা হয়েছিল
হিন্দুরা যদি বাধ্য হয় উঠে আসতে
এপারে, স্বাধীন ভারতে,
ভারতের নাগরিক বলেই
মেনে নেওয়া হবে তাদের।

তারপর একে একে
পেরিয়ে গেছে সাত সাতটি দশক।
পুরোনো সেই সব কথা
এখন তামাদি হয়ে গেছে।
বাংলাদেশী বলে তাড়িয়ে দেওয়ার
এখনইতো সুবর্ণ সুযোগ।

জীবন যে রকম

আশীষ চট্টোপাধ্যায়।

সকাল ঝরছে, বিকেল ঝরছে
বসন্তে ফুটন্ত শরীর থেকে
তবু বেঁচে আছি
আজও বেঁচে আছি ...

বেঁচে আছি চৈতালি মেঘের উন্মত্ত বিচরণে
বেঁচে আছি গ্রীষ্মের বারুদ বাতাসে
বেঁচে আছি তরঙ্গ ছুঁই ছুঁই জলে
আর শ্যামল ঘাসের কবিতায়
বেঁচে আছি ভালবাসার কোমল মনে
সুজনের মরু হৃদয়ে
এবং বেঁচে আছি শরীরের নোনা ঘামে
বেঁচে থেকে থেকে
বকুল গন্ধে টের পাই অনাবিল পৃথিবীর আকর্ষণকে

বিকেল ঝরছে, সকাল ঝরছে
তবু আছি বেঁচে
আজও জীবন যে রকম, তাই আছি ...

বদলে গেছে

বিশ্ববন্ধু সেন

পৃথিবী আজ বদলে গেছে
বদলে গেছে তার রূপ রস গন্ধ
হারিয়ে নি:শেষ হয়ে গেল তার
মাতৃস্নেহের শীতল বাতাস।
স্বর্গ মর্ত পাতাল খুঁজেও তার মাধুরীর
দেখা মেলেনা —
প্রথদিনের নিঃশ্বাসের সাথে
আজ মনে হয় বিষবাষ্প হৃদয়ে ঢুকছে
সইে পরশ আর সিগ্ধতা এনে দেয় না।
পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জীবেরা
আজ আরও অনৈতিক, অশুভ হয়ে
উন্মত্ত লীলায় মত্ত —
স্বার্থপরতার শেষ লগ্নে চেতনাহীন হয়ে
আরও আরও কামনায়
প্রাণহীন শবের সাধনায় নিমগ্ন —
শেষ লগ্ন কি সমাগত?
উত্তর কোথায়? কে দেবে?
চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-তারা আজ নীরব দর্শক
সুখ আজ পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে
মুখ লুকিয়েছে —
শান্তি পরাভূত অশান্তির কুচক্রীর হাতে
আলো অন্ধ কারাগারে বন্দী—
গীতার শ্রষ্টা কি আজ আবার আসবে?
যদা যদা হি ধর্মস্য ...সম্ভবামি যুগে যুগে
আশায় দুবাহু উর্ধ্বে তুলে
উর্দ্ধ নয়নে তাকিয়ে।

মানুষ যাচ্ছে কাঁহা

বিপ্লব উরাং

আসলে মানুষ যাচ্ছে কাঁহা?
হিংস হচ্ছে দিনকে দিন।
বোঝ জ্ঞান সব হারায় যাচ্ছে
সাজছে এখন হিংস দানব।

দিনের বেলা চখের সামনে
ইজ্জত ছিনে লিচ্ছে কেউ।
থরা দোষে জ্ঞান শূন্যে বেধরক
পিটে মরায় দিচ্ছে নিরপরাধ মানুষটাকে
অন্য সবে ভালে থাকে।
বলবেক কিছু ভাবছে খালি।
বলতে কিছু পারছে নাই ।

এমনত কখন নাই ছিল হে
এখন ক্যানে হচ্ছে এমন।
আসলে মানুষ যাচ্ছে কাঁহা
ভাবছি বসে সরাক্ষণ।

নদী তো সেই একই থাকে

দিলীপ দাস

নদী তো সেই একই থাকে
একই রকম একা
সকালবেলা জোয়ার এলে
বিকেলে সব ফাঁকা।

কখনো বা জোয়ার আসে
ঠিক সন্ধ্যাবেলা
উথাল জলে তারার কাঁপন
রঙিলা রঙিলা।

নদী তো সেই একই থাকে

জীবন যেমন একা
কখনো তা সোজা চলে
কখনো বা বেঁকা।

উৎসব

স্বপন মজুমদার

উৎসব আসে, উৎসব যায়,
দিয়ে যায় কিছু বার্তা,
কলরব হয়, কলরব শেষে,
পরিবেশে নামে বিষন্নতা।

সময় ও জীবন, আসে আর যায়,
নিজের মত করে,
সম্পর্ক হয়, সম্পর্ক ভাঙে
সময়ের হাত ধরে।

যৌবন শেষে, বার্ধক্য আসে
সময়ের তালে তালে,
গোধূলি বেলায়, ভেসে ওঠে সব,
থাকে যা, স্মৃতির অন্তরালে।

অপ্রকাশিত

সুব্রত তলাপাত্র।

কিছু একটা লিখে দেবো ছাইপাঁশ
এমন ভেবেই লিখতে বসে যাই
মনোজগতে ছায়া হয়ে যা যা ঘোরে
যেন তাদের অবয়ব খুঁজে পাই
সেই চেষ্টায় চুল ছিঁড়ে, মাথা খুঁড়ে
যে অনুভূতিরা সামনে দাঁড়ায় এসে
কথা হয়ে তারা, প্রকাশিত হতে চায় না
শুধু ঘোরে ফেরে গোপন ছদ্মবেশে
ওরা বন্ধুকে শত্রু দেখতে চায় না
নিন্দুক হয়ে উঠতে ভীষণ ভয়
পরিস্থিতির দাবি যদিও বোঝে
তবু কিছু কথা স্পর্শকাতর হয়
সময়ের কথা সময়ের হাত ধরে
বেরিয়ে আসেই যত চেপে রাখো তাকে
আগুন ঢেকে রাখলেও তবু দেখো
ধোঁয়ার গন্ধ পৌঁছেই যায় নাকে
এসব দ্বিধা নিয়েই কথার জন্ম
দুঃসময়ে, দ্বন্দ্বই তার সাথী
তীর হয়ে ওঠা যদিও স্বপ্ন ছিলো
ঢাল হয়ে, উঠেছে সে রাতারাতি
আপ্তবাক্য তবু অস্ফুট স্বরে
সাবধানবাণী করছে উচ্চারণ
জীবন রক্ষার প্রধান শর্ত এক
শত্রু-মিত্র ভেদজ্ঞান, বিভাজন
অস্তিত্বের পোষাক নয় দেখেও
কোন নীতিবোধে সবদৃষ্টি রাখা
যাদের কাছে প্রতিটি জীবন দামী
যোগ্য তারাই আস্থার, যায় দেখা
কোমল কিছু অনুভূতি বয়ে নিয়ে
দূর দিগন্তে হেঁটে যায় কেউ একা
দু'চার পলক চোখ তুলে তাকে দেখে
ক্ষণিকের কিছু মুহূর্তেরাও নীরব
বুকে থাকলেও, কখনো আসে না মুখে
লিখতে চাইলে দেয় না তারা ধরা
নিভৃতে বাঁচে, অপ্রকাশের সুখে।

স্নানঘর

শঙ্খ সেনগুপ্ত

কথার ভেতর জেগে উঠলো মুখ
মুখের ভিড়ে হারিয়ে গেলো কথা।

মাথার ভেতর তোলপাড় - কে
নাড়লো, খোলা দরজায় কড়া?

চৌকাঠ থেকে ফিরে গেলো কোন
সে বাঁক! কোন সে মনীষা?

আকাশে খুলে খুলে রাখা আমিকে
কে তুমি গুছিয়ে রাখো, অসময়ে?

দু'হাত জুড়ে মেখে নিলাম সাবান,
আয়না জুড়ে কেবল সাদা, শূণ্যতা।

পুরনো কাগজ

সঞ্জীব সিন্‌হা

এক ছাপাখানা অফিসের কোনায়
কিছু অনির্বাচিত প্রবন্ধ আর
কিছু নাছাপা অবহেলিত কবিতা
করেছে ঘর এক পাহাড় ধুলোয়।

আজ সাত দশক হলো পদপিষ্ট বসন্ত
আর শুকনো পাতার মতো শ্বাস রুদ্ধ
কিছু বর্ণমালার অভিমান, মৃত্যু সজ্জায়,
দিন গুনছে শূন্য হিয়ার নিষ্প্রাণ পৃষ্ঠায়।

মেকি মানবিকতার যান্ত্রিক শহরে
আজ বিক্রি হবে কিছু ভালোবাসা,
কিছু ভাবনা, পুরোনো কাগজের দামে
শুনছো - পুরান কাগজ, পুরান কাগজ

জাতীয় সড়ক

মৃদুল দেবরায়

আজ প্রচন্ড গরম

আবহাওয়া অফিস মতে, বৃষ্টি হবে
আগামীকাল...

নিচে প্রচন্ড কোলাহল
গতকাল-এই সময়টায় নিরবতা ছিলো

গতকাল-বাস কন্ডাকটর, ভাড়া চায়নি
নিজে থেকেই দিতে হয়েছে

আজ ঘুমে ছিলাম, কিনারে সিট-ঠান্ডা বাতাস-
স্বপ্ন দেখছিলাম...

সময়কে থামতে বলো

শুভাশিস কর

সময়কে থামতে বলো,
দুটি হৃদয় এখন কথা বলছে —
নিঃশব্দে, ধ্বনিহীন অথচ গভীর,
যেন চিরসবুজের গোপন আলাপন।

পরস্পরকে টেনে আনে কাছে,
দৃষ্টির ভেতর লুকানো অক্ষর মিশে যায়,
স্পর্শের ভেতর জন্ম নেয় হাজারো নদী,
যাদের গন্তব্য শুধু মিলনের মহাসমুদ্র।

তারা ভুলে যায় পৃথিবীর বিরামহীন দীর্ঘতা,
ভুলে যায় ঘড়ির কাঁটা, ভুলে যায় ক্লান্তির হিসাব।
কেবল দু'টি নামহীন হৃদস্পন্দন,
এক হয়ে লিখছে অনন্ত কবিতা।

সময়কে থামতে বলো,
আজ এই মুহূর্তের আলোয়,
জন্ম নিচ্ছে এক চিরন্তন।

আমি ও মিছিল

রাহুল সিনহা।

এই যে অযথা তর্ক, চিৎকার ও তিক্ততা,
রোজ রাতে বাড়ি ফিরে ফাঁকা দেওয়াল দেখা
সাদা খাতায়, নতুন কলমে কিছুই লিখতে না পারা,
এরই নাম বেঁচে থাকা? অথবা দিনগত পাপক্ষয়?
এই যে দারুণ সুযোগসন্ধানী চোখ রাজনীতি পছন্দ
করে না, শুধু সারাদিন খুঁজে বেড়ায় নিত্য নতুন
অফার ও ছাড় অথচ, রেশন তুলতে না পারা
রিকশাওলার সঙ্গে দশ টাকার জন্য দরদাম করে
যায়, তার পেছনেও আছে নিগূঢ় রাজনীতি।
বহুদিন মিছিলে না হাঁটা অলস মস্তিষ্কে
এভাবেই বসে বসে এলাকা বাড়ায়
নিজের মতো নিজেকে গুছিয়ে নেবার গান।

যুবকেরা কেমন আছো

সুমন পাটারী।

যুবকেরা,
কেমন আছো?
প্রেমিকা আছে তো বুকে?
বাবা মা, এখনো সম্মান করে?
না বড় বোনের করুণার পাত্র হয়ে উঠেছ
দশ বিশ টাকা গুজে দিচ্ছে পকেটে গোপনে?

যুবতীরা, শখের আংটি কিনতে পারছতো
নাকি এখনো ভাবছ, স্বামী অথবা প্রেমিক
কিনে দেবে সাধ্যমতো,

নতুন পিতা-মাতা যারা হয়েছেন
সন্তানকে কোন স্কুলে দেবেন বুঝতে পারছেন না
গুগল খুলে দেখে নিন কোন্ স্কুলের ফিস্ কত?

বৃদ্ধরা, হাসপাতালে বিছানা আছে কিনা আগে জেনে নিন,
হাসপাতালের বারান্দায় না মরে
ঘরে দেহত্যাগ করতে পারেন কিনা দেখুন,

ড্রাইভার ভাই, গাড়ির বডি দুদিন বাদেই ঢিলে হয়ে যাচ্ছে?
আপনিও গুগল ম্যাপ দেখে নিন কোন্ রাস্তায় গর্ত কত কম

কর্মচারীরা,
আপনাদের তো কেল্লাফতে,
কোনো ট্যাক্স নেই একলাখ মাসে,

নাকে আঙুল দিয়ে ঘুমান!

পুলিসেরা, দেখুন, কে হেলমেট পড়েনি ভুলে
কার পলিউশান নেই
স্পিডমিটার নিয়ে বসে থাকুন রাস্তায়,

তরুণেরা, নেশায় ঢলে পড়ো,
ফাঁক দেখে চুরি কর গ্যাস সিলিণ্ডার,
পুরানো সাইকেল, উঠানের রাবার,

শিক্ষকরা, স্কুলে যাবেন রোজ,
নাবালক নাবালিকা যখন একে অপরকে চুমু খাবে
দেখে মজা নেবেন।

সঠিক যুদ্ধ

খোকন সাহা

প্রবজ্যা নিয়েছি বলে তোমাদের এতো প্রশ্ন?
গাছের দিকে তাকাও প্রতিটি গাছ প্রবজ্যার
ছায়া বহন করে প্রতিক্ষণ।

নদীর দিকে তাকাও, নিজেকে মনে হবে
অনন্ত বলাকা বিরহ।

গতি জীবনের পথ
ভেসে যাওয়ার আগে অগোছালো
সব ভাবনা, নদীর জল আর নৌকা!

নিঃস্ব হতে হতে কবি হয়ে যাই!

স্বপ্নাদিষ্ট

চন্দ্রিমা সরকার।

খুব বেশী দূর নয়।
পাখির পালকে খুঁটিনাটি
গুছিয়ে দিয়ে, হাতির পিঠে
চড়ে আমি আসবো
তোমার বারান্দায়।
তোমার গালে রেখে যাবো
আমার মাটি মাখানো
হাতের দস্তাবেজ।
ঐযে, যেখানে প্রতিরাতে
আমি ঘুমের মধ্যে মরে যাই।
সকালে আবার জোড়াতালি
দিয়ে জেগে উঠি বীরেন্দ্রকৃষ্ণের
আল জিহ্বায়।
যেখানে অবলীলায়
রোদ চশমা পড়া অসুরের
বা হাতের তালুতে রেখে
যাই, আমার স্বপ্নদিষ্ট
সাধুর কমন্ডলু থেকে
বেরিয়ে আসা বোষ্টুমীর
খোঁপায় পেঁচালো ফণীমনসা।

অ নিয়মিত

শুভম বনিক।

ভন্ড স্বদেশ প্রেম ঘৃণা করি, তাই
এই যে নাম মাত্র এসে আবার চলে যাচ্ছে বসন্ত
তাতে অসুস্থ বোধ করছি।
রোজ যে নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে,
জানালার বাইরে থেকে উঁকি মেরে
একবার কুহু করে জানান দিচ্ছে
আমরা সব দেখছি।

এই কবিতায় আমার কোনও সমার্থক নেই,
শব্দগুলোকে নিয়মিত কাঠি করে চলছে
অনিয়মিত কোকিলেরা।
কেন জানিনা
আগে কিন্তু কখনো বসন্তের ভরা যৌবন কালে
নতুন পাতা গজাতে দেখিনি।

জাগো দুর্গা

বিপাশা চক্রবর্ত্তী।

পাহাড় ভেঙে আসছ নাকি
জুড়তে যা সব ভাঙা... চোরা...
জুড়তে পারো ভাঙা হৃদয়?
ভাঙা দেশ বহু স্বপ্নে মোড়া?

"জোড়া" না হয় না-ই বা হল ...
"ভাঙা"-ই যদি পাবলিকে খায়;
বেশ তো না হয় ভাতটা জুড়াক ...
জমছে কাঁকর যাদের থালায়!

জ্বলছে শহর, জ্বলছে দু'চোখ
আর জ্বলে যায় ভাগ্যলিপি;
ডিগ্রিগুলো জ্বলছে চিতায়
মোমে আঁকা খুকুর ছবি।

দুর্গতিদের কোন প্রকারে
তোমার এলেম ফলে ভালো?
লিস্টি করে মেইল করে দাও,
সেইটি না হয় করব ফলো!

ওহ! তুমি তো "ঠাকুর" বটে,
"মা" তো ও জাস্ট ছদ্মনাম!
অসুর তো সেট করাই থাকে ...
ফি'বছর এক পরিণাম!

মাটির পুতুল নিয়ে বিরাগ,
জ্যান্ত অসুর ভোগ সাজায়!
সর্বজনীন নামেই তবে?
ক্যাপিটালের মহিমায়?

রঙচঙা ওই টোপটি ছেড়ে,
নামো না সাদা বাস্তবে ...
"আর কতকাল সইব এ ছল"?
"দুর্গা" জাগবে আর কবে?

সময়ে অসময়ে

শংকর ভট্টাচার্য

অনেকগুলি প্রতিশ্রুতি নিয়ে —
স্বপ্ন-মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে,

এক-একটি দিন আসে।
ঘুচে যায় জন্ম-মৃত্যুর ব্যবধান —
বয়ে যায় দিন যাপন।

সময় এসে গ্রাস করে অতৃপ্ত বাসনা,
ছোট ছোট সুখ-শোক
মিলে যায় দিগন্ত রেখায়।

তবুও এক একটি দিন আসে —
হলুদ স্বপ্নমাখা রাত পেরিয়ে,
নতুন ভোরের প্রতিশ্রুতি নিয়ে —
সময়ে - অসময়ে।।

সুদূরের হাতছানি

রজত ভট্টাচার্য

সুদূরের ওই আকাশছোঁয়া
পাহাড়ের একঝাক হাতছানি
আমার অন্তর সত্বাকে উথলে দেয়
নিমেষে ডেকে নিয়ে যায় আমায়
সবুজ আঁচল বিছানো উপত্যকায়
ওখানে মৃত্যু নেই, অপলক অনিমেষ
এক চিরশান্তি, সুপ্তির দেশ
শ্রবনে ভেসে আসে নিরন্তর
বিরহ বেদনার ঐশ্বর্যে ভরা
রাগ আহির ভৈরবের রেশ।

প্রকৃতি দাঁড়িয়ে নিশীথ নীরবে
বিস্ময়ে আনত মুখে
সাঁঝের তারারা কথা কয়
ইমন-ভুপালীর সুরে
পিয়াসী মন পাড়ি দেয় সুদূরে।

বেজে ওঠে হৃদয় মথিত ঐকতান
প্রাণে এসে দেয় ধরা
বাঁশী আর বেহালার সুর,
আমার নিয়ে যায় দূর ... বহুদূর!

শরৎ এলে

কল্যাণী ভট্টাচার্য

শরৎ এলে গ্রাম শহরে প্রাণের দোলা শুভ্রকাশে
দুলছে যেন পেঁজা তুলো দিগন্তে ঐ নীল আকাশে।
সুর তুলেছে আগমনীর ঝিলের ধারে হংস তিতির
গাছের ডগায় পড়ছে ঝরে বিন্দু বিন্দু হীরক শিশির।
আপন মনে করছে খেলা শাপলা শালুক পদ্ম জলে
শ্বেত শুভ্র আসন বিছায় সুগন্ধি রূপ শিউলী ফুলে।
শরৎ সাজায় স্বর্গ রথ সুগম পথে আসবে মা
ঢাকির ঢাকে বোল তুলেছে কাঁসা ঘন্টা ছাড়া না।
এই সমাজে একটা শ্রেণী মেতে উঠে উৎসবে
বেশীর ভাগই পায় না খুঁজে আনন্দ এই ভবে।
কারখানাতে ঝুলছে তালা শ্রমিক পায় না খেতে
কেমন করে উঠবে তারা উৎসবে তে মেতে।
মানব জীবন সংকটে আজ প্রাণ সংশয় থমকে চলা
মাগো তুমি জেগে উঠো রক্ষা করো পৃথ্বী দোলা।
তোমার কৃপায় ধরায় হাসুক শষ্য শ্যামল কুসুম কলি
মানব বন্ধন দৃঢ় হোক মানবতার শপথ গুলি।
সহজ সরল জীবন আসুক সিক্ত হোক সবুজ প্রাণ
পড়ুক ধরায় তোমার চরণ সেই আশাতেই বেঁধেছি গান।
অন্ন জুটুক পথের পাশে বুভুক্ষু ওই মানুষ গুলোর
শিরায় শিরায় স্পন্দিত হোক শরৎ শারদ সূত্র গুলো।

তর'তে

সঞ্জীব চাকমা জুনান।

তর নকভাঝ তলে চানা মর উগুরে
নিঝেনী আদামরা গরিদে
তো এগেম ফাদা পংতুল্য গাঙযাম
যিদুর পারং — পরেন্দি জনি
অয় ওগ নূয় বিজগর জনমপাং।

যেবার চাসন্ দ? — যা
তরে ঘিরি ন রাগেম বুগত
দুগ এলে এজোগ, তারে গলাত পিনিম
মালা সরা সাদ, তর সুগত।

এংরি কন' অক্ত কন্দিন
সাজন্য মর, তরে বাদে
জনি পুরনি জংধস্য কন ইদোত
তরে ভাবায় এক্কা গরি
সেক্কে মনত্ত এয়ান রাগেস
মুইও ভাবংয়র তরে নিগুরী।

তোমার জন্য

তোমার চুলচেরা বিচার, আমার
অস্তিত্বকে অসহায়' বিপন্ন করেছে
তবুও চলবো পাল ছেঁড়া ছিপের মত
যতদূর যাওয়া যায় — তারপর যদি
কোন ইতিহাসের জন্ম হয়তো হোক।

চলে যেতে চাও? তো যাও
কখনও বাধা হবোনা তোমার
দু:খ যদি আসতে চায় আসুক
মাল্যপরে পথে সঙ্গী হব তার।

এমনি করে কোন সময়, কোন দিন
পড়ন্ত সাঁঝে মোর, তোমা বিন
যদি পুরনো ধূঁসর কোন স্মৃতি
তোমাকে ভাবিয়ে তোলে সামান্য
তাহলে মনে মনে এটুকু জেনো
আমিও ভাবছি তোমার জন্য।

অনুবাদ : সঞ্জীব চাকমা জুনান।

তুমি অপরাজিতা

কথা - সুবিমল ভট্টাচার্য
সুর - মৃণাল নাথ শর্মা

পৃথিবীর ঘরে সেই ফিরে এলে
উলিয়ামস্ সুনিতা
বিশ্ববরেণ্যা বিশ্বভগিনী
তুমি যে অপরাজিতা।।

নয়মাস ব্যাপী অভিযান শেষে
এই মহাকাশ জুড়ে,
সারাটি ভুবন অনুরণিত
নব নব কথা সুরে,
সহচরী বুচ কুর্নিশ জানাই
তোমরাই নবনীতা।।

অসীম সাহসী নির্ভীকা তুমি
মহাকাশে মহাবিশ্বে,
এই অভিযানে সঞ্চিত আঁখি
দারুণ অজানা দৃশ্যে।

মহাকাশযানে কি অভিযানে
কি তার রীতি-নীতি,
পৃথিবী জুড়ে একসাথে গাই
তব বন্দনা গীতি,
সকলের ঘরে স্বাগতা তুমি
ঘরে ঘরে পরিচিতা।।

ধরে নাও

কথা ও সুর
সংকর্ষণ ঘোষ

ধরে নাও পৃথিবীতে শান্তি এসেছে
ধরে নাও, পৃথিবীতে যুদ্ধের শেষ
ধরে নাও কেউ আর অস্ত্র বেচে না
ধরে নাও পৃথিবীটা একটাই দেশ!

ধরে নাও ভালোবাসা জিতেছে এখানে
ধরে নাও রাজনীতি হেরেছে ভীষণ
ধরে নাও কারো অবসাদ নেই আর
ধরে নাও সবাই সবার প্রিয়জন।

ধরে নাও শেষ হল বারুদের স্তুপ
ধর্ম হাঙরদের ভেঙে গেছে দাঁত
আমি একা নই যারা এ স্বপন দেখে
আমার হাতে তুমিও এসে রেখো হাত।

কমিউনিটি হেপাটালোজি ও এইচ.এফ.টি

ডাঃ জগদীশ নমঃ

হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন অফ ত্রিপুরা গত ২৫ বছর যাবৎ সমাজকে যকৃৎ সংক্রান্ত ব্যধি এবং তার থেকে মুক্তির জন্য ক্রমাগত ও নিরলস প্রয়াস জারি রেখেছে। সাফল্য ও এসেছে বহুলাংশে। হেপাটাইটিস মুক্ত ত্রিপুরা গঠনের স্লোগানে ১৩লক্ষ ৬০ হাজার প্রতিষেধক টিকা প্রদান করা হয়েছে যার মাধ্যমে জনসাধারণকে হেপাটাইটিস বি থেকে সুরক্ষা প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে সরকারি জাতীয় টিকাকরণ প্রকল্পে হেপাটাইটিস বি রোগের প্রতিষেধক টিকা চালু আছে যা সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে। সমাজের সর্ব অংশের জনসমষ্টিকে লিভার বা যকৃতের অসুস্থতা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য শুরু হয় বৈজ্ঞানিক ও তথ্যনিষ্ঠ কর্মসূচি যাকে বলা হয় কমিউনিটি হেপাটোলজি বা সামাজিক হেপাটোলজি। চিকিৎসা শাস্ত্রের এই বিশেষ বিভাগের কাজ হল

১) যকৃতের কার্যাবলী এবং যকৃতের পীড়া এবং ব্যধির বিস্তারিত অধ্যয়ন এবং গবেষণা করা।

২) যকৃৎ, পিত্ত থলি ও পিত্ত সংবহনতন্ত্রের ব্যধিতে আক্রান্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা করা এবং প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা।

৩) যকৃতের বিভিন্ন রোগ জটিলতা আনুসঙ্গিক বিষয়ে তদারকি ও ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করা।

কমিউনিটি হেপাটোলজি একটা অত্যাবশ্যক মৌলিক ও অপরিহার্য মেডিকেল বিভাগ যার প্রভাব স্বাস্থ্য এবং জীবনধারণের গুণগত মানের উৎকর্ষের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই বিভাগের বিশেষজ্ঞরা যে সকল বিষয়ে প্রাথমিকতা দেন তা হল।

১) যকৃতের বিভিন্ন ধরনের প্রদাহ বা হেপাটাইটিস রোগ।

২) যকৃতের ক্ষত ও তৎপরবর্তী অবস্থা বা সিরোসিস অফ লিভার।

৩) যকৃতের কর্কট রোগ বা ক্যান্সার।

৪) যকৃতের মেদবাহুল্য বা ফ্যাটি লিভার।

৫) যকৃতের কার্যবিপত্তি বা ফেইলিয়ুর অফ লিভার।

হেপাটাইটিস বা প্রদাহ নিয়ে মুখ্যত আলোচনা করা হয়। হেপাটাইটিসের কারণগুলো হলো

১) ভাইরাস এ,বি,সি,ডি,ই।

২) অত্যধিক মদ্যপান।

৩) বিভিন্ন ঔষধ ও রাসায়নিকদ্রব্যের বিষ বা টক্সিন।

৪) স্বঅনাক্রম্যতা ব্যধি বা অটো ইমিউন ডিজঅর্ডার।

৫) বংশগত।

হেপাটাইটিসের লক্ষণগুলো হল * অবসন্নতা ও দুর্বলতা * জন্ডিস * পেট ব্যথা * বমি বমি ভাব * বমি খিদা মন্দা ইত্যাদি। হেপাটাইটিসের চিকিৎসা নির্ভর করে রোগের উৎস তার জটিলতা এবং রোগীর সার্বিক স্বাস্থ্যের উপর। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে নির্ধারিত সূচিতে নিয়মিত ঔষধ ব্যবহারের মাধ্যমে হেপাটাইটিস এবং জটিলতা থেকে অব্যহতি পাওয়া যায়। কিন্তু কমিউনিটি হেপাটোলজি চিকিৎসার পরিবর্তে দৃষ্টি নিবন্ধ রাখে যকৃৎ, পিত্ত থলি ও পিত্ত সংবহনতন্ত্র এর রোগ নির্ণয় বা ডায়গনোসিস এবং সার্বিক ব্যবস্থাপনা বা ম্যানেজমেন্ট এর দিকে। প্রতিরোধের এই পদ্ধতি নির্ভর করে তিনটি বিষয়ের উপর -

১) স্বাস্থ্য-যত্ন ও স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারীর ও স্বাস্থ্য দপ্তরের অবদান।

২) আক্রান্ত ব্যক্তি এবং জনগোষ্ঠীর শারীরিক অবস্থা।

৩) জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক সংস্থান বা রিসোর্স এর উপর।

উপরিউক্ত উপাদানগুলির নিবিড় সহযোগিতা এবং সুসংহত, ধারাবাহিক ও নিরবচ্ছিন্ন কর্মসূচির উপর। কিন্তু দেখা যায় এই উপাদানগুলো প্রায়শই এক যোগে, এক মানসিকতা এবং এক ছন্দে কাজ করতে পারে না। ফলত তার মন্দ প্রভাব জনগোষ্ঠীর লিভারের স্বাস্থ্যের উপর পড়ে। সমষ্টি হেপাটলজির বুনিয়াদি ও প্রধান অঙ্গ হল —

১) জনগোষ্ঠীতে শিক্ষা ও সচেতনতার মাধ্যমে প্রতিরোধ এর উদ্দেশ্যে হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন অফ ত্রিপুরা বিদ্যালয়,

কলেজ, সমাগম স্থল, শ্রমিক সংগঠন, মহিলা সংগঠন, ক্লাব, চা বাগান, ইটভাট্টা, মেলা, ধর্মীয় স্থান, উৎসব, পূজা, পার্বণ ইত্যাদিতে নিরবচ্ছিন্ন প্রচার, শিক্ষা ও সচেতনতা মূলক কর্মসূচী নিয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করছে। যদিও বহু ক্ষেত্রেই সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে তবুও এই কর্মসূচি রাজ্যব্যাপী জোরালো আন্দোলনের রূপ নেয়নি যা আমরা দেখেছি টিকা করনের সময়। কারণটা কিন্তু আমাদের প্রায় সবারই জানা। বহুলাংশে নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং নেত্রীস্থানীয়দের নিষ্ক্রিয়তা ও উদাসীনতা দায়ী। তবে এইচএফটি আশাবাদি যে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটবেই। হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন এই লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। এইচ, এফ, টি যে কর্মসূচী হাতে নেয় তা সম্পূর্ণ করেই ছাড়ে।

২) লিভারের স্বাস্থ্যের অবস্থার দ্রুত শনাক্তকরণ এবং যকৃতের রোগ অনুসন্ধান করা কমিউনিটি হেপাটলজির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এর জন্য প্রয়োজন সমাজের সার্বজনীন, সঙ্গত ও পদ্ধতি যুক্ত বা গাইডলাইন অনুয়ায়ী পরীক্ষা-নিরীক্ষা। ইচ, এফ, টি তার সাধ্যমত উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠী ও উদ্দেশ্য বর্গ বা টার্গেট পপুলেশন জনসমষ্টিকে নির্দিষ্ট সময় বৃহৎ সংখ্যায় হেপাটাইটিসের পরীক্ষা বা টেস্ট থাকে। এতে রোগের প্রকোপ, আক্রান্তের শ্রেণী, ভৌগোললিক অবস্থান এবং রোগের তীব্রতা ইত্যাদির আবাস ও আঁচ পাওয়া যায় যেটা পরবর্তীতে চিকিৎসা ও প্রতিরোধক ব্যবস্থা নিতে সাহায্য করে। এর মাধ্যমে জন সমষ্টিকে যকৃতের রোগের হাত থেকে রক্ষা করা যায়। কিন্তু বাস্তবে কর্মী স্বল্পতা ও উৎস এর প্রাচুর্যের অভাব সমষ্টিকে আশানুরূপ সহায়তা দিতে পারছে না।

৩) দীর্ঘকাল স্থায়ী যকৃতের রোগ যেমন ক্রনিক হেপাটাইটিস, সিরোসিস ইত্যাদির চিকিৎসা ও ব্যবস্থাপনা কমিউনিটি হেপাটলজির আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এর মাধ্যমে বৃহৎ জন সমষ্টিকে যকৃতের রোগের জটিলতা, ক্যান্সারে রূপান্তরিত হওয়া থেকে মুক্তি দেয়। এইচ,এফটি গত ২৫ বছর যাবত সীমিত সম্বল ও আর্থিক সংস্থান নিয়ে নিয়মিত "হেপাটাইটিস ক্লিনিক" এ সহস্র সহস্র লোকের চিকিৎসা, অনুসরণ বা ফলোআপ ব্যবস্থা ও পুনঃ নিবন্ধন ইত্যাদির মাধ্যমে যকৃতের রোগ চিকিৎসা ও নিয়ন্ত্রণের কাজে সক্রিয় আছে। এই স্থলে অনেক আক্রান্ত রোগী যথা সময়ে উপস্থিত না হওয়া, চিকিৎসা সম্বন্ধে উদাসীন থাকা, বিধি মত ঔষধ না খাওয়া, আর্থিক দুর্বলতা হেতু ঔষধ ক্রয়ে অক্ষমতা, সরকারি সংস্থানে ঔষধের অপ্রতুলতা ইত্যাদি এই রোগের চিকিৎসা ও প্রতিরোধ এবং হেপাটাইটিস মুক্ত ত্রিপুরা গঠনের প্রতিবন্ধকতা ও অন্তরায়।

৪) কমিউনিটি হেপাটলজির নিয়ম অনুসরণ করে জন গোষ্ঠীর মধ্যে জীবনশৈলীর পরিবর্তনের এবং পছন্দ মতো রীতিনীতি গ্রহণের ব্যাপক সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দিয়ে কর্মসূচী গ্রহণ করেছে এই এফ টি এবং সেই কর্মসূচী অব্যাহত থাকবে। জনগোষ্ঠীর মধ্যে আহার, নেশা দ্রব্য গ্রহণ, ব্যায়াম, যোগা, স্বাস্থ্যবিধি ও বিশুদ্ধ পানীয় নিয়ে ব্যাপক সতর্কতা এবং উপলব্ধি পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই এফ টি বৈজ্ঞানিক তার সুফল নিয়ে হাজার হাজার অনুষ্ঠান করছে। এতে যকৃৎ স্বাস্থ্যপ্রদ ও সুরক্ষিত থাকছে। এই এফ টির কমিউনিটি হেপাটলজি যকৃতের রোগের প্রতিরোধের জন্য জনসমষ্টিকে দ্রুত সচেতন করছে। নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর বেশ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

১) হেপাটাইটিস এ এবং বি এর প্রতিরোধক টিকা বা ভ্যাকসিন দেওয়ার জন্য বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য হেপাটাইটিস বি প্রতিরোধক টিকা প্রদানে এইচ এফ টি সারাদেশের মধ্যে এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ত্রিপুরার জনগোষ্ঠীর ৩৭ শতাংশ জনগণকে এই টিকার আওতায় আনা হয়েছে। এই টিকা করনের ফলে জনগোষ্ঠী স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বহুমুখী সুফল ভোগ করছেন।

২) সুরক্ষিত ইনজেকশনের ব্যবহারের মাধ্যমে সংক্রমণ প্রতিরোধ করে যকৃতের স্বাস্থ্য সুনিশ্চিত করছে।

৩) সুরক্ষিত যৌনাভ্যাস সংক্রমণ প্রতিরোধ করে। তাই সেফ সেক্স এর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এতে পাশাপাশি এইচ আই ভি সংক্রমণ ও প্রতিরোধ করা যায়।

৪) অতিরিক্ত মাদকাসক্তি পরিহার করে যকৃৎ কে সুরক্ষিত রাখার সর্বোত্তম উপায়। তাই এইচএফটি নেশা বিরোধী অভিযানে সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করেছে।

৫) স্বাস্থ্য সম্মত শরীরিক ওজন বজায় রাখলে শরীরের মেদ বহুলতা হ্রাস পায়। এর মাধ্যমে ফ্যাটি লিভার প্রতিরোধ করা যায়। জীবন ধারণের গুণগত মান উৎকৃষ্ট হয়। হেপাটলজি এই ব্যাপারটাতে জনসমষ্টিকে ক্রমাগত সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করছে।

৬) সামঞ্জস্যপূর্ণ সুষম ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ সার্বিক স্বাস্থ্য ও লিভারের স্বাস্থ্য ভালো রাখে। ফল, মূল, কন্দ সর্বদা আহারে অধিক থাকা খুবই প্রয়োজনীয়। তে ঘি মাখন ও চর্বিযুক্ত খাদ্য স্বল্প পরিমাণ। প্রত্যেক মিটিং এবং সেমিনারে একটির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এতে ভালো সুফল ও পাওয়া যাচ্ছে। জনসাধারণ এই ব্যাপারে তীক্ষ্ণ নজর রাখছে।

৭) নিয়মিত কায়িক পরিশ্রম বিশেষ করে হাঁটা যকৃতের কার্যকারিতা সতেজ রাখে এবং যকৃত কে রোগমুক্ত রাখে। তাই আমরা এইচ এফ টি সর্বদা নিয়মিত ব্যায়াম এর উপর গুরুত্ব আরোপ করি। যুবকদের মধ্যে জীবন শৈলীর এই উপাদান মনে প্রভূত আগ্রহ দেখা দিয়েছে। পরিশেষে যকৃতের স্বাস্থ্য সুনিশ্চিত করার পথে অন্তরায় গুলো না বললেই নয়।

১) যকৃতের রোগের সংক্রমণ পথ, রোগের লক্ষণ ও প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে জনগোষ্ঠীর সচেতনতার অভাব।

২) অশিক্ষা এবং কুসংস্কার বসত হেপাটাইটিস ও যকৃতের রোগে আক্রান্তদের প্রতি বৈষম্য ও সামাজিক দুর্ব্যবহার।

৩) স্বাস্থ্য পরিষেবার সীমিত অধিগম্যতা, কর্মী স্বল্পতা ও স্বল্প সংখ্যক পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

৪) কৃষ্টি সংস্কৃতি ও ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা।

৫) টিকা গ্রহণে অনীহা এবং টিকার সহজলভ্যতার অভাব।

৬) সীমিত আর্থিক সংস্থান এবং সমাজে যকৃতের স্বাস্থ্য সুরক্ষা খাতে বিনিয়োগে নীতি - নির্ধারকদের অজ্ঞতা, অনীহা ও উদাসীনতা।

এই কমিউনিটি হেপাটোলজির নিরিখে হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন অফ ত্রিপুরার "স্বাস্থ্যকর যকৃত" বা হেলদি লিভার তৈরির আন্দোলন সফল হোক।

সংক্রমক রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা

ডাঃ কমল রিয়াং

সূচনা

একটা সময় ছিল ত্রিপুরার উল্লেখযোগ্য সংখ্যার মানুষ নানা সংক্রমক রোগে ভুগতেন এবং মারাও যেতেন। সাম্প্রতিককালে আমরা কোভিড-১৯ এর তাণ্ডব লীলা দেখলাম। কোভিডে শুধু আমাদের দেশই নয় সারা পৃথিবীর বহু মানুষ ভুগেছেন, বহু মারাও গেছেন।

কিন্তু অসংক্রমক রোগ যেমন উচ্চ রক্তচাপ, মধুমেহ, ক্যান্সার, ফুসফুসের রোগ ইত্যাদি আমাদের সমাজে বাসা বেধে রয়েছে তা আমরা টের পাচ্ছিনা বা গুরুত্ব দিচ্ছিনা তেমন ভাবে। যেহেতু এই রোগগুলি সংক্রমক নয়, সরকারের তরফেও সেরকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি । কিন্তু এই সব রোগে আক্রান্ত বহু মানুষই আমাদের সমাজে রয়েছেন এবং দীর্ঘ রোগভোগের পর মারাও যাচ্ছেন।

উল্লেখযোগ্য রোগসমূহ —

১) উচ্চ রক্তচাপ (২) মধুমেহ (৩) ক্যান্সার (৪) ফুসফুসের রোগ ইত্যাদি।

রোগের ব্যাপকতা

৩০ বছরের উপর যে কোন মানুষই এইসব রোগে আক্রান্ত হতে পারেন। প্রায় ৬০ শতাংশ মৃত্যু অসংক্রমক রোগ থেকেও হতে পারে। এজাতীয় রোগকে জীবনশৈলী জনিত রোগও বলা হয়। আজকাল এইসব রোগ ৩০ বৎসর বয়সের আগেও দেখা যাচ্ছে। এরোগের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দীর্ঘদিন ভোগা এবং সারাজীবন ঔষধে থাকা। আর ধীরে ধীরে Vital Organ এ আক্রান্ত করা এবং শরীরকে পঙ্গু করে দেওয়া। দীর্ঘদিন রোগভোগের কারণে কর্মজীবনে ব্যাঘাত হয় এবং এর প্রভাব পরিবারেও পরে। এতে পরোক্ষভাবে রাজ্যের বা দেশের উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায়। আমাদের রাজ্যের survey অনুসারে দেখা গেছে যে ১২ - ১৪ শতাংশ উচ্চরক্তচাপে ভোগে এবং ৫ - ৮ শতাংশ মধুমেহ এ ভোগে, এই শতাংশ কম মনে হতে পারে কিন্তু দীর্ঘভোগ সমস্যাদি বৃদ্ধি করে সমাজে।

প্রতিরোধক এবং প্রতিকারজনিত পদক্ষেপ

জাতীয় NCD (Non-communicable disease) Programme -এর আওতায় NHM প্রকল্পে ২০১৮ সালে থেকেই বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

পদক্ষেপসমূহ

১) Sub-Centr Level-এ CHO নিয়োগ করে Diabetic উচ্চরক্তচাপ-এর রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

২) PHC/CHC/SDH/DH Level-এ NCD করে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

৩) গ্রামীণ বা পারা স্তরে ASHA কর্মীদের দ্বারা CBSC-র মাধ্যমে Servey করে উচ্চ ঝুকিপূর্ণ রোগীদের Sub-Centre/PHC/CHCতে পাঠানো হচ্ছে।

৪) রোগ নির্ণয়ের পর Linelishop করে সারা বৎসর ঔষধের ব্যবস্থা করা হচ্ছে SC/PHC/CHC থেকে।

৫) প্রয়োজনে Higher Centre-এ রেফারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

৬) সিরিয়াস রোগীদের Tele Censullation এর মাধ্যমে স্পেশালিষ্ট ডাক্তারদের সঙ্গে যোগাযোগ করে চিকিৎসাদির ব্যবস্থাও আছে।

গোমতী জেলায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

১) ১৪৩ সাব সেন্টার, ১২টি সি এইচ সি এবং পি এইচ সি, ৩টি এস ডি এইচ এবং একটি এ এইচ এর মাধ্যমে এন সি ও প্রোগ্রাম বাস্তবান করা হচ্ছে।

২) গ্রাম / পারা স্তরে আশা দিদিরা সার্ভে করে হাই রিস্কদের হেলথ সেন্টারে পাঠাচ্ছে।

৩) ইতিমধ্যে ৮০ শতাংশ Screeing শেষ হয়েছে।

৪) ডি এইচ-এ সি সি ও স্থাপন করা হচ্ছে। আর অমরপুর এবং করবুক হাসপাতালে এর ব্রাঞ্চ খোলা হচ্ছে। Health ratients দের বিশেষ চিকিৎসার জন্য।

স্টার এন.সি.ডি প্রজেক্ট

এই প্রজেক্ট আই.সি.এম.আর এবং এ.আই.এম.এস দ্বারা নীতি একটা স্পেশাল প্রোজেক্ট সারাদেশে ৪ ডিষ্ট্রিকের মধ্যে গোমতীতে একটি। আমরা ভাগ্যবান এই প্রজেক্টে আমাদের ডিষ্ট্রিক-এ হচ্ছে এবং এর সুফল আমরাই প্রথম পাব। এই প্রজেক্ট ৩ বৎসর ধরে চলবে আমাদের ডিষ্ট্রিকে।

কাজসমূহ

১) ইতিমধ্যে সার্ভে করে ডিষ্ট্রিক-এ রোগের ব্যবকতা নির্ণয় করেছে।

২) Stratesy নির্নয় হয়ে গেছে কিভাবে, সঠিকভাবে পদক্ষেপ নেওয়া যায়।

৩) প্রথম পর্যায়ে মাতাবাড়ি এবং করবুক ব্লকে ঐ বিশেষ পদক্ষেপ কার্যকর করা হচ্ছে। বাকী ব্লকে পরের স্টেইজে হবে।

৪) Tele Consullation, Sub-Centr থেকে পি.এইচ.সি এবং ডি.এইচ পর্যন্ত করার ব্যবস্থা হচ্ছে।

৫) Strict Supervision এবং meeting করা হচ্ছে।

উপসংহার

অসংক্রমক রোগ অনেক অংশে প্রতিরোধ যোগ্য। আমাদের জীবনশৈলী পরিবর্তন করলে অনেক এন.সি.ডি কম করা যায়। নিয়মিত শরীরচর্চা, তামাক বর্জন, আধ্যাত্মিক চর্চা ইত্যাদি এন.সি.ডি-কে অনেক দুরে রাখতে সাহায্য করে। এন.সি.ডি প্রতিরোধ করব। জীবনযাপন করব। ২০৪৭ সালে ভারতবর্ষকে উন্নত রাষ্ট্র গঠনে Cotribute করব।

আমাদের লক্ষ্যপথ

পার্থ প্রতিম সাহা

২০০২ সাল থেকে রাজব্যাপী হেপাটাইটিস রোগের সচেতনতা, প্রচার, প্রতিরোধ ও গণ টীকাকরণের লক্ষ্য নিয়ে রাজ্যে গড়ে উঠেছিল হেপাটাইটিস ফাউণ্ডেশন অফ ত্রিপুরা। নিজস্ব লক্ষ্যে অবিচল থেকে কাঙ্খিত স্বপ্ন পূরণে এগিয়ে চলতে চলতে ব্যাপক সামাজিক কর্মসূচি হাতে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে এই সংগঠন। এগিয়ে চলছে সমাজের সর্বস্তরের জনগণকে সঙ্গে নিয়েই। দীর্ঘ ২৩ বছরে পথ চলা ছিল কঠিন। বহু চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে সংগঠন তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাবার শপথ নিয়ে, রাজ্যবাসীর আশীর্বাদে পথ চলা শুরু করলেও তা ছিল বহু কষ্টের। তা সত্বেও আমরা নানা পরিকল্পনা নিয়ে এগুবার চেষ্টা করেছি।

উদয়পুরে রয়েছে পূর্ব গকুলপুর গ্রাম পঞ্চায়েত। শহরের ওপাড়ে গোমতী নদীর উপর ঝুলন্ত ব্রিজ দিয়ে যেতে হয় সেই গ্রামে। শহরের কোল ঘেঁষে হলেও যেন অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে এই পঞ্চায়েতটি। একদিন সন্ধ্যায় আমাদের সংগঠনের সদস্য বিশেষ করে অমিতাভ, দীপঙ্কর, মানসদা, স্বপনদার (সাহা) সঙ্গে কথা হচ্ছিল এই পিছিয়ে পড়া গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে। সবার সঙ্গে আলোচনা করে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে এই গ্রামটিকে কীভাবে উন্নত করা যায়। আমাদের সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি তথা বর্তমানে সংগঠনের অধিকর্তা ডাক্তার প্রদীপ ভৌমিক স্যারের সঙ্গেও এনিয়ে কথা বলেছি। আমাদের সম্মিলিত ভাবনা এবং স্যারের নির্দেশিত পথে এই গ্রামটিকে আদর্শ গ্রাম হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়ে আমরা কাজ শুরু করেছি। বসবাসকারীদের অধিকাংশই দরিদ্র সীমার নীচে রয়েছেন। পাশাপাশি এই গ্রামটি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খেলাধুলায় অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে। আমরা মনে মনে গ্রামটিকে দত্তক নেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করি। লক্ষ্য স্থির করি এই এলাকার জনগণের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, খেলাধূলার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক বিকাশ সাধনও আমরা করব। আল্পনা, বসেআঁকো, পিঠেপুলি প্রতিযোগিতা ছিল ভাবনার প্রথম প্রয়োগ। প্রবীন নাগরিকদের বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার, ব্লাড সুগার পরীক্ষা এবং সেই সঙ্গে চিকিৎসকের পরামর্শ, ওষুধ দেওয়া ছিল দ্বিতীয় উদ্যোগ। স্বাস্থ্য দপ্তরের সহায়তায় যক্ষ্মা রোগীদের বিনামূল্যে টীকাকরণও ছিল আমাদের অন্যতম কর্মসূচী। নববর্ষকে সামনে রেখে 'বর্ষবরণ' আনুষ্ঠান ছিল আরেকটি প্রয়াস। সেই অনুষ্ঠানে পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, বিধায়ক জিতেন্দ্র মজুমদার, সংগঠনের অধিকর্তা ডাঃ প্রদীপ ভৌমিক সহ এলাকার জনপ্রতিনিধিরা উপস্থিত থেকে সংগঠনের শক্তি বৃদ্ধি করেছেন। পূববী সামাজিক সংস্থার প্রায় দুইশত কচিকাঁচা শিল্পীর পরিবেশিত নাচ, গান, আবৃত্তি অনুষ্ঠানকে ভিন্নমাত্রায় দান করেছে। এলাকার ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনায় এগিয়ে যেতে উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় যারা ভালো ফল করেছে তাদের সংগঠনের তরফ থেকে সম্বর্ধনা প্রদান করা হয়।

ইতিমধ্যে আমাদের সংগঠন ভাইরাল হেপাটাইটিস নিয়ে গোমতী জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের সহযোগিতায় উপজাতি গ্রাম কিল্লার গুণপদ জমাতিয়া মেমোরিয়াল হলে আয়োজন করে আলোচনা সভা। এছাড়া কাঁকড়াবন কমিউনিটি হল, অমরপুর, করবুক, পিত্রা , নোয়াবাড়ি ইত্যাদি অঞ্চলেও অনুরূপ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। এবছর মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকে অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল পরিবারের যেসব ছাত্রছাত্রীরা প্রথম বিভাগে যারা উত্তীর্ণ হয়েছেন এরকম ৫৫ জনকে আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। উদয়পুর মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চল এবং বিদ্যালয়ে নেশা বিরোধী ও বাল্যবিবাহের উপর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আমতলী স্কুলে হয়েছে মেগা স্বাস্থ্য শিবির। অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবিরে রাজ্যের স্বনামধন্য চিকিৎসকরা পরিষেবা দিয়েছেন। আর সেইদিন বিধায়ক জিতেন্দ্র মজুমদার আমাদের সংগঠনের হাতে একটি ই.সি.জি মেশিন তুলে দেন। কারণ প্রতি রবিবার আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে

উদয়পুর শাখা অফিসে যে স্বাস্থ্য শিবির পরিচালিত হচ্ছে সেখানে এই ই.সি.জি মেশিনটা রোগীদের কল্যাণে ব্যবহার করতে পারি। এছাড়া উপহার তিনি আমাদের একটি এলইডি স্ক্রিনও উপহার দিয়েছেন। বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস উপলক্ষ্যে এ বছর রাজ্যভিত্তিক অনুষ্ঠান উদয়পুর রাজর্ষী কলা ক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হয়েছে। যা নিয়ে ইতিমধ্যেই আমরা ব্যাপক সাড়া পেয়েছি। নিজস্ব লক্ষ্যে অবিচল থেকে বিভিন্ন স্বাস্থ্য, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচী পালনে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। হেপাটাইটিস ফাউণ্ডেশন অফ ত্রিপুরার ধারাবাহিক কর্মসূচীতে আপনারা আমাদের পাশে থাকবেন, বেগবান করবেন আমাদের কাজের গতি। এই প্রত্যাশা রইল।

জোনাল ভাবনা

স্বপন কুমার সাহা

এবছর রাজ্য সম্মেলনের পর করবুক থেকে আমাদের সাউথ জোনাল কমিটির কাজ প্রথম শুরু হয়। একে একে উদয়পুর, অমরপুর, সাব্রুম, বিলোনীয়া, রাজনগর, ঋষ্যমুখ, মহুরীপুর ইত্যাদি ব্রাঞ্চ তাদের নানা কর্মসূচী নিয়ে এগুতে থাকে। ওদের এই সুন্দর কর্মপ্রয়াসগুলিকে একটি মালার মতন গেথে একত্র করে রাখাই আমাদের অন্যতম উদ্দেশ্য। সেই লক্ষ্যে প্রতিটি ব্রাঞ্চ ও সদস্য-সদস্যাদের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ তৈরী করার লক্ষ্যে জোনাল চেষ্টা করছে। আমাদের এই চেষ্টায় হয়তো খামতি রয়েছে, তবে আন্তরিকতার অভাব নেই এই কথা হলফ করে বলতে পারি। কোন কোন ব্রাঞ্চ নিজেদের মেলে ধরতে পারছেন না। তাবলে তাদের কর্মসূচী পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাবে তা বিশ্বাস করিনা। শুধুমাত্র দায়িত্বপ্রপ্তরাই নন যেকোন সদস্যের ইতিবাচক ভাবনা ও পরামর্শ আমাদের নতুনভাবে কাজে উৎসাহিত করতে পারে। সংগঠনের মূল লক্ষ্য স্বাস্থ্য বিষয়ক হলেও সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভাবনা আমাদেরকে সমৃদ্ধ করবে বলে মনে করি। তাই প্রতি বছর জোনালের অন্তর্গত মহকুমার বিভিন্ন পুজো আয়োজকদের নিয়ে 'শারদ সম্মান' ও স্মরণিকা প্রকাশ নিছক অনুষ্ঠান নয়। এটি একটি বৃহত্তর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভাবনার বহি:প্রকাশ। যার মাধ্যমে আমরা সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষের খুব কাছে নিজেদের নিয়ে যেতে পারবো। সেই সঙ্গে আমাদের মূল ভাবনার প্রয়োগও সফলভাবে করতে পারবো। এই আশা ও বিশ্বাস নিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি আগামীর দিকে।

নির্মাণ প্রকৌশলীরা ত্রিপুরার উন্নয়নের অন্যতম কারিগর

এক অদৃশ্য শক্তির গল্প

পার্থপ্রতিম দেবনাথ

১। ভূমিকা ঃ ত্রিপুরার স্বপ্ন, প্রকৌশলীদের অবদান

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এক ভূ-বেষ্টিত রাজ্য ত্রিপুরা, দীর্ঘকাল ধরে তার ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের কারণে উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে। ১৯৪৭ সালের দেশভাগ এই বিচ্ছিন্নতাকে আরও বাড়িয়ে তোলে, যার ফলে কলকাতার মতো প্রধান শহরগুলির সাথে সড়ক যোগাযোগ প্রায় ১৭০০ কিলোমিটার পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হয়, যা পূর্বে মাত্র ৩৫০ কিলোমিটার ছিল। এই ভৌগোলিক প্রতিবন্ধকতা রাজ্যের অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে ব্যাহত করেছে, যার ফলে দারিদ্র্য, কম মূলধন গঠন এবং অপর্যাপ্ত পরিকাঠামো একটি বড় সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। একসময় উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে "দূরবর্তী পোষ্ট" বা "ল্যাণ্ড'স এণ্ড" হিসাবে দেখা হতো, যা পরিকাঠামোগত ঘাটতির ফল ছিল।

এই ঐতিহাসিক এবং ভৌগোলিক চ্যালেঞ্জগুলির মোকাবিলায়, নির্মাণ প্রকৌশলীরা ত্রিপুরার উন্নয়নের 'অন্যতম কারিগর' বা অদৃশ্য কারিগর হিসেবে নিরন্তর কাজ করে চলেছে। তাঁদের কাজ প্রায়শই পর্দার আড়ালে থাকে, কিন্তু আধুনিক ত্রিপুরার প্রতিটি স্তম্ভ তাঁদের মেধা, শ্রম ও দূরদর্শিতার ফসল। তাঁরা কেবল ইট, বালি, সিমেন্ট দিয়ে কাঠামো তৈরি করেন না, বরং একটি জাতির স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেন। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এর প্রত্যক্ষ এবং দৃশ্যমান প্রভাব সমাজে বিদ্যমান, যেখানে একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার একটি অ্যাপ তৈরি করেন, সেখানে সিভিল ইঞ্জিনিয়াররা সেই ভৌত জগত তৈরি করেন যার সাথে আমরা প্রতিদিন যোগাযোগ করি। তাঁদের এই নিরলস প্রচেষ্টা দেশভাগের কারণে সৃষ্ট ঐতিহাসিক প্রতিবন্ধকতাকে সরাসরি অকার্যকর করছে, কার্যকরভাবে ত্রিপুরাকে বৃহত্তর জাতীয় এবং আঞ্চলিক অর্থনীতিতে পুনরায় সংহত করছে। তাঁদের কাজ কেবল একটি ক্রমবর্ধমান উন্নতি নয়, বরং ত্রিপুরার মূল সংহতি এবং ভবিষ্যতের সমৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য।

২। সেতু, সড়ক ও সংযোগ ঃ ত্রিপুরার প্রাণবন্ত ধমনী

ত্রিপুরার ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা দূরীকরণে প্রকৌশলীরা নিরন্তর কাজ করে চলেছেন। জাতীয় সড়ক ৮ (NH - 8), যা আগরতলাকে দেশের মূল ভূখণ্ডের সাথে সংযুক্ত করে, সেটির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে তাঁদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এই মহাসড়ক এখন সাব্রুম পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে, যা বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দর থেকে মাত্র ৭৫ কিমি দূরে অবস্থিত, যা ত্রিপুরাকে একটি কৌশলগত বাণিজ্যিক কেন্দ্রে পরিণত করছে।

রেল যোগাযোগেও এসেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। আরতলা-আখাউড়া রেল লিঙ্ক প্রকল্প, যা ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বাণিজ্য ও যাত্রী পরিবহনে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে, প্রকৌশলীদের তত্ত্বাবধানে দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে। এটি পণ্য ও যাত্রী পরিবহনের সময় উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনবে এবং অর্থনৈতিক আদান-প্রদানকে জোরদার করবে। ফেণী নদীর উপর নির্মিত 'মৈত্রী সেতু' ত্রিপুরার জন্য একটি গেম-চেঞ্জার। এই সেতু সাব্রুমকে বাংলাদেশের রামগড়ের সাথে সরাসরি সংযুক্ত করেছে, যা আগরতলাকে ভারতের আন্তর্জাতিক সমুদ্র বন্দরের নিকটতম শহরে পরিণত করেছে। এই সেতু কেবল দু'দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কই জোরদার করবে না, বরং পর্যটন, বাণিজ্য এবং বন্দর-ভিত্তিক অর্থনীতির নতুন সুযোগ তৈরি করবে।

মহারাজা বীর বিক্রম বিমান বন্দর, আগরতলার দ্বিতী ব্যস্ততম বিমানবন্দর, প্রকৌশলীদের দ্বারা আধুনিকীকরণ করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে ২০টি চেক-ইন কাউন্টার, চারটি অ্যারোব্রিজ, উন্নত লাগেজ

সিস্টেম এবং নাইট ল্যাণ্ডিং সুবিধা। এটিকে আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে উন্নীত করার প্রচেষ্টা চলছে।

মৈত্রী সেতু এবং আগরতলা-আখাউড়া রেল লিঙ্কের মতো প্রকল্পের মাধ্যমে সীমান্ত-পার সংযোগের উপর জোর দেওয়া কেবল অভ্যন্তরীণ উন্নয়নের চেয়ে আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সংহতির দিকে একটি কৌশলগত পরিবর্তনকে তুলে ধরে। নির্মাণ প্রকৌশলীরা কেবল পরিকাঠামো তৈরি করছে না, তাঁরা মাঠে ভূ-রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক নীতি (যেমন ভারতের 'অ্যাক্ট ইস্ট নীতি') বাস্তবায়নে সহায়তা করছেন। তাঁদের কাজ ত্রিপুরার অর্থনৈতিক পরিচয়কে বিচ্ছিন্ন থেকে সংহত করার একটি মৌলিক পুনর্গঠন সক্ষম করছে, যা উল্লেখযোগ্য ভূ-রাজনৈতিক প্রভাব রাখে। এই সংযোগ প্রকল্পগুলি ত্রিপুরার ভূ-রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা বহুলাংশে হ্রাস করেছে। উন্নত সড়ক ও রেল নেটওয়ার্কের ফলে পণ্য পরিবহন সহজ হয়েছে, যা কৃষকদের উৎপাদিত পণ্য (ফল, সব্জি, দুধ, মাছ) দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে পৌঁছাতে সাহায্য করছে। এর ফলে নতুন শিল্প গড়ে উঠছে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন যে, এই উন্নয়নের গতি দেখে রাজ্যের বাইরে থেকে আসা মানুষজনও বিস্মিত হচ্ছেন।

ত্রিপুরার উন্নয়নে প্রকৌশলীদের এই বহুমুখী অবদানকে আরও স্পষ্ট করতে, কিছু উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের একটি সারণী নীচে দেওয়া হলো ঃ—

সারণী ১ ঃ ত্রিপুরার কিছু উল্লেখযোগ্য পরিকাঠামো প্রকল্প ও তাদের প্রভাব।

প্রকল্পের নাম	প্রকৌশলীদের ভূমিকা	ত্রিপুরার উপর প্রভাব
জাতীয় সড়ক ৮ (NH - 8) সম্প্রসারণ	পরিকল্পনা, নকশা, নির্মাণ, মান নিয়ন্ত্রণ, রক্ষণাবেক্ষণ।	ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা হ্রাস, পণ্য পরিবহন সহজীকরণ, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি।
আগরতলা-আখাউড়া রেল লিঙ্ক, সেতু নির্মাণ,	রেললাইন স্থাপন, ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্য ও যাত্রী সংকেত ব্যবস্থা।	পরিবহন বৃদ্ধি, ট্রানজিট সময় হ্রাস অর্থনৈতিক আদান-প্রদান জোরদার।
মৈত্রী সেতু (ফেণী নদীর উপর)	সেতু নির্মাণ, সংযোগ স্থাপন,	আগরতলাকে আন্তর্জাতিক সমুদ্র ভূ-প্রযুক্তিগত কাজ।
বন্দরের নিটতম শহরে পরিণত		
করা, পর্যটন ও বাণিজ্য বৃদ্ধি,	ভূ-রাজনৈতিক সম্পর্ক জোরদার।	
মহারাজা বীর বিক্রম বিমান বন্দর টার্মিনাল ও রানওয়ে	আধুনিকী দ্রুত ও নিরাপদ বিমান পরিবহন,	আধুনিকীকরণ,
নতুন সুবিধা স্থাপন,	পর্যটন বৃদ্ধি,	উত্তর-পূর্বের দ্বিতীয়
ব্যস্ততম বিমানবন্দর।	শিল্পাঞ্চলে জলবায়ু-সহনশীল রাস্তা	
ও জলবায়ু-সহনশীল	পরিকাঠামো	শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থান
সৃষ্টি,নিষ্কাশন ব্যবস্থা (TIISDP)	নকশা ও নির্মাণ,	জল
সরবরাহ	পরিবেশগত স্থিতিস্থাপকতা	বৃদ্ধি, পাইপলাইন
স্থাপন।	বিনিয়োগ আকর্ষণ।	গ্রামীণ পানীয় জল সরবরাহ
প্রকল্প,পাইপলাইন স্থাপন,	জল সংরক্ষণ	মানুষের মৌলিক
চাহিদা পূরণ,	ব্যবস্থা নির্মাণ।	জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, স্বাস্থ্য
ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা	উন্নতি।	নতুন স্কুল ভবন ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র
নির্মাণ	ভবন নির্মাণ,	বিজ্ঞান গবেষণাগার
উন্নত	শিক্ষার পরিবেশ তৈরি,	ও ছাত্রাবাস স্থাপন।
গ্রামীণ এলাকায় (STEM)	শিক্ষাকে	উৎসাহিত করা,
স্বাস্থ্যসেবার	সহজলভ্যতা	বৃদ্ধি।

৩। জল, বিদ্যুৎ ও নগর ঃ আধুনিক ত্রিপুরার ভিত্তি

নাগরিকদের মৌলিক চাহিদা পুরণে প্রকৌশলীরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন। পাইপলাইনের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া এবং জল সংরক্ষণ ও জলসেচের ক্ষেত্রে তাঁদের উদ্ভাবনী দক্ষতা বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছে। সরকার পানীয় জল সরবরাহের জন্য ১৫টি প্রকল্প সম্পন্ন করেছে, যার মধ্যে রয়েছে ৭৮.৭৯ কিমি জল পাইপলাইন এবং ১.২১ কোটি লিটার জল ধারণ ক্ষমতা। গভীর নলকূপ ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের অধীনে ২০২২ - ২০২৩ অর্থবছরে ২৩১.২ কোটি লিটার জল ধারণ ক্ষমতা তৈরি হয়েছে।

বিদ্যুৎ খাতে ত্রিপুরা এখন উদ্বৃত্ত রাজ্য। OTPC (৭২৬.৬ মেগাওয়াট) এবং NEEPCO-এর (১০১ মেগাওয়াট) মেগা গ্যাস থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্টগুলির

পাশাপাশি রাজ্যের নিজস্ব উৎপাদন ক্ষমতা (১১৩ মেগাওয়াট) রয়েছে, যা প্রকৌশলীদের নিরলস প্রচেষ্টার ফল। বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থায় ৩১ শতাংশ থেকে ১৫ শতাংশ ক্ষতি কমানো এবং সৌরশক্তির ব্যবহার বাড়ানোর দিকেও তাঁরা কাজ করছেন। বিদ্যুৎ উদ্বৃত্ত রাজ্যে রূপান্তর এবং সঞ্চালন ক্ষতি হ্রাস ও সৌরশক্তির প্রচারে মনোযোগ শক্তি স্বাধীনতা এবং স্থায়িত্বের দিকে একটি পদক্ষেপ নির্দেশ করে। প্রকৌশলীদের ভূমিকা কেবল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণেই নয়, বরং দক্ষ বিতরণ নেটওয়ার্ক ডিজাইন এবং নবায়নযোগ্য শক্তি উৎসগুলিকে একত্রীভূত করণেও গুরুত্বপূর্ণ। এটি রাজ্যের শিল্প বৃদ্ধি এবং জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতাকে সরাসরি প্রভাবিত করে। বিদ্যুৎ উদ্বৃত্ত হওয়া শিল্প উন্নয়নের এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য একটি বিশাল সক্ষমতা, বিশেষ করে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অনুন্নয়নের ঐতিহাসিক চ্যালেঞ্জগুলির পরিপ্রেক্ষিতে। প্রকৌশলীদের কাজ কেবল বিদ্যুৎ উৎপাদন ছাড়িয়ে সম্পূর্ণ শক্তি ইকোসিস্টেমকে অপ্টিমাইজ করা জড়িত, যা দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব এবং বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ত্রিপুরার নগর অঞ্চলগুলিকে আরও বাসযোগ্য, নাগরিক-বান্ধব, টেকসই এবং স্থিতিস্থাপক করে তোলার লক্ষ্যে প্রকৌশলীরা কাজ করছেন। আগরতলাকে একটি স্মার্ট সিটি হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সমন্বিত কমাণ্ড সেন্টার, ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা এবং অপরাধ দমনে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার করা হচ্ছে। (০)-এর সহায়তায় 'ত্রিপুরা আরবান অ্যাণ্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট' ১২টি নগর স্থানীয় সংস্থার (০) পৌর পরিকাঠামো এবং জনসেবা উন্নত করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে, যার মধ্যে রয়েছে জল সরবরাহ, স্যানিটেশন, ঝড় জল নিষ্কাশন এবং নগর সড়ক উন্নয়ন। 'স্মার্ট সিটি' এবং সমন্বিত নগর পরিকল্পনার দিকে পরিবর্তন মৌলিক পরিকাঠামো সরবরাহের বাইরে নগর ব্যবস্থাপনার একটি আরও পরিশীলিত, ডেটা-চালিত পদ্ধতির ইঙ্গিত দেয়। নির্মাণ প্রকৌশলীরা ঐতিহ্যবাহী নির্মাতা থেকে প্রযুক্তি এবং নগর ব্যবস্থার সংহতকারীতে রূপান্তরিত হচ্ছেন, স্মার্ট সমাধানের মাধ্যমে ট্রাফিক, বর্জ্য এবং জননিরাপত্তার মতো জটিল সমস্যাগুলি মোকাবেলা করছেন। এটি জীবনযাত্রার মান এবং শাসনের জন্য একটি উচ্চ-স্তরের অবদানকে প্রতিনিধিত্ব করে। মুখ্যমন্ত্রী ড. মানিক সাহা বারবার জোর দিয়েছেন যে, রাস্তা, পানীয় জল এবং বিদ্যুৎ— এইগুলিই মানুষের সবচেয়ে মৌলিক চাহিদা এবং প্রকৌশলীদের দায়িত্ব হল এগুলি নিশ্চিত করা। নতুন স্কুল ভবন, স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং প্রশাসনিক কার্যালয়গুলির ভার্চুয়াল উদ্বোধন, গ্রামীণ এলাকায় মৌলিক পরিষেবাগুলির সহজলভ্যতা নিশ্চিত করছে, যা সরাসরি মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করছে।

৪। শিল্প ও সামাজিক পরিকাঠামো ঃ সমৃদ্ধি সোপান

ত্রিপুরার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য শিল্প পরিকাঠামো উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ত্রিপুরা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ইনফ্রাস্ট্রকচার সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (০) এর অধীনে প্রকোশলীরা শিল্পাঞ্চলগুলিতে জলবায়ু-সহনশীল রাস্তা (৩৪ কিমি), ঝড় জল নিষ্কাশন (৬৬ কিমি), বৃষ্টির জল সংরক্ষণ ব্যবস্থা (৭০টি) এবং জল সরবরাহ পাইপলাইন (৩৫ কিমি) তৈরি করছেন। শিল্পাঞ্চলগুলির বিদ্যুৎ বিতরণ নেটওয়ার্ক আপগ্রেড করা, সোলার পাওয়ার সুবিধা স্থাপন (৭টি শিল্পাঞ্চলে) এবং আধুনিক শিল্প শেড নির্মাণেও তাঁরা জড়িত। জলবায়ু-সহনশীল বৈশিষ্ট্যসহ শিল্পাঞ্চলের উন্নয়ন এবং দক্ষতা উন্নয়নের উপর যুগপত ফোকাস অর্থনৈতিক বৃদ্ধির জন্য একটি সমন্বিত পদ্ধতির ইঙ্গিত দেয়। নির্মাণ প্রকৌশলীরা কেবল কারখানা তৈরি করছেন না, তাঁরা শিল্পাঞ্চল এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য ভৌত পরিকাঠামো তৈরি করে ভবিষ্যতের কর্মীবাহিনীর জন্য ভিত্তি স্থাপন করছেন, যা বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং রাবার, বাঁশ এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের মতো খাতে স্থানীয় প্রতিভা বিকাশের জন্য অপরিহার্য।

শিক্ষাক্ষেত্রে, প্রকৌশলীরা নতুন স্কুল ভবন, বিজ্ঞান গবেষণাগার এবং ছাত্রাবাস নির্মাণ করছেন, যা গ্রামীণ এলাকায় এস.টি.ই.এম শিক্ষাকে উৎসাহিত করছে এবং শিক্ষার্থীদের জন্য উন্নত শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করছে। স্বাস্থ্যসেবা খাতে, নতুন ব্লক পাবলিক হেলথ ইউনিট (০) এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির (০) সম্প্রসারণের মাধ্যমে গ্রামীণ অঞ্চলে চিকিৎসা পরিষেবা উন্নত করা হচ্ছে। এই পরিকাঠামো প্রকল্পগুলি সরাসরি এবং পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে। নির্মাণ কাজ নিজেই প্রচুর কর্মসংস্থান তৈরি করে এবং উন্নত পরিকাঠামো শিল্প স্থাপন এবং পর্যটন বিকাশের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে, যা আরও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ ও জল সরবরাহ গ্রামীণ জীবনযাত্রার মান উন্নত করছে এবং কৃষকদের আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে।

৫। প্রকৌশলীদের চ্যালেঞ্জ ও উদ্ভাবনী সমাধান ঃ প্রতিকূলতার মাঝেও এগিয়ে চলা

ত্রিপুরার ভূখণ্ড পার্বত্য এবং ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চল V-এর অন্তর্ভুক্ত, যা নির্মাণ প্রকৌশলীদের জন্য বিশেষ চ্যালেঞ্জ তৈরি করে। ১৮৯৭ এবং ১৯৫০ সালে রিখটার স্কেলে ৮ বা তার বেশি মাত্রার ভূমিকম্পের অভিজ্ঞতা ত্রিপুরার রয়েছে। এছাড়াও, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব যেমন সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, চরম আবহাওয়া এবং জলের অভাবের মতো বিষয়গুলি অবকাঠামো নির্মাণে নতুন চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসছে। ভূমিধ্বস এবং বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগও একটি বড় সমস্যা, যা পরিবহন নেটওয়ার্ক এবং বাণিজ্য পথকে ব্যাহত করে। ত্রিপুরাকে সিসমিক জোন V-এ শ্রেণীবদ্ধ করা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতি এর দুর্বলতা প্রকৌশলকে কেবল নির্মাণ থেকে ঝুঁকি প্রশমন এবং স্থিতিস্থাপকতা নির্মাণে রূপান্তরিত করে। প্রকৌশলীরা কেবল কার্যকারিতার জন্য ডিজাইন করছেন না, তাঁরা একটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে বেঁচে থাকা এবং দীর্ঘমেয়াদী অভিযোজনযোগ্যতার জন্য ডিজাইন করছেন।

এই চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবিলায় প্রকৌশলীরা উদ্ভাবনী সমাধান প্রয়োগ করছেন। ভূমিকম্প ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভবনগুলির রেট্রোফিটিং এবং প্রকৌশলী ও রাজমিস্ত্রিদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। ভূমিধ্বস ব্যবস্থাপনার জন্য টপোগ্রাফির সার্ভে, জিওটেকনিক্যাল ডেটা বিশ্লেষণ এবং মাটি শক্তিশালীকরণের কৌশল যেমন সয়েল নেইলিং, রিটেইনিং ওয়াল এবং রিইনফোর্সড আর্থ স্ট্রাকচার ব্যবহার করা হচ্ছে। নদী বাঁধ অধ্যয়ন (মনু ও হাওড়া নদীর জন্য) এবং বন্যা পূর্বাভাস স্টেশন স্থাপনও চলছে। ত্রিপুরার চরম পরিবেশগত এবং ভূতাত্ত্বিক চ্যালেঞ্জগুলি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারের ভূমিকাকে একজন সাধারণ নির্মাতা থেকে জননিরাপত্তা এবং দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিস্থাপকতার রক্ষকে উন্নীত করে।

পরিবেশগত প্রভাব কমাতে এবং দীর্ঘমেয়াদী স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে সবুজ ও টেকসই নির্মাণ পদ্ধতি গ্রহণ করা হচ্ছে। পি.এম.জি.এস.ওয়াই-এর অধীনে বর্জ্য প্লাস্টিক, কোল্ড মিক্স, রাসায়নিক স্টেবিলাইজার এবং সোলার এনার্জির মতো নতুন ও সবুজ প্রযুক্তির ব্যবহার উৎসাহিত করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী প্রকৌশলীদের দক্ষতা বাড়াতে এবং আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণের সুযোগ অন্বেষণ করতে উৎসাহিত করেছেন, যাতে তাঁরা আধুনিক প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে রাজ্যের উন্নয়নে আরও কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেন। "নিউ জেনারেশন ইনোভেশন নেটওয়ার্ক" প্রকল্প আইটি সেক্টরে স্টার্ট-আপগুলির জন্য পরিকাঠামো উন্নয়নে সহায়তা করছে, যা প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সাথে প্রকৌশলীদের কাজকে সংযুক্ত করছে।

৬। সরকারের স্বীকৃতি ও ভবিষ্যৎ দিশা ঃ এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা

ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ড. মানিক সাহা বারবার প্রকৌশলীদের অপরিহার্য ভূমিকার ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি তাঁদেরকে 'রাজ্যের পরিকাঠামো উন্নয়ন ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে' বলে উল্লেখ করেছেন এবং 'প্রকৌশলীগণ হচ্ছেন উন্নয়নের কাণ্ডারি'

হিসেবে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে, প্রকৌশলীরাই 'সরকারের মুখ', কারণ তাঁরা সরাসরি জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণে কাজ করেন। তিনি প্রকৌশলীদের 'প্রশংসনীয় সেবা কার্যক্রম এবং রাজ্যের অগ্রগতিতে অবদানের' জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর প্রকৌশলীদের প্রতি এই শক্তিশালী এবং বারবার জনসমক্ষে সমর্থন কেবল প্রশংসার চেয়েও বেশি কিছু, এটি পেশার মর্যাদা বাড়াতে এবং প্রতিভা ধরে রাখতে বা আকর্ষণ করতে একটি কৌশলগত পদক্ষেপ। তাঁদেরকে 'সরকারের মুখ' বলে অভিহিত করার মাধ্যমে, তিনি পরোক্ষভাবে স্বীকার করছেন যে শাসনের জনমত প্রকৌশলীদের দ্বারা নির্মিত বাস্তব পরিকাঠামোর সাথে সরাসরি জড়িত। এটি একটি ইতিবাচক চক্র তৈরি করে যেখানে রাজনৈতিক সদিচ্ছা প্রকৌশলীদের ক্ষমতায়ন করে, যাদের দৃশ্যমান কাজ তখন সরকারের প্রতি জনবিশ্বাসকে শক্তিশালী করে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'হীরা' মডেল (০) উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নে এক নতুন গতি এনেছে। কেন্দ্রীয় সহায়তা ইতিমধ্যে বহুলাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে (২০০৯ - ১৪) সালের ৩৫০০ কোটি টাকা থেখে ২০১৮ - ২০১৯ সালে ১২০০০ কোটি টাকা) এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন দ্রুত হয়েছে। এই মডেলের অধীনে ত্রিপুরায় ছয়টি নতুন জাতীয় সড়ক নির্মাণ এবং ইন্টারনেট ও রেল সংযোগের ব্যাপক উন্নতি হয়েছে।

সরকারের লক্ষ্য ত্রিপুরাকে কেবল উত্তর-পূর্বাঞ্চলে নয়, সমগ্র ভারতে একটি মডেল রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলা। এই স্বপ্ন পূরণে প্রকৌশলীদের ভূমিকা অপরিহার্য। তাঁদের দক্ষতা, উদ্ভাবনী ক্ষমতা এবং প্রতিকূলতা মোকাবিলায় দৃঢ়তা ত্রিপুরার ভবিষ্যৎ নির্মাণে অবিস্মরণীয় স্বাক্ষর রাখবে। ২০৪৭ সালের মধ্যে ত্রিপুরাকে একটি সম্পূর্ণ উন্নত রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় প্রকৌশলীরাই মূল চালিকাশক্তি।

৭। উপসংহার ঃ ত্রিপুরার উন্নয়নে প্রকৌশলীদের অবিস্মরণীয় স্বাক্ষর

ত্রিপুরার প্রতিটি ধুলোমাখা রাস্তা, প্রতিটি আলোকিত ঘর এবং প্রতিটি আধুনিক স্থাপনার পেছনে রয়েছে নির্মাণ প্রকৌশলীদের অদম্য ইচ্ছা, কঠোর পরিশ্রম এবং সূক্ষ্ম পরিকল্পনা। তাঁরা সত্যিই 'ত্রিপুরার উন্নয়নের অন্যতম কারিগর' — সেই অদৃশ্য শক্তি, যা নীরবে কাজ করে চলেছে ত্রিপুরার প্রগতির চাকা সচল রাখতে। ভূগোল ও ইতিহাসের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে, আধুনিক প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনী সমাধান প্রয়োগ করে এবং সরকারের দূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গির সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, ত্রিপুরার প্রকৌশলীরা এক সমৃদ্ধ ও স্থিতিশীল ভবিষ্যতের ভিত্তি স্থাপন করছেন। তাঁদের অবিস্মরণীয় অবদান ত্রিপুরার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকেব।

রেফারেন্স ঃ

1. Tripura - Wikipedia, accessed August 5, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Tripura
2. (PDF) INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN NORTH EAST INDIA.....accessed August 5, 2025 https://www.researchagate.net/publication/392681395 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN NORTH EAST INDIA ISSUES AND CHALLENGES.
3. ica.tripura.gov.in, accessed August 5, 2025, https://ica.tripura.gov.in/sites/default/files/2666-25%20CM%20inaugurated%2055th%20Annual%20General%20Conference%20of%20TSEA0.pdf.
4. How the Contributions of Civil Engineering Shape Modern Living..... accessed August 5, 2025. https://mcl.edu.ph/contribution-of-civil-engineers-to-urban-development/
5. Tripura CM stresses timely project completion, Says Engineers are face of Govt. accessed August 5, 2025, https://tripurachronicle.in/local-news/tripura-cm-stresses-timely-project-completion-says-engineers-are-face-of-govt/
6. Basic Infrastructure | Official Website of Department of Industries and ..... accessed August 5, 205, https://industries.tripura.gov.in/basic-infrastructure

7. Untitled, accessed August 5, 2025, https://tripura.gov.in/sites/default/files/Finance Minister%27s Speech in Bengali on Budget 2025-26pdf.
8. Trade, Climae, and Connectivity : Challenges and Opportunities for.....accessed August 5, 2025, https://wwe.orfonlin.org/expet-speak/trade-climate-and-connectivity-challenges-and-opportunities-for-northeast-india
9. TRIPURA'S EVOLVING ROLE AS THE GATEWAY TO NORTHEAST.....accessed August 5, 2025 https://ijfans.org/uploads/paper/61f2d78da084c0f649a8e2806b6e7d.pdf
10. Press Release : Press Information Bureau - PIB, accessed August 15, 2025, htt://www,pib.gov.in/pressrelwasepage.aspx?PRID=1704738
11. Tripura CM highlights engineers' role in state development, urges...,accessed August 5, 2025.
12. আমাদের সম্পর্কে - rural Tripura, accessed August 5,2025, https://rural.tripura.gov.in/bn/about-us.
13. State Action Plan on Climate Change : Tripura, accessed August 5, 2025, https://moef.gov.in/uploads/2017/09/TRIPURA.pdf
14. 53276-002 : Tripura Urban and Tourism Development Project/ Asian ..., accessed August 5,2025,https:www.adb.org/projects/53276-002main
15. Tripura Chief Minister virtually inaugurates slew of develoment..., accessed August5,2025,htt://assamtribune.com/north-east/tripura-chief-minister-virtually-inaugurates-slew-of-development-projects-1581822
16. 5821-001:Tripura Industrial Infrastructure Sector Development...,accessed August 5,2025, https://industries.tripura.gov.in/sites/default/files/Tripura%20Industrial%20Infrastructure%20Sectore%20 Development %20Program%20-% 20Dukli%20Industrial%20Estate%20Resettlement%20Due%20Diligence%20Report.pdf
17. ত্রিপুরা সরকার accessed August 5, 2025, https://tripura.gov.in/sites/default/files/Press Release 15 08 2019 1.pdf.
18. Infrastructure Development of Industrial Estates of Tripura, accessed August5,2025. https://industries.tripura.gov.in/sites/default/files/skills%20and%20capacity%20develomen%20expertfinal%20report%20Aug%2023-02feb2024.pdf
19. South Tripura District, accessed August 5, 2025, https://southtripura.nic.in/bn/scheme%E0% A6%9C% E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%80%E0%A6%AF%E0%A6%BC %E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%A3-%E0%A6%9C%E0%A7%80%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A6%AF%E0% A6%BE% E0%A6% A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%
20. Disaster Management / revenue, accessed August 5, 2025, https://revenue.tripura.gov.in/disaster-management
21. Landslid Management Solutions/ Lea&Braze Engineering, accessed August 5, 2025,https://leabraze.com/landslides/
22. Top Cilil Engineers in West Tripura - Justdial, accessed August 5, 2025, https://www.justdial.com/West-Tripura/Civil-Engineer/nct-10100398
23. NEW TECHNOLOGIES INNOVATIONS IN RURAL ROADS, accessed August 5, 2025,https://pmgsy.nic.in/sites/default/files/Souvenir-Technical-Document.pdf
24.আগামী দিনে আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে আইনটি সেক্টর : মুখ্যমন্ত্রী Jagaran Tripura, accessed August 5, 2025. https://jagarantripura.com/2022/10/19/it-sector-will-play-an-important-role-in-building-a-self-reliant-tripura-in-the-coming-days-chief-minister/
25. Tripura governments message for engineers to return to the state for ..., accessed August 5, 2025, https:www.aajkaal.in/story/24002/tripuragovernments message for engineers to return to the state for infrastructure development

গ্রামীণ নারী ক্ষমতায়নে পঞ্চায়েতের ভূমিকা

দিব্যশ্রী দাশগুপ্ত।

ভারতের মতো বৈচিত্র্যময় সমাজে নারী ক্ষমতায়ন একটি সুদূরপ্রসারী প্রক্রিয়া। যেখানে পঞ্চায়েত রাজ ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। এই ব্যবস্থায় স্থানীয় সরকার কেবলমাত্রপরিষেবাদানকারী নয়, বরং নারীর অধিকার রক্ষাকারী এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিতকারী এক শক্তিশালী কাঠামো।

রাজ্য সরকারের সুদূরদর্শী নীতি-পরিকল্পনা এবং পঞ্চায়েতিরাজ ব্যবস্থার সক্রিয়তা — এই দুই মিলেই ত্রিপুরার গ্রামীণ নারীরা আজ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে চলেছেন। পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় সংরক্ষিত আসনের সুযোগ পেয়ে বহু নারী স্থানীয় শাসনব্যবস্থায় নিজেদের পরিচিতি গড়ে তুলেছেন। শুধু নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবেই নন, তাঁরা গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প অনুমোদন ও বাজেট বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছেন।

সরকারি সহায়তায় পরিচালিত প্রশিক্ষণ ও লিডারশিপ কর্মশালা তাঁদের প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি করেছে এবং বাস্তব সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাঁদের আত্মবিশ্বাস যোগাচ্ছে। পঞ্চায়েতের নারী সদস্যরা এখন স্বাস্থ্য, শিক্ষার অধিকার, নারী ও শিশুর পুষ্টি, পরিচ্ছন্নতা, যৌনহেনস্থা প্রতিরোধ ইত্যাদি বিষয়ে নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে সচেতনতা ছড়াচ্ছেন।

'স্বচ্ছ ভারত', 'জাতীয় পুষ্টি অভিযান', 'সাক্ষর ভারত মিশন' ইত্যাদি কেন্দ্র ও রাজ্যসরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সঙ্গে পঞ্চায়েতের সম্মিলিত প্রয়াসে গ্রামীণ মহিলারা শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের গুরুত্ব অনুধাবন করছেন এবং সে অনুযায়ী পদক্ষেপ নিচ্ছেন। 'ত্রিপুরা রুরাল লাইভলিহুড মিশন' (TRLM) পঞ্চায়েতের সহায়তায় মহিলাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠনে উৎসাহিত করছে। এই গোষ্ঠীগুলির মাধ্যমে তাঁরা ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণ, প্রশিক্ষণ, উৎপাদনমূলক কাজ ও বিপননে যুক্ত হচ্ছেন।

সরকার সমর্থিত এই উদ্যোগগুলি মহিলাদের আরো বেশী কর্মমুখী মানসিকতা গড়ে তুলছে । যা পরিবার ও সমাজে তাঁদের আর্থিক গুরুত্ব অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছে। পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও আইনগত সহায়তা নিয়েও পঞ্চায়েত আজ সচেতন এবং তৎপর। এই ধরণের সামাজিক নিরাপত্তা বলয় নারীদের জীবনে স্থিতিশীলতা ও আত্মবিশ্বাস তৈরী করছে, যা তাঁদের বৃহত্তর ক্ষমতায়নের ভিত্তি।

পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গ্রামীণ নারীদের শুধু প্রশাসনিক ক্ষমতাই প্রদান করেনি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির পথ ও প্রদর্শন করছে। যা বৃহত্তর সমাজে রচনা করছে এক শক্তিশালী কাঠামো। রাজ্য সরকারের সহায়তায় পরিচালিত প্রশিক্ষণ, উন্নয়নমূলক স্কিম এবং সামাজিক সুরক্ষামূলক উদ্যোগগুলির কার্যকর বাস্তবায়ন নারীদের ক্ষমতায়নের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে তুলছে।

এই পরিবর্তন শুধুমাত্র ব্যক্তিগত জীবনে নয়, বরং গোটা গ্রামীণ সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তনের বার্তা বহন করে এনেছে। পঞ্চায়েত তাই আজ এক নিঃশব্দ বিপ্লবের প্রতীক। যেখানে নারী নেতৃত্ব একটি নতুন ভোরের বার্তা বহন করছে। ত্রিপুরার নারীরাও এর ব্যতিক্রম নয়।

নিয়ন্ত্রিত মোবাইল ব্যবহার ঃ একটি পথ সুস্থ জীবনের দিকে

ডাঃ সঞ্জয় আইন

দীর্ঘ মোবাইল ডিভাইস ব্যবহারের প্রভাব এবং ডোপামিন ডিটক্স ঃ

আধুনিক যুগে মোবইল ডিভাইস আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। যোগাযোগ, তথ্য আদান-প্রদান, বিনোদন, এমনকি কাজের ক্ষেত্রেও স্মার্টফোন এবং ট্যাবলেট আমাদের সঙ্গী। কিন্তু এই ডিভাইসগুলির অতিরিক্ত ব্যবহার আমাদের শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক স্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এই সমস্যা মোকাবেলায় 'ডোপামিন ডিটক্স' নামক একটি পদ্ধতি ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এই নিবন্ধে আমরা দীর্ঘ মোবাইল ব্যবহারের প্রভাব এবং ডোপামিন ডিটক্সের গুরুত্ব ও পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব।

দীর্ঘ মোবাই ব্যবহারের প্রভাব

১। শারীরিক স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব

দীর্ঘক্ষণ মোবাইল স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকলে চোখের উপর ব্যাপক চাপ পড়ে। এটি ডিজিটাল আই স্ট্রেন বা কম্পিউটার ভিশন সিনড্রোম নামে পরিচিত, যার ফলে চোখে শুষ্কতা, জ্বালাপোড়া, এমনকি দৃষ্টিশক্তির সমস্যা দেখা দিতে পারে। এছাড়া, মোবাইল ব্যবহারের সময় মাথা নিচু করে বা অস্বস্তিকর ভঙ্গিতে বসে থাকার ফলে ঘাড় ও পিঠে ব্যথা, যা 'টেক নেক' নামে পরিচিত, একটি সাধারণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাতে মোবাইলের নীল আলো ঘুমের হরমোন মেলাটোনিনের উৎপাদন ব্যাহত করে, যার ফলে অনিদ্রা বা ঘুমের গুণগত মান হ্রাস পায়।

২। মানসিক স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব

মোবাইল ডিভাইসের অতিরিক্ত ব্যবহার মানসিক স্বাস্থ্যের উপরও গভীর প্রভাব ফেলে। সামাজিক মাধ্যম, গেমিং বা অনলাইন কনটেন্টে অতিরিক্ত সময় ব্যয় করা মনোযোগের ঘাটতি, উদ্বেগ এবং বিষণ্ণতার কারণ হতে পারে। সামাজিক মাধ্যমে অন্যের জীবনের সাথে নিজের তুলনা করা (সোশ্যাল কম্প্যারিসন) আত্মসম্মান হ্রাস করে এবং মানসিক চাপ বাড়ায়। এছাড়া, অতিরিক্ত স্ক্রিন টাইম মস্তিষ্কের ডোপামিন নিঃসরণকে উদ্দীপিত করে, যা আসক্তির মতো অবস্থা সৃষ্টি করে। ফলস্বরূপ, ব্যক্তি ক্রমাগত নতুন নোটিফিকেশন বা কনটেন্টের জন্য মোবাইল চেক করতে বাধ্য বোধ করেন।

৩। সামাজিক সম্পর্কের উপর প্রভাব

দীর্ঘ মোবাইল ব্যবহার ব্যক্তিগত সম্পর্কের উপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। পরিবার বা বন্ধুদের সাথে মুখোমুখি কথোপকথনের পরিবর্তে মোবাইলে ব্যস্ত থাকা সম্পর্কের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করে। এটি বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সামাজিক দক্ষতা হ্রাসের কারণ হচ্ছে। এছাড়া, অনলাইনে অতিরিক্ত সময় ব্যয় করা বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা ও স্মৃতি তৈরির সুযোগ কমিয়ে দেয়।

ডোপামিন এবং আসক্তির বিজ্ঞান

ডোপামিন হল মস্তিষ্কের একটি নিউরোট্রান্সমিটার, যা আনন্দ, পুরস্কার এবং প্রেরণার সাথে সম্পর্কিত। মোবাইল ডিভাইসে সামাজিক মাধ্যম, গেমিং বা ভিডিও দেখার সময় প্রতিবার নতুন কনটেন্ট বা নোটিফিকেশন পেলে মস্তিষ্কে ডোপামিন নিঃসরণ হয়। এই ডোপামিন মস্তিষ্ককে তাৎক্ষণিক তৃপ্তি দেয়, যা আমাদের বারবার মোবাইল ব্যবহারে উৎসাহিত করে। কিন্তু এই ক্রমাগত ডোপামিন নিঃসরণ মস্তিষ্কের পুরস্কার ব্যবস্থাকে অতিরিক্ত উদ্দীপিত করে, যার ফলে ব্যক্তি সাধারণ কাজে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন এবং শুধুমাত্র ডিজিটাল উদ্দীপনার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। এটি এক ধরণের আসক্তি, যা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ডোপামিন ডিটক্স অত্যন্ত কার্যকর।

ডোপামিন ডিটক্স কী ?

ডোপামিন ডিটক্স হল এমন একটি প্রক্রিয়া, যেখানে ব্যক্তি

সচেতনভাবে ডোপামিন-উদ্দীপক ক্রিয়াকলাপ, যেমন মোবাইল ব্যবহার, সামাজিক মাধ্যম, বা গেমিং থেকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দূরে থাকেন। এর উদ্দেশ্য হল মস্তিষ্কের ডোপামিন স্তরকে স্বাভাবিক করা মানসিক স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনা এবং জীবনের সাধারণ ক্রিয়াকলাপে আনন্দ পুনরুদ্ধার করা। এই পদ্ধতি ব্যক্তিকে তাদের সময় এবং মনোযোগ নিয়ন্ত্রণে ফিরিয়ে আনে এবং অতিরিক্ত ডিজিটাল নির্ভরতা কমায়।

ডোপামিন ডিটক্সের উপকারিতা

১। মানসিক স্বচ্ছতা এবং মনোযোগ বৃদ্ধি

ডোপামিন ডিটক্স মনকে শান্ত করে এবং মনোযোগ ধরে রাখার ক্ষমতা বাড়ায়। এটি ব্যক্তিকে গুরুত্বপূর্ণ কাজে মনোনিবেশ করতে সাহায্য করে।

২। ঘুমের গুণগত মান উন্নতি

মোবাইল থেকে দূরে থাকা রাতের ঘুমের মান উন্নত করে, কারণ নীল আলোর প্রভাব কমে এবং মেলাটোনিন উৎপাদন স্বাভাবিক হয়।

৩। মানসিক চাপ হ্রাস

সামাজিক মাধ্যম থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার ফলে তুলনামূলক চিন্তা এবং উদ্বেগ কমে, যা মানসিক শান্তি বাড়ায়।

৪। সামাজিক সম্পর্কে উন্নতি

ডিটক্সের সময় ব্যক্তি পরিবার ও বন্ধুদের সাথে বেশি সময় কাটান, যা সম্পর্ককে আরও গভীর করে।

৫। জীবনের প্রকৃত আনন্দ পুনরুদ্ধার

ডিজিটাল উদ্দীপনার উপর নির্ভরতা কমে গেলে ব্যক্তি প্রকৃতি, শখ, বা সাধারণ ক্রিয়াকলামে আনন্দ খুঁজে পান।

কীভাবে ডোপামিন ডিটক্স করবেন?

১। লক্ষ নির্ধারণ করুন

ডিটক্সের সময়কাল নির্ধারণ করুন, যেমন একদিন, এক সপ্তাহ বা এক মাস। নতুনদের জন্য ২৪ ঘন্টার ডিটক্স শুরু করা সহজ হতে পারে।

২। মোবাইল ব্যবহার সীমিত করুন

সামাজিক মাধ্যম, গেমিং বা অপ্রয়োজনীয় অ্যাপ ব্যবহার বন্ধ করুন। প্রয়োজনে মোবাইল বন্ধ রাখুন বা নোটিফিকেশন বন্ধ করুন।

৩। বিকল্প ক্রিয়াকলাপে মন দিন

পড়া, লেখা, ব্যায়াম, ধ্যান বা প্রকৃতির মাঝে সময় কাটানোর মতো ক্রিয়াকলাপে মনোনিবেশ করুন।

৪। পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করুন

মোবাইল বা ডিজিটাল ডিভাইস দৃষ্টির বাইরে রাখুন। বেডরুমে মোবাইল ব্যবহার এড়িয়ে চলুন।

৫। ধীরে ধীরে অভ্যাস গড়ুন

ডিটক্সের পর মোবাইল ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করুন, যাতে দীর্ঘমেয়াদী ভারসাম্য বজায় থাকে।

উপসংহার

দীর্ঘ মোবাই ডিভাইস ব্যবহার আমাদের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে, তবে ডোপামিন ডিটক্স এই সমস্যার একটি কার্যকর সমাধান হতে পারে। এই পদ্ধতি আমাদের মনকে পুনরুজ্জীবিত করে, জীবনের প্রকৃত আনন্দ ফিরিয়ে আনে এবং সুস্থ জীবনযাপনের পথ দেখায়। তাই, আসুন আমরা সচেতনভাবে আমাদের মোবাইল ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করি এবং ডোপামিন ডেটক্সের মাধ্যমে একটি সুষম ও সুখী জীবন গড়ে তুলি।

"চোখের আলোয় দেখেছিলেম....."

ডাঃ ছন্দম আচার্য

মানব দেহের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল চোখ, যা আমাদের চারপাশের পৃথিবীকে দেখতে, শরীরের ভারসাম্য, সার্কাডিয়ান ছন্দ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। তাই চোখের যত্ন নেওয়া খুবই জরুরী। অনেকে অনেক কিছু ভাবলেও চোখের যত্ন নেওয়াটা কিন্তু শুরু হওয়া উচিত ছোটোবেলা থেকেই। অভিভাবকদের সামান্য অবহেলা ডেকে আনতে পারে ছোটদের ভবিষ্যতের সমস্যা।

অনেক সময়ই দেখা যায়, অভিভাবকরা তাদের ব্যস্ততম জীবন কিছুটা সহজ করার জন্য বা আধুনিক জীবনে ছেলেমেয়েদের বায়নার জন্য তাদের এককিত্ব কাটানোর জন্য মোবাইল ফোন বা লেপটপ বা টেলিভিশন-এর ব্যবহার করতে দেয়, যা খুবই ক্ষতিকর। মোবাইল, লেপটপ অথবা টেলিভিশন থেকে নির্গত ক্ষতিকর রশ্মি যেমন ছোটদের চোখের জন্য ক্ষতি, তেমনি এগুলি শিশুদের মানসিক বিকাশেও বাধা প্রদান করে থাকে। কিছু গবেষণায় দেখা গেছে, অতিরিক্ত মোবাইল ফোন এর ব্যবহার অটিজম এর মত সমস্যার সৃষ্টি করে। WHO এর একটি তথ্য অনুযায়ী ১(এক) বছরের নীচের শিশুদের মোবাইল ফোন দেখানো নিষিদ্ধ, ১ থেকে ২ বছর পর্যন্ত ১ ঘন্টার কম, ২ থেকে ৫ বছর পর্যন্ত ১ ঘন্টা, ৬ থেকে ১০ বছর পর্যন্ত ১ থেকে ২ ঘন্টা এবং ১০ বছরের উপরে ২ ঘন্টার বেশী ডিজিটাল screen দেখানো উচিত নয়।

যে অভিভাবকরা, চশমা ব্যবহার করে থাকেন, তাদের ছেলেমেয়েদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষা করানো উচিত। কারণ জেনেটিক কারণে ছেলেমেয়েদেরও চশমার প্রয়োজন হলে তা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্যবহার করানো উচিত এবং অল্প সময়ের ব্যবধানে দৃষ্টি শক্তির পরীক্ষা করানো উচিত, নতুবা Amblyopia এর মতে সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে যেখানে দৃষ্টিশক্তির ক্ষমতা কমে যায় সঠিক চশমা ব্যবহারের পরেও। তাই অল্প বয়সেই চোখের দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষা এবং দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতার ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া খুবই জরুরী। ৪০ বছরের পর সবাইকেই বছরে একবার চোখ পরীক্ষা করানো দরকার।

উপযুক্ত ভিটামিন সমৃদ্ধ খাবার ও চোখের জন্য খুবই উপকারী। অতীতে অজ্ঞতা, দারিদ্রতার কারণে আমাদের দেশের অনেক রাতকানা রোগের আক্রান্ত রোগী দেখা যেত। কিন্তু আজকাল ভারত সরকারের হস্তক্ষেপের ফলে বিভিন্ন খাদ্যে ভিটামিন দেওয়া থাকে, তাছাড়াও জাতীয় টিকাকরণ এর মাধ্যমে ভিটামিন-এ খাওয়ানো হয়ে থাকে। চোখের জন্য ভিটামিন-এ, ই, সি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই আমাদের সকলকে সবুজ শাক-সব্জি, লেবু জাতীয় ফল, হলুদ পাকা ফল প্রচুর পরিমাণে খাওয়া দরকার। এছাড়া OMEGA-ও ফ্যাটি অ্যাসিড ও আমাদের চোখের জন্য খুবই উপকারী, যা আমাদের Dry Eye Diesease কমাতে সাহায্য করে। OMEGA-ও ফ্যাটি অ্যাসিড সাধারণত বিভিন্ন সামুদ্রিক মাছ যেমন সার্ডিন, সালমন ইত্যাদি শনবীজ, চিয়া বীজ, আসরোট এবং কিছু সবুজ শাক-সব্জিতে পাওয়া যায়।

ক্ষতিকারক VV রশ্মি চোখের রেটিনা এবং লেন্সের জন্য খুবই ক্ষতিকর। এই রশ্মি রেটিনার সমস্যা, ছানি ছাড়াও Pterygium (পর্দা) এর মত অন্যান্য সমস্যার সৃষ্টি করে থাকে। তাই রোদ্রে কাজ করার সময় উপযুক্ত চশমা ব্যবহার করা দরকার।

চোখের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা খুবই প্রয়োজন কারণ নোংরা হাতে বা হাত না ধুয়ে চোখে হাত দেওয়া বা অতিরিক্ত কচলানো, চোখে গুরুতর জীবাণু সংক্রমণ করতে পারে যা খুবই বিপদজনক। তাই হাত সাবানদিয়ে ধোয়ার পরই বা পরিষ্কার জল দিয়ে ধোয়ার পরই চোখে হাত দেওয়া উচিত। চোখে কোনো ধুলোবালি

বা কিছু ভিতরে ঢুকলে ঠাণ্ডা পরিষ্কার জল দিয়ে পরিষ্কার করা যেতে পারে।

যারা প্রতিনিয়ত কম্পিউটার, লেপটপ, মোবাইল ব্যবহার করে থাকেন তাদের ২০-২০-২০ নিয়ম প্রতিনিয়ত পালন করা দরকার। এটি হলে প্রতি ২০ মিনিট পর পর ২০ সেকেণ্ডের জন্য ২০ ফুট দুরে তাকিয়ে থাকা, যা চোখের উপর অতিরিক্ত চাপ পড়া কমিয়ে দেয় এবং চোখকে রিলাক্স রাখতে সাহায্য করে। যদি শীততাপ নিয়ন্ত্রিত রুমে বেশীক্ষণ থাকা হয় তাহলে Wbricating চোখের ড্রপ ব্যবহার করা যেতে পারে যা চোখকে আর্দ্র রাখতে সাহায্য করে। চোখের আর্দ্রতা বজায় রাখার জন্য ধূমপান বন্ধ রাখা দরকার। প্রচুর পরিমাণ জলপান করা দরকার, সাথে পুষ্টিকর খাবার খাওয়া ও খুবই জরুরী যা চোখের গ্ল্যাণ্ডগুলিকে ভালো রাখতে সাহায্য করে। প্রতিদিন ৬ - ৮ ঘন্টা ঘুম চোখকে বিশ্রাম দেবার জন্য খুবই জরুরী।

সর্বোপরি, কোনো রকমের অসুবিধা যেমন চোখ ব্যাথা, লাল হয়ে যাওয়া, ক্রমাগত জল পড়া, আলোর দিকে তাকালে চোখের ব্যাথা হওয়া, হঠাৎ দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া ইত্যাদি দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।

A Technical Approach to Health Awareness is Need of the Hour

Jayanta Nanda Chakraborty,

To me, Health is subjective matter. It mostly attributed to personal. One couple has beautiful joyous event of maternity in from of them but other has a Renal Stone issue. What is the matching between twos? But our hoardings are there along the roadsides to tell anything to anyone. Walk down any street in our cities and towns even within the landscape from Dharmanagar to Sabroom, and you'll be bombarded with a barrage of health-related information. Colorful hoardings scream about schemes, new miracle advices, leaflets are thrust into your hands promising quick fixes, and social media feeds are flooded with unverified health advice.

The intention behind this information blitzkrieg is often good—to raise health awareness and empower people. This "random thronging" of health messages, without a clear strategy or technical foundation, often leads to information fatigue, confusion, and a general lack of trust. The question for people isn't just about the confusion; it's also about who is seeing these messages on thousands of hoardings, which feature a sexy model standing on a ledge with a pen amid other lusty pictures. The public is left to sift through a mountain of generic advice, struggling to find what is relevant to their specific needs. This indiscriminate approach, while seemingly proactive, often falls short of its mark, failing to create meaningful, lasting change in health behaviors.

The Pitfalls of "Random Thronging":- The traditional, scattergun approach to health awareness—relying heavily on generic hoardings and mass distribution of leaflets—is fraught with limitations. Firstly, it lacks targeting. A leaflet promoting prenatal care to a group of college students is likely to be ignored, just as a hoarding about diabetes management might go unnoticed by a healthy young demographic. A simple, one-line slogan on a hoarding may catch the eye, but it rarely provides the context or details needed to inspire a behavioral change. Thirdly, there is no feedback mechanism. We can't gauge whether the message was understood, if it led to any action, or if it was simply discarded with the day's trash.

Trust Deficit of Mass Media:- Hoardings and leaflets, while capable of reaching a large audience, suffer from a fundamental trust deficit. They are static, one-way channels of communication. A hoarding on a busy street corner might catch a fleeting glance, and a leaflet might be briefly perused before being discarded. The information they contain, no matter how well-intentioned, lacks the context, personalization, and interactive element that builds trust.

In a world saturated with advertising, people have become adept at tuning out generic messages. A colorful poster about the importance of male sterilisation or participation of male in family planning, for instance, is unlikely to resonate as deeply as a direct conversation with a nurse who explains its significance in the context of a patient's own health. This impersonal nature of mass media often fails to bridge the gap between information and action, leaving people aware of a health issue but uninspired to change their behavior. Hoardings and leaflets often operate under the assumption that everyone is in the "Action" or "Preparation" stage, ready to change. A Hoarding on healthy eating is useless for someone in the "Precontemplation" stage who doesn't even see a problem with their diet. This is a significant reason for their low effectiveness. These primarily rely on the peripheral route. A person quickly glances at a hoarding and might be persuaded by a simple, memorable slogan or an attractive image. The message is not deeply processed, and the resulting change in attitude or behavior is often weak and short-lived. While a hoarding might provide a general prompt for a behavior, it does little to build a person's self-efficacy

The Call for Technicality: A Strategic Shift

To achieve better results in health awareness, we need a fundamental shift from "random thronging" to a "technical" approach. This means applying principles of communication, psychology, and data science to design and execute health campaigns. Technicality is not about making things complicated; it's about making them more effective. It begins with a clear understanding of the target audience. Who are we trying to reach? What are their specific health concerns? What are their cultural beliefs and communication habits? By gathering and analyzing this

data, we can tailor our messages to be more relevant and resonant.

For example, a campaign to promote covid vaccination in a South Maharani area community area, Dr. Niru Mohan Jamatia and his team used quite unusal route of way. They took their local grievances, the way of communication they like, sports aligning with Institutions for CSR Activities with OTPC for promoting the health and vaccination. This targeted approach ensures that the right message reaches the right person at the right time, increasing the likelihood of it being heard and acted upon. The effectiveness of health services is often mistakenly attributed to public awareness, when in reality, it is a reflection of the functionality of the health system itself. This pattern is evident in several case studies. In the past, the Brahmachara region suffered from a complete lack of progress across all health indicators. This stagnant situation was not due to a lack of public will but was transformed by the dedicated efforts of local health worker Bidhan Chandra Nag. His work in promoting behavioral change led to a marked improvement in every indicator. A similar dynamic was at play in Ompichara, Ghorakappa, where inconsistent health activities once upon a time led to a significant population of unimmunized children. Although the problem was initially blamed on insufficient "awareness" among the public, the community's response proved otherwise. When a health team was centrally mobilized by CMO Gomati, people eagerly and spontaneously sought out vaccination and other health services.

This principle was further underscored during the COVID-19 vaccination campaign in Killa. Initial struggles were framed as an awareness problem, but the narrative quickly changed with the deployment of the Maharani Team, which led to an immediate increase in vaccination performance. In the landscape of public health, the debate over effective communication strategies is ongoing. While mass media campaigns, utilizing hoardings and leaflets, have long been a staple of health awareness initiatives, a growing body of evidence and professional consensus suggests that these methods, when used in isolation, are often overshadowed by the power of direct, interpersonal communication from healthcare providers.

Provider-Patient Relationship: A Foundation of Trust

The relationship between a patient and a healthcare provider is built on trust, empathy, and personal connection. When a patient visits a clinic or a hospital, they are often in a state of vulnerability, seeking guidance and reassurance. This is the prime opportunity for effective health education. A doctor who takes the time to sit down, make eye contact, and explain a diagnosis in simple, clear language is not just delivering information; they are empowering the patient. A nurse who patiently demonstrates a medical procedure and answers questions with genuine care is not just following protocol; they are building a relationship that encourages adherence to treatment plans. This personal interaction transforms a health message from a passive piece of information into a shared understanding, making it more likely to be accepted and acted upon.

Service Provider's Behavior and Talk is a classic example of the central route. A patient visiting a doctor is highly motivated and has the ability to process the information, especially when the doctor tailors it to their specific condition. The conversation is personally relevant, and the patient is actively involved in understanding the "why" behind the recommendations. This deep processing of the information leads to a more lasting change in belief and behavior. A healthcare provider can directly address and build a patient's self-efficacy. By explaining a procedure, demonstrating a technique, and offering words of encouragement, the provider instills confidence in the patient. They can also serve as a positive model of healthy behavior and can modify the patient's immediate environment to support the desired change. This reciprocal interaction between the provider's talk, the patient's beliefs, and the environmental support is what makes this approach so effective.

A skilled healthcare provider can use an individualized approach to assess a patient's stage of change. They can ask questions to determine if the patient is contemplating a change, preparing for it, or already taking action. This allows them to deliver a message that is appropriate for that specific stage. For a patient in "Precontemplation," stage, the provider might focus on raising awareness. For a patient in the stage of "Preparation," they might provide specific tools and resources. This tailored, stage-matched communication is far more effective than a one-size-fits-all message.

Tailored Communication and Actionable Advice is one of the greatest limitations of mass media is its inability to tailor messages to individual needs. A

hoarding about diabetes might be informative for some, but it provides no guidance on specific dietary changes for a particular person's lifestyle. A leaflet on prenatal care can't address the unique concerns of a first-time mother in a specific cultural context. In contrast, a healthcare provider can engage in a dynamic, two-way conversation. They can assess a patient's knowledge, address their fears and misconceptions, and provide advice that is relevant to their personal circumstances. This tailored approach is far more effective in driving behavioral change. For example, instead of a general message about diet, a doctor can recommend specific food substitutions that are culturally appropriate and affordable for the patient, making the advice both practical and sustainable.

The shift from random thronging to a technical approach is not just a strategic choice; it is an ethical imperative. It is about respecting the public's intelligence and time, and it is about ensuring that every health awareness effort contributes meaningfully to a healthier community. By embracing data-driven insights, strategic channel selection, and measurable outcomes, we can move beyond the clutter and create campaigns that are not only seen but also truly felt and acted upon. This new paradigm of health awareness is not about shouting the loudest; it's about speaking with clarity, relevance, and impact. It is about empowering individuals with the knowledge they need to take charge of their health, not by overwhelming them with generic information, but by providing them with targeted, actionable insights. This is the path to a future where health awareness leads to real, tangible results.

The argument is compelling: a doctor's or nurse's behavior and talk during a health service have a more profound and lasting impact on a person's health choices than a hundred hoardings or a million leaflets. A technical approach demands accountability. It has to be replaced with deeply entrenched and the most way of appeasement popular way of hoarding culture in New India. Good representable devices should come in to explain the health matter. It requires time to come out from. Policy makers have to build the trust on such initiative first. We have to learn other languages as well. Time aligned with data driven approach is the utmost factors. We have to get adequate time, we have to have time to develop the mind-set and environment first for bringing technicality in the Health awareness also.

ম্যাকানিকেল থেকে এ আই ক্যালকুলেটর নতুন দিশার খোঁজে!

দীপঙ্কর শূর

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে উন্নত হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে। বিভিন্ন সময়ে মানব জীবন তথা সমগ্র সমাজ জীবনের হিতসাধনের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা আবিষ্কার করেছে বিভিন্ন যন্ত্র। বেতার, দূরদর্শন, মহাকাশযান, রোবট, রকেট, মুদ্রণযন্ত্র, পরমাণু বোমা, স্টীম ইঞ্জিন, জাহাজ, টেলিফোন, মাইক্রোফোন, গণকযন্ত্র (Calculator) প্রভৃতি। বিজ্ঞান তথা প্রযুক্তিবিদ্যার অসাধারণ উপহার যেগুলো জীবনযাত্রাকে সহজ-সরল দ্রুতগতি সম্পন্ন এবং অনেক অনেক উন্নত করেছে, একথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের গণকযন্ত্র অ্যাবাকাস (Abacus) থেকে শুরু করে সপ্তদশ শতাব্দীতে বিখ্যাত ফরাসী গণিতজ্ঞ ব্লেইজ পাস্কান-এর হাত ধরে প্রথম ম্যাকানিকাল ক্যালকুলেটর পরবর্তী উনবিশং শতাব্দীতে বাণিজ্যিকভাবে সাফল্য ম্যাকানিকাল ক্যালকুলেট এবং বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইলেকট্রনিক ক্যালকুলেটর-এর আবিষ্কার আমাদের সময় ও শ্রমকে কয়েকগুণ কমিয়ে দিয়েছে। বিংশ শতাব্দীতে পরিপূর্ণভাবে আবিষ্কৃত কম্পিউটার নামক 'গণকযন্ত্র'টিই 'গণকযন্ত্রাদি'র মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট। সুতরাং বলা যায় কম্পিউটারই হল বিংশ শতকে বিজ্ঞান তথা প্রযুক্তিবিদ্যার শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং সমাজকে দিয়েছে বিচিত্র যন্ত্রাদি। দ্বিতীয় ভাগে ইলেকট্রনিক্স এবং টেলিযোগাযোগের উন্নতিতে পৃথিবী এসেছে হাতের মুঠোয়। উপগ্রহের মাধ্যমে যোগাযোগ, মহাকাশ গবেষণা, শিল্পক্ষেত্র, বাণিজ্যিক ক্ষেত্র, সংস্কৃতি জগৎ, বিনোদন প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে কম্পিউটারের দাপটে প্রযুক্তিবিদ্যায় এসেছে এক নাটকীয় পরিবর্তন।

বর্তমানে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কম্পিউটারের ব্যবহার অনস্বীকার্য। ঘুম থেকে উঠে রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত এবং ঘুমানোর সময়ও আমরা কম্পিউটারের উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল। কম্পিউটারের প্রয়োগ এলাকা ব্যাপক আকারে বিস্তৃতি লাভ করেছে। সুতরাং বর্তমান যুগকে কম্পিউটারের যুগ (Age of Computer) বললে অত্যুক্তি করা হয় না এবং বর্তমান যুগে একজনের কম্পিউটার সম্বন্ধে ন্যূনতম ধারণা না থাকলে পেশাগত জীবনে তাকে নানারকম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো এমন একদিন আসবে, যখন কম্পিউটার সম্বন্ধে ন্যূনতম জ্ঞান না থাকলে 'নিরক্ষর' আখ্যা দেওয়া যাবে।

আমরা বিংশ শতাব্দী থেকে একবিংশ শতাব্দীতে পা রেখেছি কম্পিউটারের হাত ধরে। বর্তমানে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI) মৃত্যু কবে নির্ভুল জানাবে 'ডেথ ক্যালকুলেটর' নতুন এই টুলটির নাম AI-ECG রিস্ক এস্টিমেটর বা সংক্ষেপে (AIRE)।

আসলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI)) হল এমন ব্যবস্থার প্রযুক্তি যা কম্পিউটার এবং মেশিনগুলিকে ভাষা অনুবাদ, তথ্য বিশ্লেষণ এবং সুপারিশ প্রদানের মতো কাজ সম্পাদনের সময় মানুষের শেখার, বোধগম্যতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনুকরণ করতে সক্ষম করে। ক্ষেত্রগুলো যেমন —

* অটোমেশন ঃ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে, মানে উন্নত করে এবং লিড টাইম কমায়।
* বুদ্ধিদীপ্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ঃ নিরপেক্ষ এবং তথ্য চালিত ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
* উন্নত গ্রাহক অভিজ্ঞতা ঃ প্রতিক্রিয়া সময় এবং ব্যক্তিগতকরণ উন্নত করে।
* চিকিৎসা অগ্রগতি ঃ দূরবর্ত্তী রোগ নির্ণয় এবং রোগ পূর্বাভাষ সমর্থন করে।
* গবেষণা ও তথ্য বিশ্লেষণ ঃ তথ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বিশ্লেষণকে ত্বরান্বিত করে।
* জটিল সমস্যা সমাধান ঃ জালিয়াতি সনাক্তকরণ এবং চিকিৎসা নির্ণয়ের মতো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে।
* ব্যবসায়িক ধারাবাহিকতা ঃ পূর্বাভাস এবং সক্রিয় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করা।

* পুনরাবৃত্তিমূলক কাজ পরিচালনা ঃ রুটিন কাজগুলিকে স্বয়ংক্রিয় করে। মানব সম্পদ খালি করে।

* ত্রুটি কমানো ঃ পুনরাবৃত্তিমূলক কাজে মানুষের ত্রুটি কমায়, নির্ভুলতা উন্নত করে।

* বর্ধিত দক্ষতা ঃ কর্মক্ষমতা হ্রাস না করে ২৪/৭ পরিষেবা প্রদান করে।

যদিও এ আই অনেক অসুবিধা প্রদান করে, এটি অসুবিধা এবং নৈতিক উদ্বেগও তৈরী করে। উদাহরণ স্বরূপ এ আই সিস্টেমগুলিকে প্রশিক্ষণের তথ্যে উপস্থিত পক্ষপাতগুলোকে অসাবধানতাবশতঃ প্রতিলিপি করতে পারে, যার ফলে অন্যায্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। গোপনীয়তা উদ্বেগ এবং অটোমেশননের কারণে চাকরির স্থানচ্যুতির সম্ভাবনাও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উপরন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণে এ আই এর ক্রমবর্ধমান ভূমিকা নৈতিক দ্বিধায় জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতা নিয়ে উদ্যোগ তৈরী করে।

একবিংশ শতাব্দীকে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যা (কম্পিউটার, যোগাযোগ ব্যবস্থা) আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করে উন্নতির আর কতখানি উচ্চস্তরে নিয়ে যেতে পারে, সেটাই দেখার।

সম্প্রতি তারই এক দৃষ্টান্ত AI দিয়ে 'মাদার মিস্ট্রি সলভ', হ্যাঁ ২১ বছর বয়সী কেরলার কুল্লুম জেলার আচার টাউনে বসবাসকারী রঞ্জিনি ও তার দুই সদ্যজাত কন্যাসন্তানদের ১৯ বছর আগে হত্যার রহস্য সমাধান করে ফেললো AI। আর এটাই ভারতবর্ষের প্রথম কেস যা সমাধান করা হলো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমে। শুনতে অভাব লাগলেও টেকনোলজিকে কাজে লাগিয়ে এক মা ও তার দুই সন্তানের হত্যাকারীদের শাস্তি দিলো ভারতবর্ষের আইন ব্যবস্থা। ১৯ বছর আগে তিনজনকে নির্মমভাবে খুন করে নিজেদের পরিচয় বদলে নিয়ে বহালতবিয়তে জীবন কাটাচ্ছিল খুনীরা। কিন্তু শেষমেষ মানুষের পক্ষে যেটা ১৯ বছরে সম্ভব হয়নি সেটাই করে দেখালো AI। আর এই কেসের মাধ্যমে ভারতের অপরাধের ইতিহাসে শুরু হল এক নতুন অধ্যায়।

কিন্তু কিভাবে সংক্ষেপে বলতে গেলে ১৯বছর আগের খুনীদ্বয়ের ছবি এ আই'র মাধ্যমে তাদের বর্তমানে ছবির নমুনা তৈরী করে সোস্যাল মিডিয়ার ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম ইত্যাদিতে দেওয়া ছবির সাথে আশি থেকে নব্বই শতাংশ মিল আছে এমন ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে একজনকে সনাক্ত করতে সক্ষম হয়, এবং পরবর্তীতে দ্বিতীয় জনও সনাক্ত হয়। সত্যিকথা বলতে গেলে সঠিক সময়ে সঠিক মানুষের হাতে পড়লে এ আই এর মাধ্যমে আরো অনেক জটিল থেকে জটিলতর সমস্যার সমাধান সম্ভব।

দুর্গাপূজা ভ্রমণের অভিজ্ঞতা

প্রিয়া দত্ত

দুর্গাপূজা ত্রিপুরা রাজ্যের একটি প্রধান উৎসব। এটি বাংলা এবং ত্রিপুরার বৃহত্তম সাম্প্রদায়িক উৎসব হিসাবে বিবেচিত হয়। দুর্গাপূজা মূলত দেবী দুর্গার মহিষাসুর বধের স্মরণে উদ্‌যাপন করা হয় এবং এটি পঞ্চমী থেকে বিজয়া দশমী পর্যন্ত পাঁচ দিন ধরে চলে।

ত্রিপুরায় দুর্গাপূজা ঃ- দুর্গাপূজা সাধারণত বাংলা ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী আশ্বিন মাসের শুক্লপদের ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত পাঁচ দিন ধরে পালিত হয়। এই পাঁচ দিন যথাক্রমে ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও বিজয়া দশমী নামে পরিচিত। পূজার সময় শহরজুড়ে সুন্দর মণ্ডপ তৈরী করা হয় এবং দেবী দুর্গার প্রতিমা স্থাপন করা হয়। এই উৎসবে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়। দুর্গাপূজা ত্রিপুরাবাসীর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মিলনমেলা। ত্রিপুরায় দুর্গাপূজা ভ্রমণ একটি মনোমুগ্ধকর অভিজ্ঞতা হতে পারে, যা প্রকৃতির সৌন্দর্য, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং উৎসবের আনন্দকে একত্রিত করে। দুর্গাপূজা ত্রিপুরাতে একটি প্রধান উৎসব এবং এই সময় শহর ও গ্রামগুলি আলো ঝলমলে হয়ে উঠে, মণ্ডপগুলিতে মায়ের আরাধনা করা হয় এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সকলে মেতে উঠে।

ঐতিহ্যবাহী মণ্ডপ ঃ- ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে দুর্গাপূজার জন্য সুন্দর মণ্ডপ তৈরী করা হয়, যেখানে মায়ের প্রতিমা স্থাপন করা হয় এবং নানা ধরণের আলোকসজ্জা ও সজ্জা করা হয়। এই মণ্ডপগুলিতে ঐতিহ্যবাহী ও আধুনিক স্থাপত্যশৈলীর মিশ্রণ দেখা যায়।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ঃ- দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, যেমন — নৃত্য, গান, নাটক ইত্যাদি আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানগুলিতে স্থানীয় শিল্পী ও সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়।

মেলা ও বাজার ঃ- দুর্গাপূজার সময় বিভিন্ন স্থানে মেলার আয়োজন করা হয়, যেখানে স্থানীয় হস্তশিল্প, খাবার ও অন্যান্য সামগ্রী পাওয়া যায়। এটি পর্যটকদের জন্য একটি আকর্ষণীয় স্থান।

খাবার ঃ দুর্গাপূজায় বিভিন্ন ধরণের ঐতিহ্যবাহী খাবার তৈরী করা হয়, যা পর্যটকদের জন্য একটি বিশেষ আকর্ষণ।

প্রকৃতি ও পর্যটন স্থান ঃ- ত্রিপুরা তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত। দুর্গাপূজার সময় পর্যটকরা আগরতলার রাজবাড়ী, নীরমহল, ঊনকোটিসহ বিভিন্ন পর্যটন স্থান ভ্রমণ করতে পারেন।

উপজাতি সংস্কৃতি ঃ- ত্রিপুরায় বিভিন্ন উপজাতির বসবাস, যাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রয়েছে। দুর্গাপূজার সময়, উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষেরা তাদের নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী পোশাকে সজ্জিত হয়ে উৎসবে যোগ দেয়, যা পর্যটকদের জন্য একটি আকর্ষণীয় অভিজ্ঞতা।

উপসংহার ঃ- দুর্গাপূজা প্রাণের উৎসব। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের মানুষের মিলনমেলা দুর্গোৎসব। দুর্গাপূজার দিনগুলোকে আনন্দময় করে তোলার জন্য প্রশাসনের পাশাপাশি সাধারণ জনগণকেও দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে। উৎসব হোক প্রাণবন্ত।

দুর্গাপূজা সবার

রিটন দেববর্মা

দুর্গপূজা একটি হিন্দু উৎসব যা দেবী দুর্গার আরাধনাকে কেন্দ্র করে পালিত হয়। এটি বাংলা এবং ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যান্য অংশে বিশেষ ভাবে পালিত হয়, যেখানে বিভিন্ন ধর্মের মানুষও এই উৎসবে অংশ গ্রহন করে।

দুর্গাপূজা মুলত হিন্দু ধর্মের একটি উৎসব হলেও, বিভিন্ন ধর্মের মানুষ এই উৎসবে আনন্দও শ্রদ্ধার সাথে অংশ গ্রহণ করে।

দুর্গাপূজার সময়, দেবী দুর্গাকে বিভিন্ন রূপে পূজা করা হয় এবং এই পূজা বিভিন্ন আচার ও রীতির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। এই উৎসবে নানা ধরনের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানও আয়োজন করা হয়।

কিছু ক্ষেত্রে ভিন্ন ধর্মের মানুষও এই উৎসবে অংশ গ্রহণ করে, যেমন দুর্গাপূজা মন্ডপ তৈরীতে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা। অথবা উৎসবে আসা মানুষের জন্য খাবার পরিবেশন করা। দুর্গাপূজা একটি মিলনও সংস্কৃতির উৎসব, যেখানে ধর্মের ভেদ মুছে ফেলে মানুষ এক সাথে মিলিত হয় এবং আনন্দ ভাগ করে নেয়।

দুর্গাপূজা শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় উৎসব নয়, এটি একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উৎসবও বটে, যেখানে সবার মধ্যে সম্প্রীতি ও ঐক্য বৃদ্ধি পায়।